মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

চৈতন্যদেব

পত্র ভারতী

প্রখ্যাত চৈতন্য-গবেষক প্রয়াত
ড. বিমানবিহারী মজুমদারের
পুণ্য স্মৃতিতে

ভূ মি কা

বাঙালির মনন ও মনীষার উৎকর্ষ সাধনে চৈতন্যদেব ছিলেন প্রথমে প্রথম যাজ্ঞিক। মধ্যযুগে তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির রোচিষ্ণু অধ্যায়। বাংলার মাটিতে তাঁর আবির্ভাব না ঘটলে বঙ্গসংস্কৃতির অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যেত। বাংলার সাহিত্য সংগীত শিল্পকলা ভাস্কর্য নাটক ও দার্শনিক ভাবনায় গভীরভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে চৈতন্য-বিভব। তাঁর দূরদর্শিতা উদারতা মানবিকতা সমাজকে যে নবচেতনায় উদ্ভাসিত করেছিল, সে বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্বভারতের জনজীবনে তিনি যে পরিবর্তন এনেছিলেন, তা সেকালের রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

আজও আমাদের সমাজে যেটুকু চলমানতা লক্ষ করা যায়, তার সবটুকুই যে চৈতন্য-অবদান, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সমাজের প্রায় প্রতিটি অনুষঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আজও রয়েছে চৈতন্যদেবের অনিবার্য উপস্থিতি। অথচ চৈতন্যদেবের সামাজিক অবদানের সংবেদনশীল ধারাটি সেভাবে জনমানসে প্রসৃতি লাভ করেনি। দেশে-বিদেশে তাঁকে নিয়ে তাই আজও চলছে নিরন্তর গবেষণা।

চৈতন্যদেব ছিলেন মানবতাবাদী। তাঁর মানবতাবাদ ও সমাজভাবনা ছিল প্রগতিশীল। তাঁর মানবিক আদর্শ আজও বিশ্বের পথভ্রষ্ট মানুষকে পথ দেখাতে পারে। সারাটি জীবন তিনি মানবকল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন। কুসংস্কারকে ভেঙে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। বঙ্গসংস্কৃতির অনেকটাই তো চৈতন্যকেন্দ্রিক। আমাদের সমাজে আজও চৈতন্যপ্রভাব সীমাহীন। তাঁর মনন ও মনীষা আজও আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। তাঁর জীবনচরিত যত পড়েছি, ততই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি।

অবশেষে এই মহান মানবতাবাদী মানুষটিকে নিয়ে রচনা করেছি 'চৈতন্যদেব'

গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে বস্তুবাদের বিচারে চৈতন্যদেবের নবমূল্যায়ন করা হয়েছে। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির পাশাপাশি একালের গবেষণাধর্মী গ্রন্থগুলিকেও সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থদুটিকে আকরগ্রন্থ হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চৈতন্যপ্রেমী পাঠকদের হাতে গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

এই গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যাঁরা তথ্য দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, গ্রন্থ দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁরা হলেন পুরুলিয়ানিবাসী গৌতম চক্রবর্তী, নবদ্বীপ সমাজবাড়ির ভক্ত পূর্ণানন্দ দাস, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দেবীমাধব চক্রবর্তী ও শান্তিরঞ্জন দেব, বন্ধুবর কেশবচন্দ্র সাহা, তপন ভট্টাচার্য, অবণী দত্ত এবং স্নেহভাজন অধীর দেবনাথ। এঁদের সকলের কাছেই আমি চিরঋণী। মণিপুরের রাজকুমার টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ 'অনুমহাপ্রভুর'-র ছবি সম্বলিত সিডিটি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি আত্মজ মানস মণ্ডলের কাছে। ইতিমধ্যে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ পত্রিকায় এবং নবদ্বীপ বইমেলা স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এই সুযোগে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই পত্র ভারতী প্রকাশনার কর্ণধার ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। তিনি এই গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমাকে বিশেষভাবে প্রাণিত করেছেন।

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

চৈতন্যদেবের সমকালীন নবদ্বীপ (এই মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়)

সূ চি প ত্র

শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ

শ্রীগৌরাঙ্গ (কাঠের মূর্তি)। মহাপ্রভু গৃহ, নবদ্বীপ; আঃ ১৬শো শতাব্দ।

চৈতন্যের জন্ম। নন্দলাল বসু। ১৯৩২

শ্রীগৌরাঙ্গ (কাঠের পুতুল)। নতুনগ্রাম-বর্ধমান। সমকালীন

সপার্ষদ চৈতন্যদেব। কুঞ্জঘাটা-মুরশিদাবাদ। ১৮শো শতক

পুরীর পথে নৃত্যরত চৈতন্য।

নবদ্বীপে চৈতন্য সংকীর্তন।
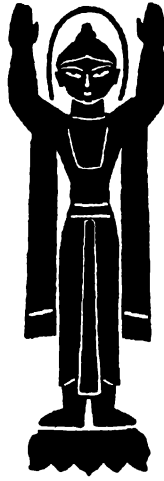
নবদ্বীপ-লীলা

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ছিলেন শিষ্টবর্গীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজ। বাঙালি সমাজেও এই ধারার সার্বিক প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ছিল আচার-বিচারসর্বস্ব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রক্ষণশীল এবং জাতিভেদ প্রথায় বিদীর্ণ। প্রান্তিক শ্রমজীবী উৎপাদক শ্রেণির জনগণ ছিল 'শূদ্র'। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে এরাই ছিল গরিষ্ঠ। তা সত্ত্বেও এরা ছিল অধিকারহীন, অপাঙ্‌ক্তেয়, উপেক্ষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণি। শাস্ত্রপাঠে এদের কোনও অধিকার ছিল না। জ্ঞানার্জনের অধিকার, পূজাপাঠের অধিকার এবং সামাজিক মর্যাদার অধিকার থেকে শূদ্রজাতি ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ধর্ম এবং শাস্ত্রের অজুহাতে সমাজের বৃহত্তর অংশের উৎপাদক শ্রেণির জনগণকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রবাহ থেকে ব্রাত্য ঘোষণা করা হয়েছিল। এইভাবে 'জাতের নামে বজ্জাতি' হিন্দু ধর্মের সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট করেছিল।

ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর পেষণ, সামাজিক ঘৃণা, অবজ্ঞা, বিদ্বেষ, সর্বোপরি অমানবিক আচরণে ব্রাত্য-অবহেলিত-অধিকারহীন হিন্দু সমাজের এক বৃহত্তর অংশ শিষ্ট সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজের

একাংশ ইসলামের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল।[১] এর ফলে বাংলার মুসলমানের সংখ্যা গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২] এদেশে ইসলাম জনসংখ্যার অধিকাংশটাই যে ধর্মান্তরিত হিন্দু সমাজের অংশ, সমাজবিজ্ঞানীরা তা স্বীকার করেছেন।[৩] বিপথগামী হিন্দু সমাজ সম্পর্কে স্মৃতিকারেরা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। ধর্মান্তর রোধ করার জন্য সেদিন তাঁরা কোনও সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। 'হিন্দু সমাজের সংহতিই যদি স্মৃতিকারদের কাম্য হত, তা হলে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে ভেদ সম্পর্কে এমন নির্ব্যূঢ় শাস্ত্রশাসন কখনোই সম্ভব হত না। ব্রাহ্মণ স্মৃতিকাররা শাস্ত্রীয় বিধান কঠোরতর করেছেন 'সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন' মুখ্যত ব্রাহ্মণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে, এ কথার প্রতিবাদ করা কঠিন।'[৪]

মধ্যযুগে হিন্দু শিষ্টবর্গীয়দের একটি ধারা যাগ-যজ্ঞ, পূজার্চনা ও ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন, শাস্ত্রচর্চায় সময় অতিবাহিত করতেন। আড়ম্বরপূর্ণ পূজানুষ্ঠান ছিল ব্যয়বহুল, ফলে অর্থনৈতিক সংগতিহীন সমাজ উপাসনা পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠা করল লৌকিক দেবদেবীর। বিষহরি, চণ্ডী, ষষ্ঠী, এমনকী যক্ষ-রক্ষেরাও জনমানসে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করল।[৫] তন্ত্রসাধকেরা পঞ্চ 'ম' কারের সাধনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ঝাড়ফুঁক, কবচ-তাবিজের সঙ্গে বশীকরণের তত্ত্বটিও ছিল এঁদের করতলগত। ফলে সমাজে এঁদের প্রভাব ছিল সীমাহীন। মানুষ এঁদের ভক্তি করত, আবার ভয়ও করত। অপরদিকে, 'শূদ্র'রা সমাজে এতটাই অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল যে, তারা যে মানুষ—এ ভাবনা তাঁদের মনে স্থান পেত না। মানব আত্মার অপমান সে যুগের অগ্রগতিকে প্রতিহত করেছিল। স্মৃতিকারেরা এতটাই আত্মকেন্দ্রিক ও সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন যে, অবক্ষয়কে তাঁরা একেবারেই অনুধাবন করতে পারেননি।

বুঝেছিলেন চৈতন্যদেব। মধ্যযুগে জন্মেও তিনি ছিলেন আধুনিক, কুসংস্কারহীন এবং মুক্ত মনের মানুষ। মানবতার অপমানের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। সামাজিক অচলায়তনকে ভেঙে দিয়েছিলেন, জাড্যতাকে আঘাত করেছিলেন,

১. বঙ্কিম রচনাবলী—যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৩
২. বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম—রমাকান্ত চক্রবর্তী, পৃ. ২৬
চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান—অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ২য় সং, পৃ. ২৩
Hinduism and Islam in Mediaeval Bengal—E. C. Dimock, P-10
৩. বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, পৃ. ২৬
৪. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ২৭
৫. চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস, সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১/২

বর্ণভেদের কঠোরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। অন্ত্যজ-শ্রেণির মানুষকে কোলে ঠাঁই দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মানবাত্মার অপমান তাঁর অভিপ্রেত নয়। বৈষ্ণব কবির লেখায় পাই, 'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ!'

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই বাংলায় একটি বৈষ্ণব গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। নবদ্বীপ ও শান্তিপুর—দু-জায়গাতেই তাঁর আবাস ছিল। পাষণ্ডীদের ভয়ে তাঁরা গোপনে শ্রীবাসঅঙ্গনে কিংবা চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে মিলিত হয়ে ইষ্টগোষ্ঠী করতেন। স্মার্ত সমাজপতিদের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তেমন কোনও আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলতে পারেননি, পেরেছিলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের বলিষ্ঠ চরিত্র, পৌরুষদীপ্ত পদক্ষেপ নড়বড়ে বৈষ্ণব আন্দোলনকে করেছিল শক্তিশালী। তাঁর সাংগঠনিক শক্তির জোরে বৈষ্ণব আন্দোলনে জোয়ার এসেছিল। তিনি মানুষকে যথাযোগ্য সম্মান দিতেন, জাতপাত সেখানে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ছিল নিবিড়, যবন হরিদাসকে বুকে জড়িয়ে ধরে মানবিক আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তিনি।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে বাংলার সামাজিক সংহতি বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ধর্মাচরণ, সামাজিকতা ও ঐহিকতার ক্ষেত্রগুলি ছিল অসঙ্গতিপূর্ণ। প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে জীবনধারণ করত। সম্পন্ন গৃহস্থেরা পুত্রকন্যার বিবাহে এবং মূর্তি পূজায় প্রচুর অর্থব্যয় করত। বৈষ্ণবরা ছিলেন উপহাসের পাত্র।[৬]

মধ্যযুগে নবদ্বীপ ছিল সমগ্র বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। নদীপথে যাতায়াতের সুবিধা থাকায় জনপদটি বাণিজ্যিক সফলতা অর্জন করেছিল। দেশবিদেশের পণ্য যেমন এখানে আসত, নবদ্বীপের তাঁতের কাপড়, শাঁখা, গন্ধদ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে যেত বিদেশি বণিকরা। বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও সারস্বত সাধনার পীঠস্থান হিসেবে নবদ্বীপের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল ক্রমাগত। এসবের আকর্ষণে অনেকেই নবদ্বীপকে বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, শাঁখারি, মালাকার, তাঁতি, গোয়ালা, গন্ধবণিক, তাম্বুলি, বণিক, ভাট, সাপের ওঝা, মালো, যবন প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর বাস ছিল নবদ্বীপে।[৭] সেকালের নগরবিন্যাসের

৬. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, ১/৬
চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস, ১/৬

৭. চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস
গৌরাঙ্গ বিজয়—সুকুমার সেন সম্পাদিত, পৃ. ৩০-৩১

ধরন অনুযায়ী এক এক জাতিগোষ্ঠী এক এক পাড়ায় বাস করত। এদের মধ্যে সামাজিক চলমানতার অভাব ছিল।[৮]

সেকালে শিষ্টবর্গীয় স্মার্ত পণ্ডিতরা ছিলেন সমাজের নিয়ন্ত্রণকর্তা। নব্যন্যায়ের প্রবক্তা তো তাঁরাই। সেকালের ন্যায়চর্চা সমাজে কোনও নতুন আদর্শ স্থাপন করতে পারেনি। 'অসাধারণ সূক্ষ্ম যুক্তি এর ভিত্তি, এ পুরোপুরি বস্তুমুখী। কিন্তু নাস্তিক্যবাদী নয়, আস্তিক্যবাদেরই প্রবক্তা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তির অধিকারী হয়েও নব্যন্যায়ে স্মৃতির বর্ণভেদের অযুক্তি ধরা পড়েনি। ব্রাহ্মণের যুক্তিহীন একাধিপত্যের বিরুদ্ধে তার কোনও যুক্তিই নেই। নব্যন্যায়ের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্মৃতিগ্রন্থ লিখেছেন, নব্যন্যায়ে অধিকার না থাকলে স্মৃতিগ্রন্থ লেখা সম্ভব ছিল না। নব্যন্যায় সামাজিক সম্পর্কশূন্য, প্রাণহীন, উদ্দেশ্যহীন বিশুদ্ধ মস্তিষ্কের যেন এক অত্যাশ্চর্য বপ্রক্রীড়াস্বরূপ।'[৯] শিষ্টবর্গীয়রা অব্রাহ্মণ্য সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন ধর্মীয় অনুশাসনের নিগড়ে। সামাজিক বিধিবিধানে উচ্চবর্ণের স্বার্থ রক্ষিত হত। এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণেতর সমাজের প্রতিবাদ জানানোর অধিকার স্বীকৃত ছিল না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সমাজের মাঝখানে স্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত ছিল। কোনও অবস্থাতেই লক্ষ্মণরেখা লঙ্ঘন করার সাধ্য ছিল না। শূদ্র-সমাজের সঙ্গে অবাধ মেলামেশাকে গর্হিত আচরণ হিসেবে গণ্য করা হত। প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে হাটেবাজারে সাক্ষাৎ ঘটত। নিম্নবর্ণের সমাজ ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। কর্ষণজীবী সমাজের উৎপাদিত পণ্য শিষ্টবর্গীয়রা বিনামূল্যে গ্রহণ করতে চাইত। চৈতন্যদেবও খোলাবেচা শ্রীধরের কাছ থেকে কলা-মুলো ইত্যাদি নিয়ে মূল্য দিতে চাইতেন না।[১০] চৈতন্য-জীবনীকারেরা এটিকে নিছক লীলা বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রটি প্রস্ফুটিত হয়েছে জীবনীকারদের রচনায়।

স্মৃতির বিধানে সেকালের সমাজ ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বে দ্বিধাবিভক্ত। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য সকলে ছিল শূদ্র। শূদ্র অর্থে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রান্তিক শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষকে বোঝাত। প্রকৃত অর্থে তারাই ছিল সমাজের ধারক ও বাহক। অথচ শিষ্টবর্গীয়দের চোখে তারা ছিল অস্পৃশ্য, অধিকারহীন এবং ক্রীতদাসের সমতুল্য। স্মৃতিকারদের ঘোষণায় শূদ্রদের প্রধান ধর্মীয়-কৃত্য ছিল উচ্চবর্ণের সেবা করা।[১১] এইরূপ পক্ষপাতমূলক সমাজ-বিধানে ব্রাহ্মণেতর মানুষ

৮. চৈতন্য প্রসঙ্গ—জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ. ১২
৯. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, ভূমিকা, পৃ. ২৭
১০. চৈতন্যভাগবত, ২/৯
১১. অষ্টবিংশতিতত্ত্বানি—রঘুনন্দন, শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বম, পৃ. ৪৪১

ছিল প্রক্ষুব্ধ। ব্রাত্য সমাজের উপেক্ষিত মানুষ মদ্য-মাংস সহযোগে যজ্ঞ পূজা করত, মঙ্গলচণ্ডীর গান গাইত। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

'বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
মদ্যমাংস দিঞা কেহ যক্ষ পূজা করে।।
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গল।।' [১২]

এইরূপ সামাজিক প্রেক্ষিতে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপের এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মহামানব চৈতন্যদেব।[১৩] পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। জয়ানন্দের মতে, চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ ওড়িশার জাজপুরের অধিবাসী ছিলেন। রাজা ভ্রমরের[১৪] ভয়ে তাঁরা শ্রীহট্টে চলে আসেন।[১৫] জয়ানন্দ এ তথ্যটি পেয়েছিলেন মাধব পট্টনায়ক রচিত 'বৈষ্ণব লীলামৃত' গ্রন্থ থেকে।[১৬] মুরারিগুপ্তের মতে, চৈতন্যদেব ছিলেন পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ। ওড়িশায় এই শ্রেণির ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব ছিল না। সেই বিচারে বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় জয়ানন্দের মত স্বীকার করেননি।[১৭] ড. সুকুমার সেন[১৮] ও বিষ্ণুপদ

১২. চৈতন্যভাগবত, ১/২

১৩. জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ২৭ ফেব্রুয়ারি।

১৪. রাজা কপিলেন্দ্রদেবের অপর নাম ছিল ভ্রমর, তাঁর রাজত্বকাল আ. ১৪৩৪-১৪৬৭ খ্রি:।

১৫. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভূমিকা XIVI

১৬. 'বৈষ্ণব লীলামৃত' গ্রন্থটির রচনাকাল ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দ। মাধব পট্টনায়ক ছিলেন চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। চৈতন্যদেবের নীলাচল লীলার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। সেদিক থেকে বিচার করলে গ্রন্থটি অতি মূল্যবান। এতদ্‌সত্ত্বেও গ্রন্থটি আঞ্চলিকতাবাদে দুষ্ট। শুধু চৈতন্যদেব নয়, '*গীতগোবিন্দ*'-এর স্রষ্টা জয়দেব গোস্বামীকেও ওড়িশাবাসী বলে দাবি করেছেন তিনি (অষ্টম অধ্যায়, শ্লোক ৪২-৫৩)। যা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বমহিমায় ভাস্বর সেকালের দুজন খ্যাতিমান বাঙালিকে ওড়িশার অধিবাসী বলে দাবি করার পেছনে যে আঞ্চলিকতাবাদ কাজ করেছে, তা বলাই বাহুল্য। জয়ানন্দ সরল মনে মাধব পট্টনায়কের তথ্য বিশ্বাস করেছিলেন বলেই এই বিভ্রান্তি।

১৭. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, ভূমিকা XIVI

১৮. চৈতন্যাবদান—ড. সুকুমার সেন, পৃ. ২৮

পাণ্ডা[১৯] চৈতন্যদেবকে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ রূপে চিহ্নিত করেছেন।

শ্রীহট্ট থেকে আর যাঁরা নবদ্বীপে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নীলাম্বর চক্রবর্তীও ছিলেন। ইনি বেলপুকুরে এসে বাস করেন। এঁর কন্যা শচীদেবীর সঙ্গে জগন্নাথ মিশ্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে ভক্তিবাদের যে বিস্ফার ঘটেছিল তার উদগাতা ছিলেন শ্রীহট্টের উদ্বাস্তুরা। এঁরা বিদ্যার্জনের জন্য নবদ্বীপে এসেছিলেন।[২০] সেকালে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে আসতেন। পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট ছিল একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। সেকালে এ গ্রামের অনেকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপে এসেছিলেন। জয়ানন্দ অবশ্য জগন্নাথ মিশ্রের দেশত্যাগের কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কেই চিহ্নিত করেছেন।[২১] যা সঠিক বলে মনে হয় না। দুর্ভিক্ষ বা মড়কের কারণে যদি তিনি নবদ্বীপে আসতেন, তা হলে সাত ভাইকে সঙ্গে নিয়েই আসতেন, পরিজনদের ছেড়ে একা আসতেন না। কোনও কোনও ঐতিহাসিক অবশ্য ইসলামের জবরদস্তিকে এর জন্য দায়ী করেছেন।[২২] তা যদি সত্যি হত তা হলে গুটিকয়েক মানুষ শ্রীহট্ট ত্যাগ করে নবদ্বীপ আসতেন না, হিন্দুভাবাপন্ন সকলেই পালিয়ে আসতেন। সেকালে নবদ্বীপ ছিল 'ক্ষিতির প্রদীপ', ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে জনবসতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতির গৌরব ব্যপ্ত হওয়ায় শিষ্টবর্গীয়রা বাসস্থান হিসেবে নবদ্বীপকেই পছন্দ করত।

দুই

সেদিন ছিল শনিবার, দোলপূর্ণিমা এবং চন্দ্রগ্রহণ। ১৪০৭ শকাব্দের ২৩ ফাল্গুন সন্ধ্যায় গ্রহণের পূর্বক্ষণে শচীদেবীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হন শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁর জন্মের সঠিক সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অবধি নেই। তবে বিশিষ্ট কয়েকজন জীবনীকারের রচনায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে,

১৯. শ্রীচৈতন্য প্রদক্ষিণ—বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, পৃ. ২৯

২০. যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৬

২১. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, ২/২/১-৩

২২. চৈতন্যাবদান, পৃ. ২৭-২৮, ১২৯

বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, পৃ. ৩৪

গৌরাঙ্গদেবের জন্মের পর শুরু হয়েছিল চন্দ্রগ্রহণ। এ সম্পর্কে কবি কর্ণপুরের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—

'সুধিনিধি [illegible] সময়ে বিধুন্তুদ
স্তুতোদ সানন্দ মরুন্তুদো ভৃশং।
অলং ত্বয়া সংপ্রতি শীত দীধিতি
সমুদগতোন্যোস্তি ভুবীতি ভাবয়ন।।' [২৩]

অনুঃ—তখন রাহু এই বলে চন্দ্রকে গ্রাস করতে উদ্যত হলেন, হে নিশানাথ। তুমি আর কেন বৃথা উদিত হচ্ছ, ওই দেখো অপর চন্দ্র পৃথিবীতে উদিত হয়েছেন।

চৈতন্যপরিকর বাসু ঘোষ রচিত একটি পদে এবং চৈতন্যচরিতামৃতে এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে।[২৩ক] অবশ্য বৃন্দাবনদাস গ্রহণের সময় গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[২৩খ]

কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মের পর মিশ্র পরিবার খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠল। যথা নিয়মে জাতকের ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন, নামকরণ ইত্যাদি লৌকিক সংস্কার সম্পন্ন হল। মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী জাতকের নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর, সম্ভবত জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামের সঙ্গে মিলিয়েই এই নাম রাখা হয়েছিল। প্রতিবেশী মহিলারা এর নাম দিলেন নিমাই, মৃতবৎসার পুত্র বলে এই নাম। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

'ইহার অনেক জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্যা নাঞি।
শেষে যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাঞি।।' [২৪]

জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিশ্বরূপ। এঁর জন্মের পরে সাত-আটটি সন্তানের অকালপ্রয়াণ ঘটায় ডাকিনী, শাকিনীর আক্রোশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী জাতকের নামকরণ করেছিলেন নিমাই। নিম ফলের মতো তেতো নামের জাতককে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। নিমাইয়ের অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তির জন্য লোকে বলত গৌর, গোরা, গোরাচাঁদ বা গৌরাঙ্গ। উত্তরকালে তিনি নিমাই পণ্ডিত নামেই সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বম্ভরের হাতেখড়ি, কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ কার্য

২৩. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্—কবি কর্ণপুর, ৪০/২
২৩ক. চৈ. চ, ১/১৩
২৩খ. চৈ. ভা, ১/২
২৪. চৈতন্যভাগবত, ১/৪

সম্পন্ন হল। তাঁর বিদ্যাশিক্ষার সূচনা হল বিষ্ণু পণ্ডিত ও সুদর্শন পণ্ডিতের পাঠশালায়। পরে ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য তাঁকে ভরতি করা হয়েছিল গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে। এদিকে তাঁর দুরন্তপনাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। মিশ্রবাড়িতে অতিথি এলে শিশু নিমাই তার অন্ন-ব্যঞ্জন ভক্ষণ করে স্বপাকে নিবেদনরত বিপ্রকে বিব্রত করতেন, সমবয়সীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে ঝগড়া-মারামারি করতেন, অন্যের গৃহে উপনীত হয়ে সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য চুরি করে খেতেন। পাঠশালার পড়াশুনা সমাপ্ত করে বয়স্যদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে উপনীত হতেন। জলে নেমে এমন দাপাদাপি করতেন যে, উপস্থিত স্নানার্থীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। সাঁতারের সময় পায়ের জল ছিটিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের গায়ে লাগতেন, 'কুল্লোল' করে অন্যের গায়ে জল ছিটিয়ে দিতেন, জলে ডুব দিয়ে কারও বা পা ধরে টানতেন। বয়স্করা নিষেধ করলে তিনি তা কানেই তুলতেন না। কেউ কেউ তাঁর পিতামাতার কাছে গিয়ে অভিযোগ জানাতেন। কিন্তু দুরন্ত নিমাই পিতা-মাতা কাউকেই ভয় পেতেন না। মাতা শচীদেবী শাসন করতে গেলে নিমাই বাড়ির বাসনপত্র ভেঙে তছনছ করে দিতেন। একবার নিমাইয়ের ছোড়া ইটের আঘাতে শচীদেবী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।[২৫]

নিমাইয়ের দুরন্তপনা চরম আকার ধারণ করেছিল গঙ্গার ঘাটে। সেখানে বিষ্ণুর উপাসনায় রত ভক্তের নৈবেদ্য ভক্ষণ করে পলায়ন করতেন, ধ্যানরত বিপ্রের গায়ে জল ছিটিয়ে ধ্যান ভঙ্গ করে দিতেন, স্ত্রী-পোশাক আর পুরুষ-পোশাকে বদল ঘটিয়ে স্নানার্থীদের লজ্জায় ফেলে দিতেন। ব্রত উদ্‌যাপনকারী বালিকারা ফুল-ফল সহ গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হলে নিমাই তাদের উপচারসমূহ জোর করে কেড়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিতেন। বালিকাদের চুলে ওকড়ার বিচি গুঁজে দিতেন, আবার কোনও কোনও বালিকাকে বিয়ে করতে চাইতেন। দুরন্ত নিমাইয়ের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

'ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ হিরণ্যসদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে।।
শিশু সব লইয়া পাড়া পড়শীর ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে।।

২৫. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্, ২/৭৯
চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ১/১৪
মুরারিগুপ্তের কড়চা, ১/৬/২২
চৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস ঠাকুর, কালীকিশোর বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, পৃ. ৪০

শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন।।
কেনে চুরি কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে।।
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ঘর-ভিতর যাএগ্রা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া।।' [২৬]

এখানে একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, জীবনীকারদের কাছে চৈতন্যদেব ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর, কৃষ্ণের অবতার। তাই ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের বাল্যলীলার চমকপ্রদ ঘটনাগুলি যে জীবনীকারদের প্রভাবিত করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। আবার দুর্লভ অঙ্গকান্তির কারণে প্রতিবেশীদের কাছে নিমাই ছিলেন প্রিয়পাত্র; তাঁর হাজারও দৌরাত্ম্য তারা হাসিমুখে স্বীকার করে নিত। কনিষ্ঠ পুত্র হিসেবে নিমাই পিতামাতার কাছেও সীমাহীন প্রশ্রয়ের মধ্যে মানুষ হচ্ছিলেন, তাই তিনি দুরন্ত হয়ে উঠেছিলেন। পিতামাতা আর তাঁকে সংযত করতে পারছিলেন না। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় তা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে—

'নিরন্তর চপলতা করে সবা সনে।
মায়ে শিখালেও তবু প্রবোধ না মানে।।
শিখাইলে হয় আর দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল।।
ভয়ে আর কিছু না বলয়ে বাপ মায়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায়।।' [২৭]

আসলে শিশুকাল থেকেই নিমাই খেলার ছলে প্রচলনির্ভর সংস্কারকে ভেঙে দিতে চাইছিলেন। জয়ানন্দের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, একদিন জগন্নাথ মিশ্র ভোজনে বসেছেন, এমন সময় নিমাই এসে পিতার গলার যজ্ঞসূত্র কেড়ে নিয়ে মামার বাড়ি পালিয়ে গেলেন।[২৮] এ ঘটনা নিছক শিশুসুলভ দৌরাত্ম্য ছিল না, এর গভীরে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার বীজ লুকিয়ে ছিল। যে আদর্শ তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন সমাজে, এগুলি ছিল তার প্রাথমিক পর্যায়। শিশুকাল থেকেই তিনি আঘাত করার প্রক্রিয়াকে রপ্ত করে নিতে চাইছিলেন। যাতে

২৬. চৈতন্যচরিতামৃত, ১/১৪

২৭. চৈতন্যভাগবত, ১/৬

২৮. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, নদিয়া ১৫০

কার্যকালে তিনি অটল থাকতে পারেন।

এরই মধ্যে মিশ্র পরিবারে নেমে এল বিপর্যয়। নিমাইয়ের অগ্রজ ভ্রাতা তরুণ যুবক বিশ্বরূপ হঠাৎ একদিন গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে বসলেন। অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পিতামাতার অবস্থাও তথৈবচ। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের চতুর্থ অঙ্কের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনার পর আতঙ্কিত শচীদেবী পুত্রের সমস্ত পুথিপত্র পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আশঙ্কা, পুথিপত্র পাঠ করে কনিষ্ঠ পুত্রটিও আবার জ্যেষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, তাই এই সতর্কতা। জগন্নাথ মিশ্রও কনিষ্ঠ পুত্রটির ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন—

'অতএব ইহার পড়িয়া কার্য নাঞি।
মূর্খ হইয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞি।।' [২৯]

পিতার এই সিদ্ধান্তে নিমাই ব্যথিত হলেন ঠিকই, কিন্তু পিতৃবাক্য লঙঘন করতে পারলেন না। ফলে যা হওয়ার তাই হল, নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। এখন তাঁর হাতে অফুরন্ত সময়। সুতরাং আবার শুরু হল নিমাইয়ের দৌরাত্ম্য। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় এই পর্বের একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে—

'কিবা নিজ ঘরে প্রভু কিবা পর ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে।।
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্বরাত্রি শিশু সঙ্গে নানা ক্রিড়া করে।।
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষ প্রায় হইয়া চলয়ে কুতূহলী।।
যার বাড়ী কলাবন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষ হৈয়া ভাঙ্গয়ে আপনে।।
গরু জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ শিশু সংহতি পলায়।।' [৩০]

দুরন্ত নিমাইয়ের এহেন আচরণেও জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন নির্বাক। পুত্রকে তিনি কিছুই বলতেন না। এরই মধ্যে একদিন পরিত্যক্ত হাঁড়ির গাদায় অশুচি

২৯. চৈতন্যভাগবত, ১/৬
৩০. তদেব

স্থানে অনড় হয়ে উপবেশন করলেন বিশ্বম্ভর। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন শচীদেবী, দুরন্ত পুত্রকে তিরস্কার করে বললেন যে, এতদিনেও কি তোর জ্ঞান হল না, অপবিত্র স্থানে গিয়ে বসেছিস। উত্তরে নিমাই বললেন—

'প্রভু বোলে তোরা মোরে না দিস পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমতে।।
মূর্খ আমি না জানিয়ে ভাল মন্দ স্থান।
সর্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান।।... ...
প্রভু বলে যদি মোরে না দেহ পড়িতে।
তবে মুঞি নাহি যাঙ কহিল তোমাতে।।'[৩১]

এইভাবে অনড় নিমাই পিতার কাছে অধ্যয়নের অনুমতি নিয়ে তবেই ছাড়লেন। জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে ভরতি করে দিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাঠশালায়। সেখানে সহপাঠী হিসেবে পেলেন মুরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতিকে। এই কৃষ্ণানন্দ কিন্তু আগমবাগীশ নন, ইনি পরম ভাগবত রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্র, আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে, এঁরা ছিলেন তিন ভাই।[৩২]

পাঠশালায় সহপাঠীদের নেতা ছিলেন নিমাই। সকলকে 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করে বিব্রত কবতেন। পাঠ সমাপনান্তে গঙ্গার ঘাটে এসে কোন্দল বাধিয়ে দিতেন।

'প্রথম বয়স প্রভুর স্বভাব চঞ্চল।
পড়ুয়াগণের সহ করয়ে কোন্দল।।
কেহ বলে তোর গুরু কিবা বুদ্ধি তার।
কেহ বলে এই দেখ আমি শিষ্য যার।।' [৩৩]

এইভাবে কথা কাটাকাটি হতে হতে শুরু হত জল ছোড়াছুড়ি, কাদা নিক্ষেপ, অবশেষে মারামারি। এসব দুরন্তপনার মাঝেও যখন তিনি পুস্তক নিয়ে পড়তে বসতেন তখন তাঁর একাগ্রতা ছিল শিক্ষণীয়। এইসময় তিনি ব্যাকরণের একটি টীকাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এটি বাংলার পণ্ডিত সমাজে সমাদর লাভ করেছিল।[৩৪] তিনি যে শুধুমাত্র কলাপ ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তাই নয়, অলংকার

৩১. তদেব

৩২. নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত—মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫-৪৭

৩৩. চৈতন্যভাগবত, ১/৭

৩৪. তদেব ১/১২

শাস্ত্র এবং সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাতেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।[৩৫] তা যদি না হত তা হলে তিনি কেশব কাশ্মীরির মতো দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে অনায়াসে পর্যুদস্ত করতে পারতেন না। শুধু তাই নয়, পর্যাপ্ত শাস্ত্রজ্ঞান না থাকলে নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের পক্ষে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর মতো মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে এবং বাসুদেব সার্বভৌমের মতো খ্যাতিমান পণ্ডিতকে স্বমতে আনয়ন করা সহজ ছিল না। সাহিত্যে ও অলংকার শাস্ত্রে চৈতন্যদেবের যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তার আভাস পাওয়া যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ[৩৬] ও বৃন্দাবনদাসের[৩৭] রচনায়। জয়ানন্দের মতে, তিনি কাব্য, নাটক, স্মৃতি, তর্ক সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।[৩৮]

মুরারিগুপ্তের মতে, নিমাই গুরুগৃহে অন্তেবাসী থেকে বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন।[৩৯] শ্রীগৌরাঙ্গ যে বিষ্ণু পণ্ডিত, সুদর্শন পণ্ডিত এবং গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন মুরারিগুপ্ত[৪০], কবি কর্ণপুর[৪১], লোচনদাস[৪২] প্রভৃতি জীবনীকারদের গ্রন্থে তা প্রস্ফুটিত হয়েছে। বৃন্দাবনদাস নিমাইয়ের বিদ্যার্জন সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি গঙ্গাদাস ব্যতীত অপর

৩৫. Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal—Dr. Sushil Kumar De, P-71
The Chaitanya Movement—A Study of Vaishnavism of Bengal—M. T. Kennedy, PP-14-15
চৈতন্যাবদান—সুকুমার সেন, পৃ. ৩৩

৩৬. চৈতন্যচরিতামৃত, ১/১৬
'ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাষ।।'—শ্রীগৌরাঙ্গ পরাজিত পণ্ডিতকে সান্ত্বনা দিয়ে এ কথা বলেছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, ভবভূতি, জয়দেব ও কালিদাসের মতো খ্যাতিমান কবিদের রচনার সঙ্গে চৈতন্যদেব পরিচিত ছিলেন।

৩৭. চৈতন্যভাগবত, ১/১০
'প্রভু বলে এ সকল শব্দ অলংকার।
শাস্ত্র মতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার।।'—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের গঙ্গাস্তোত্র শুনে নিমাই পণ্ডিত শব্দ অলংকারের ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। অলংকার শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে তা সম্ভব ছিল না।

৩৮. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, নদিয়া, ১৬/৫

৩৯. মুরারিগুপ্তের কড়চা, ১/৮/১২

৪০. তদেব, ১/৮

৪১. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্, ৩/২-৩

৪২. চৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস, পৃ. ৫৮

কোনও শিক্ষাগুরুর নাম উল্লেখ করেননি।[৪২ক] তবে বিদ্যার্জনের প্রতি কিশোর বিশ্বম্ভরের গভীর নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তা শিক্ষার্থীদের আজও অনুকরণীয়—

'খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্ধেক পুস্তক ছড়িয়া নাহি নড়ে।।' [৪৩]

তিন

বেশ চলছিল। পড়াশুনা, দুরন্তপনার পাশাপাশি নিমাই বুঝে নিচ্ছিলেন সমাজের অন্তিম রসায়ন। তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে সবার অলক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন চৈতন্যদেব। এমন সময় মিশ্র পরিবারে আবার ঘটে গেল অঘটন, মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে প্রয়াত হলেন জগন্নাথ মিশ্র। শচীমাতা শোকসাগরে নিমজ্জিত হলেন। নিমাই মাকে সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করলেন। শচীদেবী স্বামীকে হারিয়েও পুত্রের মুখ চেয়ে শোক সংবরণ করলেন। পিতৃবিয়োগের পর নিমাইয়ের চঞ্চলতার কিছুটা প্রশমন ঘটেছিল বলেই মনে হয়। তবে বৃন্দাবন দাসের একটি বর্ণনায় অসহিষ্ণু গোরাচাঁদের রুদ্রমূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৩ক] বিষ্ণুপুজোর উপকরণ হাতের কাছে জোগাড় না থাকায় শচীনন্দন ঘরে ব্যবহারোপযোগী সমস্ত দ্রব্য ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিলেন। কী কী ভেঙেছিলেন তা জানার জন্য আসুন আমরা বৃন্দাবনদাসের শরণাপন্ন হই—

'যতেক আছিল গঙ্গা জলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধবশ।।
তৈল ঘৃত লবণ আছিল যাতে যাতে।
সর্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাতে।।
ছোট বড় ঘরে যত ছিল ঘট নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান।।
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল ঘৃত দুগ্ধ।
তণ্ডুল কার্পাস ধান্য লোন বড়ী মুদ্গ।।

৪২ক. চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস

৪৩. চৈতন্যভাগবত, ১/৬

৪৩ক. তদেব, ১/৭

যতেক আছিল সিকা টানিয়া টানিয়া।
ক্রোধাবেশে পেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।।
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খানি খানি করি চিরি পেলে দুই করে।।
সব ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষ।
তবে শেষে গৃহ প্রতি হৈল ক্রোধাবেশ।।' [৪৩খ]

সেকালের একটি সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির বাস্তব চিত্রটি অতি নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন বৃন্দাবনদাস। জগন্নাথ মিশ্র যে দরিদ্র ছিলেন, তাঁর গৃহে যে দামি তৈজসপত্র বলতে কিছুই ছিল না, উপরের বর্ণনাটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পিতার মৃত্যুর পরে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল সংসারে। কোনও উপার্জন নেই। নিমাইয়ের সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। শচীমাতা বললেন, 'ঘরেতে সম্বল নাহি কালি কি খাইবা।' মায়ের কথা শুনে শচীনন্দন হাসতে লাগলেন, বললেন, 'কৃষ্ণ পোষ্টা করিবে পালন।' পিতৃবিয়োগের পর আরও দু-তিন বছর নিমাই অধ্যয়ন করেছিলেন। অসচ্ছল পরিবারে কীভাবে তা সম্ভব হল চরিতকারদের রচনায় তা স্পষ্ট নয়।

এদিকে গঙ্গার ঘাটে বল্লভাচার্যের সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে দেখে নিমাইয়ের অনুরাগ জন্মাল। তাঁর বয়স তখন ষোলো বছর। মুরারিগুপ্ত, কবি কর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস ও লোচন একদিনের সাক্ষাতেই নিমাইয়ের অনুরাগ জন্মেছিল বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ[৪৪] দুবার সাক্ষাতের বর্ণনা করেছেন। এরপর বনমালী আচার্যের ঘটকালিতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরচন্দ্রের পরিণয় সুসম্পন্ন হল। বল্লভাচার্য ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাই পঞ্চ হরীতকী দিয়ে কন্যা দান করলেন।

এবার তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। সংসারের প্রয়োজনে তিনি টোল খুলে বসলেন মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে। অর্থাৎ চৈতন্যদেব সর্বসাকুল্যে দশ-এগারো বছর কাল অধ্যয়ন করে সর্বশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। অদ্বৈতপ্রকাশের একটি তথ্য থেকে জানা যায়, পাঁচ বছর বয়সে নিমাইয়ের হাতেখড়ি হয়েছিল।[৪৫] আর ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন।[৪৬]

৪৩খ. তদেব, ১/৭

৪৪. চৈতন্যচরিতামৃত, ১/১৪, ১/১৫

৪৫. অদ্বৈত প্রকাশ—ঈশান নাগর, দশম অধ্যায়

৪৬. চৈতন্যভাগবত, ১/৯

অর্থাৎ তিনি ১৪৯১ হতে ১৫০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যয়নকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। চৈতন্যভাগবতের দোহাই দিয়ে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি লিখেছেন যে, '১৩/১৪ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের জন্য তিনি পাঠ সমাপ্ত করতে বাধ্য হয়ে ভরণপোষণের নিমিত্ত নিজেই একটি টোল স্থাপন করেন।'[৪৭] অথচ চৈতন্যভাগবতকার আদিখণ্ডের নবম অধ্যায়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, নিমাইয়ের যখন ষোলো বছর বয়স তখনও তিনি গঙ্গাদাসের টোলে অধ্যয়নরত।[৪৮] কীভাবে তিনি এই ভ্রান্ত তথ্যটি পরিবেশন করলেন তা বোধগম্য নয়।

মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল স্থাপন করে শ্রীগৌরাঙ্গ পরিচিত হলেন 'নিমাই পণ্ডিত' নামে। সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা এবং তীক্ষ্ণ ধীশক্তির খ্যাতিতে তাঁর টোলে অসংখ্য ছাত্র এসে উপস্থিত হল। তবে এর ফলে তাঁর আর্থিক অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটল না। কারণ, সে যুগে 'টোল বা চতুষ্পাঠীর শিক্ষা ছিল অবৈতনিক, শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিষ্যদের কোনও ব্যয়ভার বহন করতে হত না। উপরন্তু গুরুগৃহে আহার ও বাসস্থান মিলত ছাত্রদের।'[৪৯]

এই পর্বেও নিমাইয়ের ঔদ্ধত্য-অহংকার বজায় ছিল। 'বিদ্যারসে করে প্রভু যত অহংকার।' পথে যার সঙ্গে দেখা হত তাকেই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন। নিমাই পণ্ডিতকে পথে দেখলেই পুরবাসী অন্য পণ্ডিতেরা পলায়ন করতেন। এই সময় কেশব কাশ্মীরি নামক ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে নিমাই নবদ্বীপের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অবশ্য ঘটনাটির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ আছে। যে গঙ্গাস্তোত্রটির নানাবিধ দোষত্রুটি উল্লেখ করে নিমাই পণ্ডিত কেশব ভট্ট কাশ্মীরিকে পর্যুদস্ত করেছিলেন, চতুর্দশ শতকে বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে তার দোষাভাস মীমাংসাপূর্বক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও কেশব কাশ্মীরির সময়কাল নিয়েও ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

চার

চৈতন্যদেবের জ্ঞান ও মনীষা ক্রমশ বিকশিত হচ্ছিল। উত্তরকালে যিনি সমাজকে নতুন আদর্শে দীক্ষিত করবেন, সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করবেন নিজেকে, তিনি

৪৭. যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্য—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি, পৃ. ১৫
৪৮. চৈতন্যভাগবত, ১/৯
৪৯. নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২

ক্রমশ সংস্কারকে ভাঙতে চাইছিলেন, মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছিলেন। টোলের শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়ে মাঝেমধ্যে নগরভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন তিনি। ব্রাত্য প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশতেন। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

'নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।
সবার সহিতে করে হাসিয়া সম্ভাষ।।' [৫০]

নিমাই তাঁতি, গোয়ালা, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বুলি, শঙ্খবণিক সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে মিশতেন। একমাত্র তিনিই বর্ণভেদের গণ্ডি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। অন্ত্যজ সমাজের মানুষ চৈতন্যদেবকে আপন করে নিয়েছিলেন, গড়ে উঠেছিল হার্দিক সম্পর্ক। যা পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের ধর্মীয় আন্দোলনকে, শক্তিশালী করেছিল। কাজির অনৈতিক নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সংগঠিত নগর-সংকীর্তনে নবদ্বীপের আপামর জনগণ যোগদান করেছিল চৈতন্যদেবের আহ্বানে। মোট কথা এই গণসংযোগ চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনকে রসদ জুগিয়েছিল।

এমনিভাবেই এগিয়ে চলছিল বিশ্বম্ভরের জীবন-প্রবাহ। একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যাবেন। তখন তাঁর বয়স আনুমানিক কুড়ি বছর। বিশ্বম্ভর পূর্ববঙ্গের কোথায় গিয়েছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিরোধ আছে। চূড়ামণি দাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি শ্রীহট্ট নগরে গিয়েছিলেন।[৫১] জীবনীকারদের রচনা থেকে জানা যায় যে, মূলত অর্থ উপার্জনই ছিল তাঁর পূর্ববঙ্গ যাত্রার মূল কারণ।[৫২] লোচনদাস এবং বৃন্দাবনদাস উভয়েই ধন উপার্জনের কথা স্বীকার করেও হরিনাম প্রচারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রাগুক্ত তথ্যটি স্বীকার করার ক্ষেত্রে বাধা আছে। কারণ, গয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে গৌরাঙ্গ নাম প্রচারে কোনও ভূমিকা পালন করেছিলেন—এমন তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।

নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গেও প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর রচিত ব্যাকরণের টীকাগ্রন্থ বাংলার টোলগুলিতে পড়ানো হত।[৫৩] বিশ্বম্ভরকে পেয়ে পরম উল্লাসে পড়ুয়ারা তাঁর কাছে বিদ্যার্জনের জন্য সমবেত হয়েছিলেন।

৫০. চৈতন্যভাগবত, ১/১০

৫১. গৌরাঙ্গবিজয়—চূড়ামণি দাস, পৃ. ৯৯

৫২. জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, উত্তরখণ্ড; লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, আদি খণ্ড, পৃ. ৬৯; মুরারি গুপ্তের কড়চা, ১/১১

৫৩. চৈতন্যভাগবত, ১/১২

ওখানে তপন মিশ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি তাঁকে বারাণসী চলে যেতে বলেছিলেন।[৫৪] পরবর্তীতে এই তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনে ষড়গোস্বামীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই বিচারে তপন মিশ্র ছিলেন চৈতন্যদেবের প্রথম শিষ্য বা পরিকর।[৫৫]

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে আসতে পারে যে, তা হলে চৈতন্যদেব কি গয়া গমনের পূর্বেই সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন? চরিতকারদের জীবনীগ্রন্থগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে এ ধারণার সমর্থন মেলে না। বরং তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ না করে পিতামাতার সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—

'ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল।।
আমি ত' করিব তোমা দু'হার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈলা মাতাপিতার মন।।' [৫৬]

সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণের পরিকল্পনা কিশোর বয়সেই যে তাঁর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল, এমন ধারণার বাস্তবতা নেই। ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বিদ্যাগর্বিত ভক্তিহীন ব্যক্তি বিবাহ করে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করতে গিয়েই কৃষ্ণভক্ত হয়ে কৃষ্ণভক্তি উপদেশ দিলেন ও কাশীতে তপন মিশ্রের সঙ্গে সাত-আট বৎসর পরের সাক্ষাৎকারের আভাস দিলেন এমন ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়।'[৫৭] মুরারিগুপ্ত এবং কবি কর্ণপুর পূর্ববঙ্গে হরিনাম প্রচারের কোন সংবাদ পরিবেশন করেননি।

এইসময় বিশ্বম্ভরের পত্নীবিয়োগ ঘটেছিল। সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটেছিল লক্ষ্মীপ্রিয়ার। ওঝা-বৈদ্য ডেকে এনে পুত্রবধূকে বাঁচানোর বহু চেষ্টা করেছিলেন শচীমাতা, কিন্তু সফল হননি। প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মুরারিগুপ্তের বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—

'এবং স্থিতা গৃহে কালে দৈবাদাগত্য কুণ্ডলী।
অদশৎ পাদমূলে তাং লক্ষ্মীমালক্ষ্য মা শচী।।

৫৪. তদেব, ১/১২
৫৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮
৫৬. চৈতন্যচরিতামৃত, ১/১৪
৫৭. যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, পৃ. ১৩৪

ব্যজিজ্ঞপৎ মহাভীতিযুক্তা জাঙ্গলিকান্ সুষাম্।
সমানীয়াফবোদ্ যত্নং তদ্বিষস্য প্রমার্জ্জনে।।' ১/১১/২১-২২

লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু যে সর্পদংশনেই ঘটেছিল কবি কর্ণপুর (মহাকাব্য ৩/১০১), জয়ানন্দ (৫৮/১-২), লোচন (আদিখণ্ড, পৃ. ৭১), কবিরাজ গোস্বামী (১/১৬) তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। বৃন্দাবনদাস এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্র লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও নির্দেশ করেননি। অথচ শাশুড়ি শচীদেবীর নির্যাতনে লক্ষ্মীপ্রিয়া আত্মহত্যা করেছিলেন বলে আহমদ শরিফের মন্তব্যটি আপত্তিজনক।[৫৮] মধ্যযুগে বাংলার সমাজগঠনের ধারণাটি বোধহয় শরিফের কাছে স্পষ্ট ছিল না। সে যুগে বধূ-নির্যাতনের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। তা ছাড়া ঘটনাটি যদি সত্যি হত তাহলে কোনও না কোনও জীবনীকারের লেখায় তা নিশ্চয়ই ধরা পড়ত। প্রমাণ হিসেবে তিনি নদিয়ার অবৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তির উল্লেখ করেছেন। জানতে ইচ্ছা করে, এ ধরনের অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত কিংবদন্তিটি তিনি কার কাছে শুনেছিলেন। আমরা নবদ্বীপের বাসিন্দা হয়েও তা শুনতে পাইনি বলে পরমপুরুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় ঠিকই, তবে স্মরণে রাখতে হয় তা যেন ঐতিহ্যকে পুরোপুরি অস্বীকার না করে। শরিফের কল্পনার যদি বাস্তব ভিত্তি থাকত তা হলে অল্পকালের মধ্যে নবদ্বীপেই গৌরাঙ্গের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া সম্ভব হত না।

লক্ষ্মীপ্রিয়াকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন চৈতন্যদেব, তাঁকে হারিয়ে জীবনের প্রতি তিনি অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মাতা শচীদেবী যাতে আঘাত না পান সে জন্য তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণে তা প্রকাশ পেত না। পূর্বের ন্যায় টোলে অধ্যাপনার কাজ চলতে লাগল। সকালে দু-প্রহর পাঠদানের পর স্নান ভোজন বিশ্রাম, আবার সন্ধ্যায় অর্ধরাত্র পর্যন্ত পাঠদান ছিল চৈতন্যদেবের পঠনরীতি।[৫৯] কিন্তু শচীদেবী বুঝেছিলেন বিশ্বম্ভরের অন্তরে চলছে সীমাহীন যন্ত্রণা, ছেলে যাতে বিবাগী না হয়ে যায়, সে জন্য তিনি তড়িঘড়ি সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে নির্বাচন করে বিশ্বম্ভরের বিয়ে দিয়ে দিলেন। এ বিয়েতে চৈতন্যদেবের যে তেমন আগ্রহ ছিল না মুরারিগুপ্তের কড়চায় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৬০] শুধুমাত্র মায়ের আগ্রহাতিশয্যে বিশ্বম্ভব

৫৮. চৈতন্যদেব ঃ ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ২৫৭, 'ইসলাম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ' প্রবন্ধের পাদটীকা।

৫৯. চৈতন্যভাগবত, ১/১৩

৬০. মুরারিগুপ্তের কড়চা, ১/১৩/১৮-২৩, ১/১৪/২

এ বিয়েতে আপত্তি জানাতে পারেননি। লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর যে মধুর সম্পর্কের ইঙ্গিত চরিতগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তা ছিল অনুপস্থিত।

সনাতন মিশ্র ছিলেন রাজপণ্ডিত, সম্পন্ন গৃহস্থ। তিনি এ বিয়েতে প্রচুর যৌতুক দিয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন—

'তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসীদাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস।।'[৬১]

এ বিবাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল, জাঁকজমক হয়েছিল। বরপক্ষের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন বুদ্ধিমন্ত খান ও মুকুন্দ-সঞ্জয়। দ্বিতীয় পরিণয়ের অল্পকাল পরেই বিশ্বম্ভর গয়া গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পাঁচ

অন্তর্জলি যাত্রায় অবস্থানরতকালে জগন্নাথ মিশ্র পুত্র বিশ্বম্ভরকে অন্তিম ইচ্ছা জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন—

'আমার বচন বাপু কর অবধান।
তুমার মাএর জেন নহে অপমান।।
তুমার অবতারে সর্বলোক পরিত্রাণ।
গয়াতে আমার বাপু দিও পিণ্ডদান।।'[৬২]

পিতৃসত্য পালন ছাড়াও হয়তো তাঁর গয়াযাত্রার অন্যতম কারণ ছিল স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করা। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন মেসোমশাই চন্দ্রশেখর আচার্য ও আরও অনেকে। জয়ানন্দ জানিয়েছেন, আচার্যরত্নের সঙ্গে গোবিন্দ, জগদানন্দ, গদাধর, গোপীনাথ, মুরারি, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর ও হরিদাস ঠাকুর গয়াযাত্রার সঙ্গী ছিলেন।[৬৩] চূড়ামণি দাস ও জয়ানন্দ—এঁরা দুজনেই গয়াগমনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। পিণ্ডদান পর্ব সমাপ্ত করে তীর্থযাত্রীর এই দলটি

৬১. চৈতন্যভাগবত, ১/১৩

৬২. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, নদিয়া ৩০/১৪-১৫

৬৩. তদেব, ৩৪/২৮-২৯

তিনমাস পর আবার নবদ্বীপে ফিরে এসেছিলেন। বিশ্বম্ভর গয়া যাত্রা করেছিলেন ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবরের শেষার্ধে আর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধে।

গয়া গমন চৈতন্যদেবের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট। এখানে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। দশনামী শৈব-সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর সান্নিধ্যে বিশ্বম্ভর ভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করলেন।[৬৪] দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বম্ভরের দেহে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ ঘটতে লাগল। কৃষ্ণবিরহে তিনি কেঁদে আকুল হলেন, তাঁর আঁখি হতে অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরতে লাগল। পরমপুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনাকাঙক্ষায় তিনি মথুরা-বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সঙ্গীরা তাঁর এই সিদ্ধান্তে কাঁদাকাটি শুরু করে দিলেন, অনেক করে বোঝালেন, অবশেষে মত পরিবর্তন ঘটায় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করলেন।

বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে ফিরে এলেন ঠিকই, কিন্তু গয়ায় বিসর্জন দিয়ে এলেন তাঁর ঔদ্ধত্য, তাঁর অহংকার। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় পাই—

'পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাই পণ্ডিত হৈল পরম বৈষ্ণব।।...
পরম বিরক্তরূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ।।...
পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কয়।
সবে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর বিনয়।।'[৬৫]

গয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর নিমাই হলেন অন্য মানুষ—পরম নম্র, বিনয়ী এবং 'অন্তর্মুখী স্বভাবের মূর্তিমান বিগ্রহ'। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। নবদ্বীপে ফিরে এসে নিমাই বৈষ্ণবগোষ্ঠীতে যোগ দিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে মিলিত হলেন মুরারি, শ্রীবাস, সদাশিব, গদাধর, শ্রীমান পণ্ডিত প্রমুখ বৈষ্ণবের সঙ্গে। এই সময়ে ভাবোন্মাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কৃষ্ণনাম ব্যতীত

৬৪. মুরারিগুপ্তের কড়চা ১/১৫/১৮
চৈতন্যভাগবত, ১/১৫
চৈতন্যমঙ্গল—লোচন, আদি খণ্ড, পৃ. ৮২
চৈতন্যচরিত মহাকাব্য—কবি কর্ণপুর, ৪/৫৮-৬০

৬৫. চৈতন্যভাগবত, ২/১

অন্য কথা মুখে আসত না। টোলে শিষ্যদের পাঠদানকালে কৃষ্ণনামে মুখর হলেন। হাতে তালি দিয়ে শিষ্যগণকে কীর্তন শিক্ষা দিতে লাগলেন—

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।' [৬৬]

নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা গৌরাঙ্গের বাড়িতে মিলিত হতে লাগল। শচীদেবী হয়তো এসব পছন্দ করতেন না।[৬৭] তাঁর অন্তরে নিমাইকে হারানোর ভয় ছিল। এই পর্বে শ্রীবাসগৃহ হল মিলনস্থল। সেখানে সকল ভক্ত মিলিত হয়ে কীর্তনানন্দে মেতে উঠতেন। একদিন অদ্বৈত আচার্য সকল ভক্তের সামনে বিশ্বম্ভরকে কৃষ্ণের অবতার রূপে ঘোষণা করলেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে মিলিত হয়ে ভক্তরা ইষ্টগোষ্ঠী করতেন, সারারাত কীর্তন করতেন। স্বগোষ্ঠী ভিন্ন সেখানে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বিশ্বম্ভর মৃদঙ্গের তালে তালে নৃত্য করতেন, ভাবে উন্মাদ হয়ে বিলাপ করতেন, বিষ্ণুখট্টায় উঠে হুঙ্কার ছাড়তেন। পরিকরেরা তাঁর মস্তকে ছত্র ধারণ করত, চামর ব্যঞ্জন করত।

এই পর্বে চৈতন্যদেবের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে কীর্তন-সংগীতের সংস্কার। 'প্রাক্ চৈতন্যযুগে কীর্তন ছিল উপাসনা সঙ্গীত, দেবতার গর্ভগৃহে ভক্তরা গাইতেন। চৈতন্যদেব কীর্তনকে বন্দীদশামুক্ত করে সর্বসাধারণের সঙ্গীত করে তুললেন। চৈতন্যদেবের হস্তস্পর্শে কীর্তন গান সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। উদ্বেল গীতধারা সমুদ্রস্রোতের মতো সমাজকে প্লাবিত ও উদ্দীপিত করে নবনির্মিত খাতে প্রবাহিত হতে লাগল। বৈষ্ণব-গৃহী, উচ্চকোটি, নিম্নকোটি, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নাম-সংকীর্তনের অধিকার পেল।'[৬৮]

চৈতন্যদেব নগর-সংকীর্তনের প্রবর্তন করে সমাজকে সংহত করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, বিশ্বের সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে তা দ্বিতীয়রহিত। জাতপাতের সীমারেখাকে উল্লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, ধর্মাচরণে ঐক্য প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে, জনশক্তিকে সংহত করে সমাজ-কল্যাণে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে সংকীর্তনের সীমাহীন গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'বাংলায় একদিন বৈষ্ণব ভাবের প্রাবল্যে ধর্ম সাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডিমোক্রেসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার

৬৬. তদেব
৬৭. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ১৩৬
৬৮. নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১

কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা জায়গা হল।'[৬৯] আসলে গণতন্ত্রের উদ্‌বোধনে কীর্তন গানের সার্বিক আবেদন মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। আর তা করেছিল বলেই কীর্তন হয়ে উঠেছিল জনজাগরণের মহামন্ত্র।

বৃন্দাবনদাস তো চৈতন্যদেবকে সংকীর্তনের পিতা রূপে বর্ণনা করেছেন।[৭০] কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট চৈতন্যদেব টোলে অধ্যাপনা কালে কৃষ্ণকথা ছাড়া তাঁর মুখে আর যখন কিছুই স্ফুরিত হচ্ছে না, তখন তিনি পাঠদান পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করে সকলকে কীর্তন করতে বললেন—

'পড়িলাম শুনিলাম যত দিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি।।
শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্ত্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শচীর নন্দন।।
দিশা শিখায়েন প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া।।' [৭১]

সংকীর্তন কেমন শিষ্যগণ তা জানে না। এর থেকেই বোঝা যায় সে যুগে বাংলায় কীর্তনের প্রচলন ছিল না, চৈতন্যদেবই প্রথম এখানে তা প্রবর্তন করেন।

চৈতন্যদেবের মতো বন্দিত প্রতিভা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করায় ভক্তদের হৃদয়ে দেখা দিল উচ্ছ্বাস। অপরদিকে ধর্মের মানবিক আবেদনকে জনকল্যাণের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চৈতন্যদেবের অতুলন প্রচেষ্টার দীপ্তি দিকে দিকে প্রসারণের ফলে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বৈষ্ণব ভক্তরা নবদ্বীপে এসে মিলিত হতে লাগলেন। চট্টগ্রাম থেকে এলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, নবদ্বীপেও তাঁর বাসা ছিল। এঁর সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে আর যাঁরা এলেন, তাঁরা হলেন মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত। মুকুন্দ কীর্তন গানে পারদর্শী ছিলেন। ফুলিয়া থেকে আসেন হরিদাস। যশোহর জেলার বুঢ়ন গ্রামে এঁর জন্ম, ইনি মুসলমান ছিলেন।[৭২] শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য তাঁকে দীক্ষা দেন। বীরভূমের একচাকা গ্রাম থেকে এসেছিলেন নিত্যানন্দ, তাঁর ডাক নাম ছিল নিতাই। ইনি নীলবস্ত্র পরিধান করতেন

৬৯. আলাপ আলোচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দিলীপকুমার রায়, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩৪

৭০. চৈতন্যভাগবত, ১/১

৭১. তদেব, ২/১

৭২. জয়ানন্দের মতে, হরিদাস হিন্দুর সন্তান, তাঁর বাড়ি ছিল ভাট-কলাগাছি গ্রামে।
—নদিয়া ২৮

আর বাম কানে ছিল কুণ্ডল। নবদ্বীপের বৈষ্ণব আন্দোলনে নিত্যানন্দ ছিলেন ব্যতিক্রমী চরিত্র। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব-গোষ্ঠীতে যোগদানের অনেক আগেই নবদ্বীপে এসেছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, মুকুন্দ দাস; আকনা-মহেশের বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, গরুড় আচার্য; কুমারহট্টের শ্রীমান পণ্ডিত, অগ্রদ্বীপের গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ ভক্ত।

শ্রীবাস-অঙ্গন ভক্ত-সমাগমে পূর্ণ হয়ে উঠল। অবৈষ্ণব পাষণ্ডীদের কৌতূহল বাড়তে লাগল। বৈষ্ণব মাত্রেই তাদের কাছে উপহাসের পাত্র হিসেবে গণ্য হল। তারা স্বগোষ্ঠীর মধ্যে অপপ্রচার চালাতে লাগল। তাদের আক্রোশ এত প্রবল হল যে, শ্রীবাসের ঘরবাড়ি ভেঙে নদীতে ফেলে দিতে চাইল।[৭৩] 'দেয়ানে' নালিশ জানাবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। প্রচার করল যে, এরা সারারাত্র মদ্য পান করে, পঞ্চকন্যা এনে উপভোগ করে। নবদ্বীপের বুধমণ্ডলী প্রকাশ্যে নাম সংকীর্তন অশাস্ত্রীয় বলে মনে করলেন। বৃন্দাবনের ভাষায়—

'কেহ বলে হরিনাম লৈব মনে মনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কোন বা পুরাণে।।' [৭৪]

চৈতন্যদেব জাতপাতের গণ্ডি লঙ্ঘন করেছিলেন, আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।' তাঁর এই মতবাদ ব্রাহ্মণেতর সমাজের মানুষকে বাঁচার রসদ জুগিয়েছিল। তিনি যখন ব্রাহ্মণের অসপত্ন অধিকারকে অস্বীকার করে বললেন, 'যাগ নয়, যজ্ঞ নয়, কলিযুগে নামগানই একমাত্র উপাসনা।' তখন সমাজের নিম্নবৃত্তের মানুষ, ব্রাত্যজন চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনে শামিল হল। ভক্তি আন্দোলনের ক্রম-প্রসারণ শিষ্টবর্গীয় সমাজকে ভাবিয়ে তুলল। তাঁরা বুঝলেন বেদ-পুরাণের প্রতিস্পর্ধী বৈষ্ণবধর্ম সমাজে প্রচারিত হলে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি আরও সংনমিত হয়ে পড়বে। একদিকে যেমন কমে যাবে তাঁদের দাপট, তেমনি জীবিকার পথ হয়ে উঠবে কণ্টকাকীর্ণ। আতঙ্কিত শিষ্টসমাজ চৈতন্যদেবের ধর্ম-আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করলেন। বৈষ্ণব দেখলে তাঁরা উপহাস করতে লাগলেন—

'কেহ বলে কলিকালে কিসের বৈষ্ণব।
যত দেখ হের পেটপোষাগুলা সব।।
কেহ বলে এগুলারে বান্ধি হাথ-পায়।
জলে পেলি জীয়ে যদি তবে ধন্য গায়।।

৭৩. চৈতন্যভাগবত, ২/১৮

৭৪. তদেব, ২/১৩

কেহ বলে আরে ভাই জানিল নিশ্চিত।
গ্রামখান লুটাইল নিমাই পণ্ডিত।।' [৭৫]

চৈতন্যদেব পাষণ্ডীদের সংক্ষোভকে উপেক্ষা করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললেন। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংসিক্ত চৈতন্যদেবকে প্রতিহত করার শক্তি তাদের ছিল না। এই পর্বে তিনি সূচনা করেছিলেন নগরকীর্তনের। নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে নাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাসকে।

ছয়

চৈতন্যদেব ছিলেন মানবতাবাদী। মানুষের মুক্তি কামনায় তাঁর জীবন ছিল উৎসর্গিত। শুধু নিজের মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে ঈশ্বর আরাধনায় লিপ্ত না থেকে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি কামনায় উদ্‌গ্রীব চৈতন্যদেব ভক্তি আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে বলেছিলেন—

'শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে এই কর গিয়া ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।' [৭৬]

চৈতন্যদেবের নির্দেশ পেয়ে দুই নিষ্ঠাবান ভক্ত প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে নামের মহিমা প্রচার করতে লাগলেন। সুজনেরা প্রীত হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেন, কিন্তু দুর্জনেরা ছেড়ে কথা কইল না। তারা বলল—

'তোমরা পাগল হইলা দুষ্ট-সঙ্গদোষে।
আমা সভা পাগল করিতে আইলে কিসে।।
ভব্য ভব্য লোক সব হইল পাগল।
নিমাঞি পণ্ডিত নষ্ট করিলে সকল।।' [৭৭]

৭৫. তদেব
৭৬. তদেব, ২/১৩
৭৭. তদেব

প্রচলনির্ভর সমাজের কুসংস্কারকে ভেঙে চৈতন্যদেব আদর্শ সমাজ গঠন করতে চাইছিলেন। নবদ্বীপের বুধমণ্ডলী ছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ। চৈতন্যদেবের প্রতিটি পদক্ষেপকে অসফল করার জন্য তাঁরা সদাসর্বদা ছিলেন সক্রিয়। কিন্তু ভক্তরা চৈতন্যদেবকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে ভীরুতা কুপুরুষতার মতো নৈর্ব্যক্তিক ত্রুটি কাটিয়ে উঠেছিলেন। ফলে বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রসারণের ক্ষেত্রে সব বাধা উপল খণ্ডের মতো ভেসে গিয়েছিল। এই পর্বে নবদ্বীপের নগরকোটাল জগাই-মাধাইকে স্বমতে আনয়ন করে চৈতন্যদেব শিষ্টসমাজের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন।

জগাই-মাধাই জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু সদাসর্বদা তাঁরা অসামাজিক কাজ করে বেড়াতেন। চুরি-ডাকাতি ছাড়াও অপরের গৃহে অগ্নিসংযোগের মতো গর্হিত কাজ করতেও তাঁরা ছিলেন নির্দ্বিধ। খাদ্যাখাদ্যের কোনও বাছবিচার ছিল না। মদ-মাংস ছাড়া তাঁদের দিনাতিপাত হত না, শুধু তা-ই নয় বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন, তাঁরা নাকি গোমাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করতেন।[৭৮] বৃন্দাবনদাসের এ বক্তব্য হয়তো অতিশয়োক্তি। একথা যদি সত্যি হত তা হলে সেকালের রক্ষণশীল সমাজপতিরা তাঁদের সমাজচ্যুত করতেন। এহেন দুজন পাষণ্ডীকে উদ্ধারে কৃতসংকল্প নিত্যানন্দ সুধীজনের নিষেধ অমান্য করে তাঁদের সন্নিকটে উপস্থিত হতেই মাধাই মুটকি ছুড়ে নিতাইয়ের কপাল ফাটিয়ে দিলেন। মাথা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। আবার মারতে গেলে জগাই বাধা দিলেন। চৈতন্যদেবের কাছে খবর পৌঁছাতেই তিনি দলবল সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন এবং সুদর্শন চক্রকে আহ্বান জানালেন। বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন যে, প্রভুর আহ্বানে চক্র এসে উপস্থিত হল। এ ঘটনাটিও অতিশয়োক্তি, ঈশ্বরত্ব আরোপের লক্ষ্যেই এরূপ উপস্থাপনা করা হয়েছে। তবুও আমাদের ধারণা যে, চৈতন্যদেবের বলিষ্ঠ চরিত্রের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে সুদর্শন চক্রের উপমাটির প্রয়োজন ছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চৈতন্যদেব পিছপা ছিলেন না। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, ঋজুতা, বজ্রকঠিন সিদ্ধান্তের অসংখ্য পরিচয় চরিতকারদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। ক্রোধে বাহ্যজ্ঞানশূন্য চৈতন্যদেব জগাই-মাধাইকে সংহার করতে উদ্যত হলে নিত্যানন্দ বাধা দিলেন, বললেন—

'মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই।।
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির।।' [৭৯]

---

৭৮. তদেব ৭৯. তদেব

জগাই নিত্যানন্দকে রক্ষা করেছেন শুনে চৈতন্যদেব তাঁকে কৃপা করলেন। জগাই চৈতন্যচরণে ভক্তিমান হলেন। মাধাই কৃপা প্রার্থনা করলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দিলেন। নিত্যানন্দ আঘাতের বেদনা ভুলে উচ্চারণ করলেন—

'কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিল মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত।।' [৮০]

আর কোনও বাধা রইল না, জগাই-মাধাই দুজনকেই ক্ষমা করলেন চৈতন্যদেব, চরণে তাঁদের স্থান দিলেন। বললেন—

'কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস সব দায় মোর।।' [৮১]

ভক্তের সমস্ত পাপের দায় গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। চৈতন্যদেব তা করে দেখালেন। এখানেই তিনি অনন্য, তিনি মানবিক এবং জগতের উদ্ধারকর্তা। এই ঘটনাটি তাঁর মহত্ত্বকে শতধারায় বিকশিত করে দিল। ফলে চৈতন্যদেবের উপর ভক্ত বৈষ্ণবদের আস্থা আরও গভীর হল। জগাই-মাধাইয়ের মতো পাষণ্ডীর উদ্ধার বৈষ্ণব আন্দোলনকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিল। চৈতন্যদেব যে সর্বশক্তিমান, অসাধারণ—সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধারণা দৃঢ়তর হল। আপন মহিমায় ভাস্বর চৈতন্যদেব সকলের কাছে চোখের মণি হয়ে উঠলেন। জনসাধারণের প্রত্যয় গভীর হল। লোকে বলল—

'প্রকৃত মানুষ নহে নিমাই পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত।।' [৮২]

চৈতন্যচরিতকারদের মধ্যে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যানন্দ পরিবেশিত। তা ছাড়া তাঁর মাতা নারায়ণী দেবীও চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। তাই বৃন্দাবনের রচনায় চৈতন্যলীলার প্রতিটি ঘটনা হয়ে উঠেছে বাঙ্ময়। বাস্তব ভিত্তির উপর রচিত বলেই 'চৈতন্যভাগবত' একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে পরিবেশিত জগাই-মাধাই উদ্ধার কাহিনি যদি কল্পিত ঘটনা হত, তা হলে তা

---

৮০. তদেব

৮১. তদেব

৮২. তদেব;

এত নিখুঁত এবং জীবন্ত হয়ে উঠত না। জগাই-মাধাই উদ্ধারের কাহিনি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত আছে মুরারিগুপ্তের কড়চায়, কবি কর্ণপুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে।

লোচনদাসও জগাই-মাধাই উদ্ধার কাহিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।[৮২ক] নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে,[৮২খ] শ্যামাদাসের রচিত একটি পদে[৮২গ] এবং ওড়িয়া ভক্ত কানাই খুঁটিয়ার 'মহাভাব প্রকাশ' গ্রন্থে[৮২ঘ] জগাই-মাধাই উদ্ধার কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বহুব্যাপ্ত এই ঘটনাটিকে অবাস্তব বলে অস্বীকার করা সহজ নয়। কেউ কেউ জগাই-মাধাই উদ্ধারের কাহিনিটি কল্পিত বা প্রক্ষিপ্ত বলে অনুমান করেছেন।[৮৩] তাঁদের এই ধারণা অমূলক। বৃন্দাবনদাসের রচনায় কিছুটা অতিরঞ্জন আছে ঠিকই, কিন্তু তা বাস্তবতার সীমানা লঙঘন করেনি কখনও। চৈতন্যজীবনীকারদের মধ্যে একমাত্র বৃন্দাবনদাসই তৎকালীন সমাজের পরিচয় সংবলিত চৈতন্যদেবের কোমল ও কঠিন চরিত্রের সঠিক প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য চরিতকারের রচনায় সংক্ষিপ্ত বা অনুল্লিখিত বলেই বৃন্দাবনদাসকে অস্বীকার করতে হবে, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন। বরং চৈতন্যভাগবত রচিত হয়েছিল বলেই আমরা তাঁর বজ্রকঠিন প্রতিবাদী চরিত্রের কাঙিক্ষত চিত্রটির পরিচয় পাই। এখানে একটি কথা স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, মুরারি ও কর্ণপুর মধুর ভাবের উপাসক ছিলেন। তাই তাঁরা চৈতন্যদেবের বজ্রকঠিন রূপটিকে স্বীকার করেননি।

সাত

চৈতন্যদেব গণশক্তিকে সংহত করে জনকল্যাণের কাজে নিয়োজিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সমাজ সম্পর্কে উদাসীন জনগণকে আকর্ষণ করার ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে তিনি অভিজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানীর মতো তা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন। 'চৈতন্যদেব বুঝেছিলেন যে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কঠোরতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রসারণ ঘটাতে হলে শুধুমাত্র ধর্মের বাক্-চাতুর্যে

৮২ক. চৈতন্যমঙ্গল—লোচন, মধ্য খণ্ড, পৃ. ১০৯;

৮২খ. ভক্তিরত্নাকর, ১২ তরঙ্গ;

৮২গ. গৌরপদতরঙ্গিনী, ১৮ নং পদ;

৮২ঘ. মহাভাব প্রকাশ

৮৩. ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য—অমূল্য সেন, পৃ. ৭৪

তা সম্ভব নয়। মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য, সম্মিলিত করার জন্য, নগর-সংকীর্তনের যেমন প্রয়োজন তেমনি মনোরঞ্জনের জন্য প্রয়োজন নাটকের।'[৮৪] তাই তিনি নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

'একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধানে।।
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু কাছে সজ্জ কর গিয়া।।
শঙ্খ কাঁচলী পাটসাড়ী অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার।।'[৮৫]

এর থেকেই বোঝা যায় চৈতন্যদেব ব্যষ্টি নয়, সমষ্টির জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাই বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে চাইছিলেন। জনজাগরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল অভিনব এবং বাস্তবতার রসায়নে সিক্ত। ব্রাত্যজনেদের, যারা এতকাল আত্মগ্লানিতে মুখ লুকিয়ে পড়ে ছিল এককোণে, চৈতন্যদেব তাদের অন্তরে মানবিক বোধের উজ্জীবন ঘটিয়ে যেমন টেনে নামালেন সংকীর্তনের সমাবেশে, তেমনি অভিনয়ের আসরে।

প্রাক্ চৈতন্যযুগে বাংলাদেশে 'কৃষ্ণযাত্রা', 'রাসযাত্রা' প্রভৃতির প্রচলন হয়তো ছিল, কিন্তু তার প্রথম সুসংহত রূপ আমরা দেখতে পাই বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে'। চৈতন্য-পূর্ব নাটকে সংগীতের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। চৈতন্যদেব সংগীতের প্রভাব কমিয়ে বাচিক অভিনয়কে প্রাধান্য দিলেন; কুশীলবের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটালেন; অভিনেতাদের সজ্জিত করে নাটককে দৃশ্যময় করে তুললেন; সর্বোপরি পর্ব বিন্যাস ঘটিয়ে বাংলা নাটকের প্রকরণে এক যুগান্তকারী সংস্কার ঘটালেন। বাংলা নাটক যে চৈতন্যদেবের কাছে অনেকাংশেই ঋণী, তা স্বীকার না করে গত্যন্তর নেই।

চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে নাটকের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। রুক্মিণী ও রাধার ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পার্শ্বচরিত্রে নিত্যানন্দ বড়াইয়ের ভূমিকায়, ব্রহ্মানন্দ হয়েছিলেন তালবুড়ি, শ্রীবাস নারদের ভূমিকায়, হরিদাস কোটালের ভূমিকায়, অদ্বৈত বিদূষকের ভূমিকায় অনবদ্য

৮৪. নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩-০৪

৮৫. চৈতন্যভাগবত, ২/১৮

অভিনয় করেছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খান ছিলেন রূপসজ্জায়। সজ্জ এত সুন্দর হয়েছিল যে, শ্রীবাস পণ্ডিত যখন পক্ক কেশগুম্ফ সাজে আসরে প্রবেশ করলেন, তখন স্ত্রী মালিনীদেবীও তাঁকে চিনতে পারেননি। স্ত্রী ভূমিকায় চৈতন্যদেব অতি মনোমুগ্ধকর অভিনয় করে দর্শকবৃন্দকে আবিষ্ট করেছিলেন। তাঁর অঙ্গসজ্জা এত নিখুঁত হয়েছিল যে, মাতা শচীদেবীও তাঁকে চিনতে পারেননি।[৮৬] দক্ষ অভিনেতা হিসেবে চৈতন্যদেবের খ্যাতি ছিল, নবদ্বীপ ছাড়াও শান্তিপুর এবং পুরীতে তিনি অভিনয় করেছিলেন।

কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, কৃষ্ণনাম প্রচারের মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেব মানুষের কাছে এক নতুন যুগের সূচনা করতে চাইছিলেন। নগরের সাধারণ মানুষের মধ্যে কীর্তনের সুতীব্র প্রভাব পড়েছিল। সন্ধ্যায় ঘরের দ্বারে বসে হাতে তালি দিয়ে কীর্তন করতে লাগল গৃহস্থরা। চৈতন্যদেব নগরে ঘুরে ঘুরে কীর্তনরত ভক্তদের আলিঙ্গন করতেন, এতে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেত। ক্রমশ নবদ্বীপ কীর্তননগরীতে পরিণত হল।

এদিকে পাষণ্ডীরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠল। তারা নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে লাগল, চাপালগোপালকে কুমন্ত্রণা দিল। একদিন রাত্রে শ্রীবাসের বন্ধ গৃহদ্বারে ভবানী পূজার উপচার স্থাপন করে বৈষ্ণবগোষ্ঠীকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করে চাপালগোপাল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, ছোটখাটো প্রতিরোধ চৈতন্যদেবের প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে তৃণখণ্ডের মতো ভেঙে গেল। নবদ্বীপের স্মার্তরা, তন্ত্রসাধকেরা, বুধমণ্ডলীর একাংশ বেদ-বিরোধী বৈষ্ণব আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্য কাজির কাছে অভিযোগ জানালেন। অভিযোগকারীদের মধ্যে হিন্দুরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন মুসলমানরাও।[৮৭] নগর সংকীর্তন নামক অভিনব উপাসনা পদ্ধতিকে তাঁরা ধর্মীয়-কৃত্য হিসেবে মেনে নিতে পারেননি—

'হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি।।'[৮৮]

কাজি সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নগরিয়াগণের অভিযোগ পেয়ে খুশি হলেন তিনি। যবন হরিদাসকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেওয়ার যন্ত্রণা তিনি ভুলতে পারেননি। তিনিও চাইছিলেন বৈষ্ণবদের শায়েস্তা করতে, উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। নগরিয়াগণের অভিযোগ কাজির গোপন

৮৬. তদেব, ২/১৮
৮৭. চৈতন্যচরিতামৃত, ১/১৭
৮৮. তদেব

ইচ্ছাকে পুষ্ট করে তুলল। কালক্ষেপ না করে একদিন তিনি নগর মধ্যে কীর্তনরত কিছু ভক্তকে প্রহার করে তাদের মৃদঙ্গ ভেঙে দিলেন এবং কীর্তন বন্ধের আদেশ জারি করলেন। বললেন—

'কাজি বলে ধর ধর আজি করোঁ কার্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাঞি আচার্য।।
আথে ব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন।।
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।।
কাজি বলে হিন্দুয়ানী হৈল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া।।
মানা করিলাঙ আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন নাগালি পাইলে লৈব জাতি।।' [৮৯]

নগরের শান্তি রক্ষার্থে কাজি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় নগরিয়াগণ খুশি হলেন, তাঁরা বললেন যে, বেদ-পুরাণ অমান্য করলে এরূপ শাস্তিই প্রাপ্য। এবারে ঔদ্ধত্যের শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতের সব দর্প চূর্ণ হবে। কাজির তাণ্ডবে আতঙ্কিত নাগরিকেরা কীর্তন বন্ধ করে দিলেন। কীর্তন বন্ধের অন্যায় আদেশ বিশ্বম্ভরের কানে যেতেই তিনি গর্জে উঠলেন—

'কীর্তনের বাদ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্রমূর্তিধর।।
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি হরি বোলে নগরিয়াগণ।।
প্রভু বলে নিত্যানন্দ হও সাবধানে।
এইক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থানে।।
সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম করে কোনজন।।
দেখোঁ আজি পোড়াঙ কাজির ঘরদ্বার।
কোন কর্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার।।' [৯০]

৮৯. চৈতন্যভাগবত, ২/২৩

৯০. তদেব

এখানে প্রস্ফুটিত হয়েছে চৈতন্য চরিত্রের কঠোরতা, দুষ্টের দমনের জন্য বজ্রকঠিন সিদ্ধান্ত এবং গণতান্ত্রিক জনজাগরণকে প্রতিবাদী মহামিছিলে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা। 'মুসলমান আমলে কাজির আদেশ অমান্য করার জন্য যে স্পর্ধা, যে মানসিক দৃঢ়তা, যে বীর্যবত্তা, যে অকল্পনীয় সাহসিকতা ও ঔদার্যের সমন্বয় ঘটেছিল চৈতন্যদেবের মধ্যে, তা অভূতপূর্ব এবং বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয়রহিত।'[৯১]

ভক্তদের কাছে চৈতন্যদেব ছিলেন সর্বশক্তিমান। ব্রাত্য অবজ্ঞাত আপামর জনেরা তাঁকে ঈশ্বরত্বে বরণ করে নিয়েছিল। চৈতন্যদেবের ডাক যখন তাদের কাছে পৌঁছল, তখন ঈশ্বরের আহ্বান বিবেচনায় ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে নির্দ্বিধায় তারা সংকীর্তনের মহামিছিলে যোগ দিয়েছিল। না হলে মুসলমান আমলে কাজির আদেশ অমান্য করে প্রতিবাদের সাহস তারা পেল কোথায়? এ সাহসের উৎসভূমি স্বয়ং চৈতন্যদেব। তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, মানসিক দৃঢ়তায় দেদীপ্যমান এক যুগন্ধর পুরুষ। মধ্যযুগে নবদ্বীপের মাটিতে দাঁড়িয়ে মেরুদণ্ডহীন বাঙালি জাতির মনে পৌরুষেয় ভাবের উদয় ঘটিয়েছিলেন তিনি। ভাব-উন্মেষের পাশাপাশি তিনি প্রতিবাদী চিন্তা-চেতনায় দীক্ষিত করেছিলেন মানুষকে। ভীরুতা, কাপুরুষতার মতো নেতিবাচক বিশেষণগুলির মূলোচ্ছেদ করে বাঙালি জাতির মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। বাঙালিকে জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন চৈতন্যদেব। 'তিনি ভারতবর্ষের প্রথম নবজাগরণের যাজ্ঞিক। সমাজবাদ আর মানবতাবাদের প্রথম প্রবক্তা।' বিশ্বের প্রথম বামপন্থী গণআন্দোলন ছিল এটি, যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব।

চৈতন্যদেব অবতার, এ ধারণা মানুষকে প্রাণিত করেছিল। সংখ্যাতীত ভক্ত মশাল হাতে যথাসময়ে এসে উপস্থিত হল। সুদক্ষ সেনাপতির মতো সংকীর্তনের মহামিছিলকে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যাস ঘটালেন চৈতন্যদেব। এক এক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক এক যাজ্ঞিককে। মিছিলের পুরোভাগে সংকীর্তনরত ভক্তদের নেতৃত্ব দেবেন অদ্বৈত আচার্য, তাঁর পরের দল পরিচালনা করবেন যবন হরিদাস, এর পরে শ্রীবাস পণ্ডিত। নিত্যানন্দ আর শ্রীগৌরাঙ্গ থাকবেন এক ঠাঁই, কারণ নিতাই চৈতন্যদেবকে ছাড়তে চান না। এইরূপে গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, জগদানন্দ, নন্দন আচার্য, গোবিন্দ, মুকুল, শ্রীধর প্রমুখ ভক্ত সেদিন কীর্তনের মহামিছিলে অংশগ্রহণ

৯১. নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯

করেছিলেন। গণশক্তির যে দুর্বার গতি তাকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি চৈতন্যদেবের ছিল। আর তা ছিল বলেই সেদিনের মহামিছিল হয়েছিল সুশৃঙ্খল এবং ফলপ্রসূ। সেদিক থেকে বিচার করলে চৈতন্যদেব ছিলেন উপযুক্ত নেতা। তাঁর নেতৃত্বেই ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম অহিংস প্রতিবাদী আন্দোলন সফলতা পেয়েছিল। এই আন্দোলন ছিল প্রকৃত অর্থেই গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী এবং জাতপাতহীন সমন্বয়বাদের মহামিছিল। চৈতন্যদেবের আহ্বানে সব সম্প্রদায়ের মানুষ নির্দ্বিধায় যোগ দিয়েছিল সংকীর্তনের মিছিলে, সেখানে কোনও বৈষম্য ছিল না, বর্ণভেদের গ্লানি ছিল না, ছিল না মানবতার অসম্মান। ভারতবর্ষের মাটিতে এই প্রথম জাতীয় সংহতির এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। মেরুদণ্ডহীন জাতির জীবনে সূচিত হল এক রোচিষ্ণু অধ্যায়।

সেদিন নবদ্বীপে ভাগীরথী তীরে সংখ্যাতীত মানুষের মহামিছিল অগ্রসর হল কাজির কার্যালয়ের দিকে। প্রত্যেকের হাতে মশাল থাকায় সে মিছিল এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ভক্তরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল যে, রাজশক্তিকেও তারা তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল। পাষণ্ডীরা আশেপাশেই ছিল, তারা এহেন কাণ্ড দেখে জ্বলেপুড়ে মরছিল। তবু তাদের আশা ছিল যে, কাজি এলেই এদের নর্তন-কীর্তন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কে কোথায় পালাবে তার দিশা খুঁজে পাবে না। কিন্তু পাষণ্ডীদের আশা পূরণ হল না, সংকীর্তন রোধে কাজি এগিয়ে এলেন না। বরং অনুচরদের মুখে নগর সংকীর্তনের বিবরণ শুনে তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠল। তিনি সঙ্গীসাথিদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করলেন। এদিকে সংখ্যাতীত ভক্ত পরিজন· সহ কীর্তনানন্দে বিভোর শচীনন্দন সিমুলিয়া গ্রামে কাজির গৃহদ্বারে পৌঁছলেন—

'আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর।।
ক্রোধে বোলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া পেলোঁ মাথা।।
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্বে যেন বধিয়াছি যে কালযবন।।
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।।' [৯২]

তিনশো বছরের ইসলাম শাসনের ইতিহাসে প্রতিবাদের ঘটনা এই প্রথম। মুসলমান শাসনে ন্যুব্জ বাঙালি জাতি চৈতন্যদেবের প্রেরণায় আবার মাথা তুলে

৯২. চৈতন্যভাগবত, ২/২৩

দাঁড়াল। বাঙালি যে ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়; অন্যায়ের প্রতিবাদ যে তারাও করতে জানে, সেদিন নবদ্বীপের বুকে আবার তা প্রমাণিত হল। প্রাণভয়ে ভীত কাজি চৈতন্যদেবের সীমাহীন সাহসিকতা ও বীর্যবত্তার পরিচয় পেয়ে তাঁর চরণে নতিস্বীকার করেছিলেন।[৯৩] আত্মবিশ্বাসী চৈতন্যদেব বিনম্র সুরে কাজির কাছে কীর্তন বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উত্তরে কাজি বলেছিলেন—

'কাজী কহে, মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে।।' [৯৪]

চৈতন্যদেবের জয় ঘোষিত হল। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজিকে দমন করে বিজেতা নিমাই নগরভ্রমণে অগ্রসর হলেন। প্রান্তিক শ্রমজীবী অচ্ছুত মানুষজনদের পল্লিতে-পল্লিতে ঘুরে অবশেষে জল অচল শ্রীধরের বাড়ি গেলেন।[৯৪ক] খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ি ছিল গাদিগাছা গ্রামে। তাঁর গৃহে ভগ্ন লৌহপাত্রে রাখা জল পান করে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন।[৯৫]

বৃন্দাবনের রচনায় কাজিদলনের ঘটনাটি যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে, অন্য চরিতকারদের রচনায় তা ঘটেনি। এর থেকেই বোঝা যায় বৃন্দাবনদাস ছিলেন চৈতন্য চরিতকারদের মধ্যে বলিষ্ঠ রূপকার। মুরারিগুপ্ত প্রত্যক্ষদর্শী হলেও ইঙ্গিতে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন মাত্র। তিনি শুধুমাত্র নগরে হরিসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে ম্লেচ্ছ উদ্ধারের বর্ণনা করেছেন—

'হরিসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা নগরে নগরে প্রভুঃ।
ম্লেচ্ছাদীনুদ্দধারাসৌ জগতামীশ্বরো হরিঃ।।' [৯৬]

৯৩. তদেব

৯৪. চৈতন্যচরিতামৃত, ১/১৭

৯৪ক. বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ খোলাবেচা শ্রীধরের জাতি উল্লেখ করেননি। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' এবং 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়' তাঁকে 'দ্বিজ' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যদি ব্রাহ্মণ হতেন তা হলে বৃন্দাবন দাস জলপানের ঘটনাটি অধিক গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করতেন না। কারণ, সেক্ষেত্রে ঘটনাটির আলাদা কোনও গুরুত্ব থাকার কথা নয়। তাই মনে হয় তিনি শূদ্র ছিলেন।

৯৫. তদেব

৯৬. মুরারিগুপ্তের কড়চা, ২/১৭/১১

মুরারিগুপ্ত তাঁর কড়চা গ্রন্থটি সূত্রাকারে বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লিখিত ম্লেচ্ছউদ্ধার কাজি উদ্ধার হতে বাধা কোথায়? কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনকেই অনুসরণ করেছেন,[৯৭] জয়ানন্দ সংক্ষিপ্তাকারে কাজিদলন বর্ণনা করেছেন,[৯৮] কবি কর্ণপুর ও লোচনদাস ঘটনাটির উল্লেখ করেননি। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ কাজিদলনের ঘটনাটির সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৯৯] তাঁদের বক্তব্য চৈতন্যভাগবতের ঘটনাটি অতিরঞ্জিত। বৃন্দাবনের রচনায় অতিরঞ্জন যে নেই তা নয়, বিশেষত জনসংখ্যা সম্পর্কে তাঁর উক্তিটি অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পুরো ঘটনাটি অলীক এবং কাল্পনিক। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমিত হবে যে, শুধুমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় করে তিনি অশ্রুতপূর্ব ঘটনাটির উপস্থাপনা করেননি, তা যদি করতেন তা হলে তা কখনোই এত নিখুঁত এবং হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠত না।

কেউ কেউ কাজিদলনের ঘটনাটি চৈতন্যদেবের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমার মনে হয় তাঁরা চৈতন্যদেবকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। চৈতন্যদেব ছিলেন এমন একজন আদর্শ মানুষ, যাঁর চরিত্র কঠিন ও কোমল গুণ-সমন্বয়ে গঠিত ছিল। কঠোরতা যে তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, তার সপক্ষে অজস্র উদাহরণ উপস্থাপিত করা যায়। জ্ঞানবাদী অদ্বৈত আচার্যকে প্রহার, জগাই-মাধাইয়ের ঔদ্ধত্য দমন, ছোট হরিদাসকে বর্জন ইত্যাদি ঘটনাগুলি তাঁর চরিত্রের অনমনীয়তার সাক্ষ্য বহন করে।

কোনও কোনও গবেষকের মতে, সকল চরিতকারের রচনায় কাজিদলনের ঘটনাটি সমানভাবে গুরুত্ব না পাওয়ায় বিষয়টিকে তাঁরা অলীক বলে উড়িয়ে দিতে চান। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তো থাকতেই পারে, একজন হয়তো

৯৭. চৈতন্যচরিতামৃত, ১/১৭

৯৮. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, উত্তর ৪৪/৪৫

৯৯. শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—ড. বিমানবিহারী মজুমদার, পৃ. ২১৪
ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য,
মধ্যযুগে বাংলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩০, পৃ. ৪৬, ৭৩
'চৈতন্য-জীবনকথা'—অবন্তীকুমার সান্যাল, প্রবন্ধ, চৈতন্য : ইতিহাস ও অবদান, সূত্র ও টীকা, পৃ. ১৫৩
যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্য, পৃ. ৩৩

কাজিদলনের ঘটনাটিকে যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ হয়তো বিষয়টিকে শুধুমাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করেই দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। তাতে মূল ঘটনাটির গ্রহণযোগ্যতা হারাবে কেন? এখানে একটি বিষয় স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, কাজি ছিলেন রাজ প্রতিনিধি, শাসকদলের লোক। সুতরাং মুসলমান কাজির বিরুদ্ধে সংগঠিত হিন্দু আন্দোলনকে গুরুত্ব সহকারে পরিবেশনের সাহস হয়তো তাঁরা দেখাতে পারেননি। একমাত্র বৃন্দাবনদাস তা পেরেছিলেন। তা ছাড়া চৈতন্য জীবনীকারদের মধ্যে অনেকে ছিলেন দাস্য ও মধুর ভাবের উপাসক। তাই তাঁদের রচনায় মহাপ্রভুর বজ্রকঠিন বৈশিষ্ট্যগুলি অনুপস্থিত। এখানে একটা কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, বৃন্দাবনদাসের প্রামাণিকতা অনেক বেশি। গুরু নিত্যানন্দের কাছে তিনি যা শুনেছিলেন তা কখনও গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারে না। এক্ষেত্রে ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'বৃন্দাবনদাস যেভাবে কাজির অন্যায় অত্যাচারের মহাপ্রভু কর্তৃক প্রতিবাদের বিবরণ দিয়েছেন, তা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মতো স্পষ্ট। এ বিবরণ অলীক হতে পারে না।'[১০০]

আট

কাজিদলনের পর সমগ্র নবদ্বীপে ভাব-উন্মাদনা প্রকট হয়ে উঠল। হাট-মাঠ-ঘাট সর্বত্র নামগানে মুখরিত হল। সন্ধ্যায় প্রতিটি পরিবারের প্রাঙ্গণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কীর্তনের সুর-মূর্ছনায়। নবদ্বীপ হয়ে উঠল কীর্তননগরী। নগরে কীর্তনের প্রসার্যমাণতা বৃদ্ধি পেতে লাগল ঠিকই, কিন্তু সনাতনপন্থীদের অসূয়া বেড়েই চলল। এদিকে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ ক্রমশ প্রকট হতে লাগল। নামের সুমধুর ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর দুই নয়নে অশ্রুধারা বইতে লাগল। তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ পেল। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনায় জানা যাচ্ছে যে, এই সময় থেকেই চৈতন্যদেব গোপীভাবে ভাবিত হয়ে ওঠেন। বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে দেখা যায়, চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলায় দাস্যভাবের প্রাধান্য, কিন্তু নীলাচল লীলায় তিনি মধুরভাবে আবেশিত। চরিতকারদের রচনার সাক্ষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, নবদ্বীপ লীলার শেষ পর্বে তাঁর অন্তরের গভীরে

১০০. যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, পৃ. ১৮৮

মধুর ভাবের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছিল। বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, তিনি গোপীভাবে আবেশিত হলে কৃষ্ণনাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না—

'গোপী গোপী গোপী মাত্র কোন দিন জপে।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে।।' [১০১]

একদিন চৈতন্যদেব নিজগৃহে গোপীভাবে আবিষ্ট হয়ে বসে আছেন, 'গোপী' 'গোপী' নাম জপ করছেন। এমন সময় একজন 'পড়ুয়া' তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের উপাসক, সাধারণত তাঁরা কৃষ্ণনাম জপ করেন। কিন্তু চৈতন্যদেবকে 'গোপী' নাম জপ করতে দেখে পড়ুয়া প্রতিবাদী কণ্ঠে কৃষ্ণনাম জপ করতে বললেন। চৈতন্যদেব তখন ভাবাবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। পড়ুয়ার মুখে কৃষ্ণের নাম শুনে ক্রোধান্বিত চৈতন্যদেব লাঠি হাতে তাকে তাড়া করলেন, পড়ুয়া তাঁর রুদ্রমূর্তি দেখে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। ঘটনাটি যদি এখানেই শেষ হত তা হলে কিছুই বলার ছিল না, কিন্তু না, এরপর এমন কিছু ঘটনা ঘটল যা চৈতন্যদেবের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তখন নবদ্বীপে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল অগণন। তাড়া খাওয়া ছাত্রটি চৈতন্য গোসাঁঞির কীর্তি-কাহিনি সবিস্তারে তাদের কাছে ব্যক্ত করতেই তারা সংক্ষোভে ফেটে পড়ল—

'কেহ বলে এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি।।
তিহোঁ সে ব্রাহ্মণ আমরা কি বিপ্র নহি।
তেহোঁ মারিতে বা আমরা কেনে সহি।।
রাজা তো নহেন তেহোঁ মারিবেন কেনে।
আমরাও তাহারে মারিব সর্বজনে।।
যদি তিহোঁ মারিতে ধায়েন পুনর্বার।
আমরা সকল তবে না সহিব আর।।
তিহোঁ নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র-পুত্র।
আমরাও নহি অল্প মানুষের সুত।।
হের সবে পড়িলাম কালি তার সনে।
আজি তিহোঁ গোসাঞিঃ বা হইলা কেমনে।।' [১০২]

১০১. চৈতন্যভাগবত, ২/২৪
১০২. তদেব, ২/২৫

এক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনাও বৃন্দাবনদাসের অনুরূপ।[১০৩] চরিতকারদের রচনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ছাত্ররা চৈতন্যদেবের ভক্তি-আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। এটি মূলত ছাত্র-সংগঠন হলেও এই দলে ছিলেন চৈতন্যদেবের বেশ কিছু সহপাঠী এবং নবদ্বীপের শিষ্টসমাজের কর্তাব্যক্তিরা। আসলে ভক্তি-আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য শুধুমাত্র ছাত্রসমাজ নয়, বুধমণ্ডলীর অনেকেই একজোট হয়েছিলেন। এ কথা চৈতন্যদেবের কানে পৌঁছতেই তিনি বিষণ্ণ হলেন, বুঝলেন ভক্তি-আন্দোলন প্রসারণের ক্ষেত্র হিসেবে নবদ্বীপ আদর্শ স্থান নয়। নবদ্বীপের সুধীসমাজের এহেন হীন আচরণ চৈতন্যদেবের অন্তরের অন্তস্তলে গভীর বেদনার সঞ্চার করেছিল। তাঁর কোমল হৃদয় হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। এবার তিনি বিকল্প পথের কথা ভাবতে লাগলেন এবং অতি সত্বর গ্রহণ করলেন সেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত—সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত। তিনি বললেন—

'করিল পিপ্‌পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।।' [১০৪]

নিভৃতে নিত্যানন্দকে চৈতন্যদেব বলেছিলেন যে, যাদের উদ্ধারের জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি, আজ তারাই তাঁকে সংহার করতে চায়। চৈতন্যদেবের এ আর্তি বেদনাঘন রসসঞ্জাত, হতাশায় ক্লিষ্ট। বাঙালির নীচতায় হীনতায় বিরক্ত চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন।[১০৫] বললেন, 'সন্ন্যাসীরে সর্বলোকে করে নমস্কার।' চৈতন্যদেবকে যারা মারতে চেয়েছে, শিখা-সূত্র মুড়িয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভিক্ষাপাত্র হাতে তাদের দুয়ারেই যেতে চেয়েছেন তিনি। অবশেষে ২৩ বছর ১১ মাস ২৫ দিন বয়সকালে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন বিশ্বম্ভর। তাঁর গুরুপ্রদত্ত নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

১০৩. চৈতন্যচরিতামৃত, ১/১৭

১০৪. চৈতন্যভাগবত, ২/২৫

১০৫. গৌরপদতরঙ্গিণী—জগবন্ধু ভদ্র সংকলিত, মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, পদ নং ২, ২১, ২৮, ২৯

নয়

চৈতন্য বিষয়ে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন বারবার উত্থাপিত হতে দেখি, তা হচ্ছে—স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি ঔদাসীন্য তাঁর লোকোত্তর চরিত্রকে কিছুটা ম্লান করে দিয়েছে। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ-ই যদি চৈতন্যদেবের জীবনের লক্ষ্য ছিল তা হলে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেছিলেন কেন? বিশ্বের সব মানুষের মুক্তি কামনায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর এই বৃহত্তর পরিকল্পনায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে কেন আত্মবলিদান দিতে হল?

এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত ছিল আকস্মিক। ঘটনার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে তাঁকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি অতি সতর্কতার সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাই পিতামাতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি দাদার পথ অনুসরণ করবেন না।[১০৬] সন্ন্যাস গ্রহণের পরও মাকে তিনি ভুলে যাননি। পুরী থেকে মায়ের জন্য কাপড় ও প্রসাদ পাঠিয়ে বলেছেন—

'এই বস্ত্র মাতাকে দিও এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ।।
তাঁর সেবা ছাড়ি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজধর্ম্মনাশ।।' [১০৬ক]

পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি নিত্যানন্দের মতো আজীবন ব্রতধারী সন্ন্যাসীকেও তিনি সংসার ধর্ম পালনের পরামর্শ দিয়েছেন।[১০৭] এই ঘটনার মধ্যেই তাঁর অন্তরের গভীরে লালিত ইচ্ছার প্রতিফলন দেখতে পাই। অপরদিকে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহের ব্যাপারে বিশ্বম্ভরের তেমন কোনও আগ্রহ ছিল না। বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন শচীদেবীর নির্বাচিত পাত্রী, শেষ পর্যন্ত মায়ের মুখ চেয়েই তাঁকে সম্মতি প্রদান করতে হয়েছিল। মুরারিগুপ্তের কড়চার একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিয়ের

১০৬. চৈতন্যচরিতামৃত, ১/১৫

১০৬ক. তদেব, ২/১৫

১০৭. চৈতন্যভাগবত, ৩/৫

দিনও বিশ্বম্ভর বিবাহের ব্যাপারে মনস্থির করতে পারেননি।[১০৮] পরে অবশ্য নিজের মাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতামাতার বেদনা অনুভব করে বিশ্বম্ভর এ বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যাপারে চৈতন্যদেবকে যে ঘটনাগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল—তাঁর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার আকস্মিক মৃত্যু। অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনা বিশ্বম্ভরের ভাবসমৃদ্ধ হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেও লক্ষ্মীপ্রিয়াকে তিনি ভুলতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-পড়ুয়ারা সম্মিলিতভাবে সমবায় গঠন করেছিল, চৈতন্যদেবকে এবং তাঁর ভক্তি-আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য। এই ঘটনায় চৈতন্যদেব ব্যথিত হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। তিনি বুঝেছিলেন যে, প্রতিস্পর্ধী শক্তিকে প্রতিহত করে নবদ্বীপের মাটিতে ভক্তিধর্মের প্রসারণ দুরতিক্রম্য। তাই তিনি স্থানান্তরে গমনের কথা ভেবেছিলেন। তৃতীয়ত, বৈষ্ণব ধর্মকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি। চৈতন্যদেব বুঝেছিলেন গৃহী অপেক্ষা সন্ন্যাসীর সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশি। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। আর সেই জন্যেই তিনি বলেছিলেন, 'লোকরক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।' পরবর্তীকালে তিনি যে সকলের প্রণম্য হয়েছিলেন, ইতিহাসের পাতায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। চতুর্থত, এমনও হতে পারে তিনি হয়তো মুসলমান শাসকবর্গের দিক থেকে প্রতি-আক্রমণের আশঙ্কা করেছিলেন।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপের সামাজিক সংহতি কোনও পর্যায়ে পৌঁছেছিল আজ আর তা জানার উপায় নেই। তবে স্পৃশ্যবর্ণের আক্রমণে নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজ যে বাধ্য হয়েছিল নবদ্বীপ ত্যাগ করতে—এ অনুমান একেবারে অনৈতিহাসিক নয়। শ্রীবাস ছিলেন নবদ্বীপের সম্পন্ন গৃহস্থ, সন্ন্যাস গ্রহণের চার বছর পর চৈতন্যদেব যখন গৌড়দেশে এসেছিলেন তখন দেখি সঙ্গতিহীন শ্রীবাস কুমারহট্টে বসবাস করছেন। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে তাঁর মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয়েছিল। জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ শ্রীবাস চৈতন্যদেবকে বলেছিলেন—

১০৮. মুরারিগুপ্তের কড়চা, ১/১৪/২

'তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার।।
তবে সত্য কহোঁ ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিনু প্রভু সর্বথা গঙ্গায়।।' [১০৯]

নবদ্বীপ-লীলার চৈতন্য-পার্ষদ গদাধরদাস[১১০] নবদ্বীপ ত্যাগ করে আড়িয়াদহে গমন করেছিলেন। চৈতন্যদেব পানিহাটিতে এলে গদাধর সেখানে এসে মিলিত হয়েছিলেন।[১১১] নিত্যানন্দ যখন ভাগীরথী-বিধৌত জনপদগুলিতে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার কালে নবদ্বীপে এসে পৌঁছলেন তখন চৈতন্য পরিকরদের কেউ সেখানে ছিলেন বলে জানা যায় না। নিঃসঙ্গ নিত্যানন্দ হিরণ্য পণ্ডিতের ঘরে অবস্থান করেছিলেন। চৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থানকালে প্রতি বছর রথযাত্রায় বাংলার ভক্তগণ পুরী গমন করতেন, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কীর্তনীয়ারা নীলাচলে যেতেন, তার মধ্যে নবদ্বীপ সম্প্রদায়ের নাম নেই। নবদ্বীপ ঐশীভূমি, চৈতন্য-পদরজধন্য তীর্থভূমি এবং ভক্তি-আন্দোলনের পীঠস্থান। এতদ্‌সত্ত্বেও চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ ত্যাগের পর বৈষ্ণব-আন্দোলনে নবদ্বীপের আর কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানা যায় না। চৈতন্যোত্তর কালে নবদ্বীপে স্মার্ত প্রাধান্যই বজায় ছিল।[১১২] বর্তমানে নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজের প্রায় সকলেই বহিরাগত; বৈষ্ণব সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের ঔদাসীন্য আজও প্রকট।

দশ

চৈতন্য-জীবনের কালক্রম নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রখ্যাত গবেষক ড. বিমানবিহারী মজুমদার[১১৩], ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়[১১৪] এবং যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি[১১৫]। সময়কাল

১০৯. চৈতন্যভাগবত, ৩/৫

১১০. ভক্তিরত্নাকর—নরহরি চক্রবর্তী, ১২/২০১৩, ২০২৫, ২০৬৪, ২৮১৭
গৌরাঙ্গলীলামৃত—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রকাশিত, পৃ. ৪৪

১১১. চৈতন্যভাগবত, ৩/৫

১১২. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, ভূমিকা-৩২

১১৩. শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ৬

১১৪. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম—সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৭

১১৫. যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্য, পৃ. ১৯৩

নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে, কারণ জীবনীকারদের রচনায় অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। তবুও গবেষকরা নানা দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। এখানে চৈতন্য-জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সম্ভাব্য কালক্রম উপস্থাপন করা হল—

১. জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬, জুলিয়ান ক্যালেন্ডার মতে।
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার মতে।

২.	অন্নপ্রাশন ও নামকরণ	আগস্ট ১৪৮৬ খ্রি.
৩.	উপনয়ন	এপ্রিল-মে ১৪৯৫ খ্রি.
৪.	প্রথম বিবাহ	১৫০১-০২ খ্রি.
৫.	পূর্ববঙ্গে যাত্রা	১৫০৫ খ্রি.
৬.	দ্বিতীয় বিবাহ	১৫০৭ খ্রি.
৭.	গয়াযাত্রা	অক্টোবর ১৫০৮ খ্রি.
৮.	প্রত্যাবর্তন	জানুয়ারি ১৫০৯ খ্রি.
৯.	সন্ন্যাসগ্রহণ	১৩ ফেব্রুয়ারি ১৫১০ খ্রি.
১০.	নীলাচলে আগমন	মার্চ ১৫১০ খ্রি.
১১.	দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শুরু	এপ্রিল ১৫১০ খ্রি.
১২.	নীলাচলে প্রত্যাবর্তন	মে ১৫১২ খ্রি.
১৩.	গৌড়যাত্রা	সেপ্টেম্বর ১৫১৪ খ্রি.
১৪.	বৃন্দাবনে গমন	১৫১৫ খ্রি.
১৫.	এলাহাবাদে আগমন	জানুয়ারি ১৫১৬ খ্রি.
১৬.	বারাণসীতে আগমন	১৫১৬ খ্রি.
১৭.	নীলাচলে প্রত্যাগমন	মে ১৫১৬ খ্রিঃ
১৮.	তিরোধান	২৭ এপ্রিল ১৫৩৩, রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া।

বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্যদেবের গয়া হতে প্রত্যাগমনের কাল নির্দেশ করেছেন ১৪৩০ শকাব্দের পৌষান্তে, কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের কাল নির্দেশ করেছেন ২৯ মাঘ ১৪৩১ শকাব্দ (ফেব্রুয়ারি ১৫১০)। গয়া হতে ফিরে চৈতন্যদেব ১৩ মাস নবদ্বীপে ছিলেন।

১. জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে চৈতন্যদেবের জীবনকাল ৪৭ বছর ২ মাস ৯ দিন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই সময়কালকে ৪৮ বছর এবং কবি কর্ণপুর ৪৭ বছর উল্লেখ করেছেন।

২. তিনি গৃহে ছিলেন ২৩ বছর ১১ মাস ২৫ দিন। এই সময়কাল নবদ্বীপ লীলার ব্যপ্তি।

৩. তাঁর সন্ন্যাসজীবন পরিব্যপ্ত ছিল ২৩ বছর ২ মাস ১৪ দিন।

৪. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর ৬ বছর তীর্থভ্রমণ করেছিলেন আর ১৮ বছর ছিলেন নীলাচলে।

৫. মুরারিগুপ্তের কড়চায়, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে এবং বাসু ঘোষের একটি পদে দ্বিতীয়বার চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়নি।

৬. চৈতন্যদেব লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেছিলেন মাত্র ১৬ বছর বয়সে। পূর্ব্ববঙ্গ গমনের সময় তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। আর সন্ন্যাসগ্রহণ করেন ২৪ বছর বয়সে।

৭. চৈতন্যদেব নীলাচলে আগমনের পর ক'দিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে এই সময়কাল ছিল একমাসের অধিক, আবার কর্ণপুরের মতে মাত্র ১৮ দিন।

৮. গৌড়ীয় ভক্তদের রচনানুসারে চৈতন্যদেবের প্রয়াণ ঘটেছিল রথযাত্রাকালে। কিন্তু ওড়িয়া ভক্তদের রচনায় তাঁর মৃত্যুকাল বলা হয়েছে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। বিশিষ্ট গবেষক এল.ডি.এস. পিল্লাই জানিয়েছেন যে, ওই বছর অক্ষয়তৃতীয়া ছিল ২৭ এপ্রিল। যেহেতু চৈতন্যদেব ওড়িশাতে প্রয়াত হয়েছিলেন তাই আমরা ওড়িয়া ভক্তদের মতটিকেই গ্রহণ করলাম।
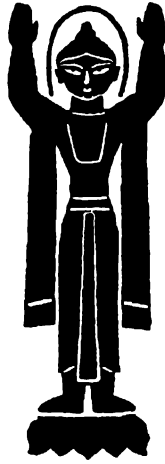
নীলাচল-লীলা

কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের পর কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাওয়ার অভিপ্রায়ে তিন দিন রাঢ়দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। অনুগামী ভক্তরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাঁকে নিয়ে আসেন শান্তিপুরে অদ্বৈত-আলয়ে। নবদ্বীপ নগরীতে এ সংবাদ পৌঁছতেই অসংখ্য চৈতন্যভক্ত অলকানন্দা[১] নদী পেরিয়ে শান্তিপুরে এসেছিলেন। এই দলে শচীমাতাও ছিলেন। শান্তিপুরে কয়েকদিন অবস্থানের পর নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করেন সপার্ষদ চেতন্যদেব।

বাংলা ত্যাগ করে গেলেও চৈতন্যদেব সমাজের শিকড় ধরে যেভাবে নাড়া দিয়েছিলেন, তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, যাত্রা-নাটক, সংগীত-নৃত্যে এবং ধর্ম ভাবনায় যে প্লাবন সূচিত হয়েছিল তার মূলে ছিল চৈতন্য-চেতনার গভীর স্পর্শ। চৈতন্যদেবের

১. 'নবদ্বীপের খালবিল'—মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, 'লোক' পত্রিকা, বইমেলা সংখ্যা ২০০৩, পৃ. ৩২৮-৩৪

মনীষা, দূরদর্শিতা, মানবিকতা এবং সমাজ-ভাবনা জাতীয় জাগরণকে যেভাবে পুষ্ট করেছিল, ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে তার তুলনা দ্বিতীয়রহিত।

সেকালে ওড়িশা ছিল হিন্দু রাজ্য, বাংলার সুলতানদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথম বছরেই ওড়িশা আক্রমণ করেন এবং সফলতা অর্জন করেন। রিয়াজ-উস্-সলাতিন, ত্রিপুরার রাজমালা, বুকাননের বিবরণীতে এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে। ১৫১০-১১ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ তিনটি তাম্রশাসনে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রতাপরুদ্রদেব সিংহাসনে আরোহণের অল্পকালের মধ্যে তিনি গৌড়রাজকে পরাজিত করে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন।[২] ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহ্ পুনরায় ওড়িশা আক্রমণ করেন এবং বেশ কিছু দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করে দেন।[৩] ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে চৈতন্যদেব যখন নীলাচলের উদ্দেশে যাত্রা করেন তখনও পথঘাট বিপদমুক্ত ছিল না, চৈতন্যভাগবতে এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে।[৪] বিপদসঙ্কুল পথঘাটের কথা উল্লেখ করে শুভানুধ্যায়ীরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন চৈতন্যদেবকে। কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে নীলাচলের পথে পা রাখলেন চৈতন্যদেব।[৫]

শান্তিপুর থেকে ভাগীরথীর পূর্ব তীর বরাবর অগ্রসর হয়ে পৌঁছলেন আঠিসারা গ্রামে। সেখানে অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে রাত্রিযাপন করে পরদিন পৌঁছলেন চব্বিশ পরগনা জেলার ছত্রভোগে। হোসেন শাহের কর্মচারী রামচন্দ্র খান ছিলেন এখানকার শাসনকর্তা। রামচন্দ্রের অনুরোধে চৈতন্যদেব তাঁর গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করলেন এবং গৌড়-রাজ্যের সীমানা পার করে দিতে বললেন। রামচন্দ্র খান বিপদসঙ্কুল পথের কথা উল্লেখ করে বললেন যে, এখন দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ, রাজারা ত্রিশূল পুঁতে সীমানা নির্দেশ করেছে, পথিক দেখলেই গুপ্তচর ভেবে প্রহরীরা তাকে হত্যা করছে। কিন্তু চৈতন্যদেব সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। অগত্যা রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সপার্ষদ চৈতন্যদেবকে গঙ্গা পার

২. হুসেন শাহী বেঙ্গল—মমতাজুর রহমান তরফদার, পৃ. ৪৯-৫২
মাদলা পঞ্জী, প্রাচী সংস্করণ, পৃ. ৫২-৫৩
৩. চৈতন্যভাগবত, ৩/৪
৪. তদেব, ৩/২
৫. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/৩

করে উৎকল প্রদেশের শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন রামচন্দ্র। শ্রীপ্রয়াগ ঘাটের অবস্থান ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরে। চৈতন্যদেবের সময়ে সমগ্র মেদিনীপুর সহ বাংলার রাঢ় অঞ্চলের অনেকটাই ওড়িশা রাজ্যের অধীনস্থ ছিল।[৬]

তীর্থযাত্রীর দলটি অধুনা মেদিনীপুর জেলার উপর দিয়ে জলেশ্বর পৌঁছলেন পদব্রজে। পথে পড়েছিল সুবর্ণরেখা-স্বর্ণরেখা প্রভৃতি নদী। জলেশ্বর থেকে আরও অগ্রসর হয়ে বাঁশদা-রেমুণা-জাজপুর-কটক-ভুবনেশ্বর-মলপুর-আঠারনালা অতিক্রম করে পৌঁছলেন শ্রীক্ষেত্র নীলাচলে। এই দীর্ঘ পথে চৈতন্যদেব যেখানেই গেছেন, সেখানেই দর্শন করেছেন দেব-বিগ্রহ। এক্ষেত্রে তাঁর কোনও বাছবিচার ছিল না। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

'না মানে চৈতন্যপথ বোলায় বৈষ্ণব।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তার সব।।'[৭]

ছত্রভোগ, জলেশ্বর এবং ভুবনেশ্বরে শিবমূর্তি দর্শন করেছিলেন চৈতন্যদেব। রেমুণায় গোপীনাথ, জাজপুরে আদিবরাহমূর্তি, কটকে সাক্ষীগোপাল দর্শন করে তৃপ্ত হয়েছিলেন তিনি। আসলে ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কোনও সংকীর্ণতা ছিল না। তিনি ছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়বাদের মূর্ত প্রতীক। অদ্বৈত আচার্যকে অর্চনা করতে গিয়ে চৈতন্যদেব যে শ্লোকটি উচ্চারণ করেছিলেন, সেটিও ছিল সমন্বয়ী চেতনায় পুষ্ট। তিনি বলেছিলেন—

'রাধে কৃষ্ণো রামে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিবা।
যোহসি সোহসি নমোনিত্যং যোহসি সোহসি নমোহস্তুতে।।'[৮]

ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, মানুষের সঙ্গে মানুষের, ব্রাহ্মণের সঙ্গে চণ্ডালের সমন্বয় সাধনই ছিল চৈতন্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এইসব ক্ষেত্রগুলিতে আমরা তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি।

চৈতন্যদেবের পুরী গমনের পথ নিয়ে চরিতকারদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। জয়ানন্দের মতে, চৈতন্যদেব শান্তিপুর থেকে ভাগীরথী অতিক্রম করে অম্বিকা কালনা, কুলীনগ্রাম, শিয়াখালা হয়ে তমোলিপ্তে পৌঁছেছিলেন।[৯] মুরারি

৬. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ৬৬

৭. চৈতন্যভাগবত, ৩/২

৮. চৈতন্যচরিতামৃত

৯. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, উৎকল-১

গুপ্ত মহাপ্রভুর পুরীযাত্রা প্রসঙ্গে প্রথমেই তমোলিপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন।[১০] ফলে তাঁর রচনা থেকে চৈতন্যদেব নীলাচল যাত্রাকালে বাংলার কোন পথ ব্যবহার করেছিলেন, তা জানার উপায় নেই। গোবিন্দদাসের কড়চায় পুরী যাত্রা পথের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, চৈতন্যদেব শান্তিপুর থেকে বর্ধমানে গোবিন্দদাসের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, তারপর হাজিপুর-মেদিনীপুর, নারায়ণগড় হয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।[১১] এক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাস বর্ণিত পুরী গমনের পথটির গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। কারণ, সেকালে শান্তিপুর থেকে ছত্রভোগ হয়ে উৎকলে প্রবেশ করা অধিকতর সহজ ছিল। দ্বিতীয়ত, তিনি চৈতন্য-সঙ্গী নিত্যানন্দের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, যা নির্ভুল হওয়াই স্বাভাবিক।

ভাববিহ্বল চৈতন্যদেব পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথদেবকে কোলে নেওয়ার অভিপ্রায়ে এগিয়ে গেলেন। প্রতিহারীরা ছুটে এসে তাঁকে প্রহার করতে লাগলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, তিনি মহাপ্রভুর পিঠের উপর শুয়ে পড়ে তাঁকে রক্ষা করলেন। নবীন সন্ন্যাসীর অঙ্গ কান্তিতে আকৃষ্ট সার্বভৌম প্রতিহারীদের সাহায্যে অচেতন চৈতন্যদেবকে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। নিত্যানন্দ সহ সঙ্গীসাথিরা জগন্নাথ মন্দিরে এসে চৈতন্যদেবের খবর সংগ্রহ করলেন এবং সার্বভৌমের ভগ্নিপতি গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে বাসুদেব-গৃহে পৌঁছলেন। বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপের লোক ছিলেন। রাজভয়ে তিনি নীলাচলে গমন করেছিলেন।[১২] তাঁর ভগ্নিপতি গোপীনাথ আচার্যও পুরীতেই ছিলেন। তিনিই সার্বভৌমের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেন। বাসুদেব সার্বভৌম ছিলেন ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিও তিনি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু এত অল্প বয়সে দিব্যকান্তিপ্রভাযুক্ত চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেছেন,—

'এ হেন বয়সে তুমার ধর্ম নয়।।
বেদান্ত না পড়িলে সন্ন্যাস নিতে নাই।
বেদান্ত পড়াব গোসাঞি তুমার ঠাঁই।।

১০. মুরারিগুপ্তের কড়চা, ৩/৬/২

১১. গোবিন্দদাসের কড়চা, দীনেশচন্দ্র সেন ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী সম্পাদিত, পৃ. ১৩-১৮

১২. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, ১/৪/১৭-২৮
নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১

শিখাসূত্র ধর পুন বেদান্ত পড়িয়া।
সন্ন্যাস লইবে তুমি বারাণসী গিয়া।।' [১৩]

বাসুদেব সার্বভৌম চব্বিশ বছর বয়স্ক তরুণ সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্তটি যে সঠিক নয়, তা বোঝাবার জন্য তাঁর চেষ্টার অবধি নেই। তিনি চৈতন্যদেবকে আবার শিখাসূত্র গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। বললেন—

'না বুঝিয়া শঙ্করাচার্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়।।
অতএব তোমারে সে কহিলাঙ আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি।।
যদি কৃষ্ণ ভক্তিযোগে করিব উদ্ধার।
তবে শিখাসূত্রত্যাগে কোন লভ্য আর।।
যদি বোল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ।
তাঁরাও করিয়াছেন শিখাসূত্র ত্যাগ।।
তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইল অধিকার।।' [১৪]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনাতেও এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে। সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে বেদান্ত পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সাত দিন বেদান্ত-পাঠ শ্রবণ করালেন। চৈতন্যদেব নির্বিকার, একমনে শ্রবণ করছেন সার্বভৌমের ব্যাখ্যা, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করছেন না। বেদান্তের ব্যাখ্যা বুঝতে পারছেন কি না, এ প্রশ্ন করায় তিনি বললেন যে, সূত্রের অর্থ তিনি বুঝতে পারছেন কিন্তু তাঁর মায়াবাদী ব্যাখ্যা তিনি বুঝতে পারছেন না। জগৎ যে মিথ্যা নয়, নশ্বর মাত্র—চৈতন্যদেব এ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি স্থাপন করলেন এবং ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা করার জন্য সার্বভৌমকে অনুরোধ জানালেন। বাসুদেব সার্বভৌম একটি শ্লোকের তেরো প্রকার অর্থ স্থাপন করে বললেন যে, স্বয়ং বৃহস্পতিও এর বেশি অর্থ করতে পারবে না। চৈতন্যদেব বিনয় সহকারে আরও আঠারোটি নতুন অর্থ স্থাপন করে যখন ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন তখন

১৩. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, উৎকল-১২

১৪. চৈতন্যভাগবত, ৩/৩

বিস্ময়াবিষ্ট সার্বভৌম চৈতন্যচরণে ভক্তিমান হয়ে ভক্তিভাবের মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিলেন। শুরু হল গৌরাঙ্গের উৎকল বিজয়।

সার্বভৌম বললেন—

'অবিদ্যমানের কথা কি কহিব আমি।
যে তোমার মনে হয় তাহা কর তুমি।।
তার সাক্ষী আছে প্রভু! মোর মায়াবাদ।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তিব্যাখ্যা তোমার প্রসাদ।।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি পথে হৈনু তব দাস।
প্রভুর দর্শনে মোর বন্ধ গেল নাশ।।' [১৫]

আঠারো দিন নীলাচলে অবস্থানের পর চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভক্তরা সঙ্গে যেতে চাইলেও তিনি তাঁদের অনুমতি দেননি। কিন্তু চৈতন্য-পরিকরেরা কিছুতেই তাঁকে একা যেতে দিতে রাজি নন। অবশেষে ভক্তদের অনুরোধে কৃষ্ণদাস নামে এক বিপ্রকে সেবক হিসেবে সঙ্গে নিতে রাজি হলেন তিনি।[১৫ক] সার্বভৌম এসে জানালেন যে, গোদাবরী তীরে রাজামুন্দ্রিতে প্রশাসক রায় রামানন্দ আছেন, শূদ্র এবং বিষয়ী হলেও ভক্তিবাদের প্রতি তিনি আস্থাশীল, পাণ্ডিত্যেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সুতরাং চৈতন্যদেব যেন তাঁর সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ করেন।

চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে কেন গিয়েছিলেন এবং কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে চাপান-উতোর আজও অব্যাহত। কিন্তু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের কারণ চৈতন্যদেব নিজেই ব্যক্ত করে বলেছেন, সেখানে তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে দাদা বিশ্বরূপের সন্ধান করা। কিন্তু বিশ্বরূপ যে পূর্বেই প্রয়াত হয়েছেন, এ খবর সকলেরই জানা ছিল।[১৬] তাহলে এই ছলনা কেন? প্রথমত একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি প্রেমভক্তি প্রচার করতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'সমগ্র ভারত জুড়িব প্রেমনামে।' এই সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি সমগ্র ভারতে বিরামহীন পদচারণা

১৫. প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস, প্রথম বিলাস।

১৫ক. সুকুমার সেনের মতে এই কৃষ্ণদাস ছিলেন চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা (চৈতন্যাবদান, ৫৫)। চৈতন্য-সঙ্গী হওয়া তো দূরের কথা, কৃষ্ণদাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-ই ঘটেনি, কারণ কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়েছিল চৈতন্যদেবের অপ্রকটের মাত্র ২-১ বছর আগে।

১৬. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/৭

করেছেন। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ ভারত ভক্তিবাদের পীঠস্থান। প্রায় দু-হাজার বছর আগে তামিল ভূখণ্ডে ভক্তিবাদের প্রথম উদ্ভাস ঘটেছিল আলোয়ার ও আড়বার সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভক্তিবাদের দার্শনিক তত্ত্বের প্রবক্তারাও এখানকার মানুষ। তাই দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ চৈতন্যদেবের কাছে ছিল আবশ্যিক।

চৈতন্যদেব পথে নামলেন, এগিয়ে চললেন আলালনাথের দিকে। সঙ্গে কৃষ্ণদাস কৌপীন আর জলপাত্র বহন করে নিয়ে চলেছেন। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা চৈতন্যদেব দুবাহু ঊর্ধ্বে তুলে বলছেন—

'রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্।।' [১৭]

চৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি ছিল দেবদুর্লভ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পদ-মাধুর্য কান্তিবিদ্যার রসে গভীরভাবে সিক্ত। আজানুলম্বিত দুই বাহু, কন্দর্পকান্তির মতো দেহ-লাবণ্য—সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করত। ভক্তের চোখে কখনও তিনি বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় আলোকোজ্জ্বল, আবার কখনও সোনার পাহাড়ের সঙ্গে তুলনীয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

'আজানুলম্বিত ভুজ কমল-লোচন।
তিল ফুল জিনি নাসা—সুধাংশু বদন।।' [১৮]

নয়নাভিরাম সৌন্দর্য-সুষমায়, পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্বে এবং তাঁর মানবিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছেন সকলেই। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে যারাই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছে, তারাই তাঁর মতাদর্শকে স্বীকার করে নিয়েছে। শুধু দক্ষিণ ভারতের কথাই বা বলি কেন? 'শ্রীচৈতন্যের প্রভাব রয়েছে সারা ভারত জুড়ে। যেখানেই আছে ভক্তিমার্গ, সেখানেই তাঁর লীলার রসোপলব্ধি, তাঁর চর্চা ও অর্চনা।'[১৯] এ কথা বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর মতে, 'বল্লভাচার্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত সম্প্রদায়েরই শাখা মাত্র।'[১৯]

দীর্ঘ দুই বৎসরকাল দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেছিলেন চৈতন্যদেব। তিনি যেমন বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে প্রাচীন ভারতের ভাগবতসত্তাকে অনুভব করতে চেয়েছেন, তেমনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-

১৭. তদেব

১৮. তদেব, ১/৩

১৯. Complete Works of Swami Vivekananda—Centenery Volume, IV, P-337.

প্রদান ঘটিয়ে নিজের চিন্তাচেতনার প্রভাবকে সমাজ-ভাবনার গভীরে প্রোথিত করতে চেয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের লোকসংগীতের প্রসার্যমান ধারায় চৈতন্যদেবের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করেছেন E. P. Rice।[২০] তিনি আরও বলেছেন যে, চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ প্রচারের ফলে দক্ষিণ ভারত থেকে জৈন ধর্মের উৎখাত সম্ভব হয়েছিল।[২১] বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় পুষ্ট দক্ষিণ ভারতীয় গীত সম্ভারে একদিকে যেমন স্থানীয় বৈষ্ণবাচার্যদের প্রভাব বিদ্যমান, তেমনি বিদ্যমান চৈতন্য প্রভাব।[২২] মহীশূর ও কুর্গ অঞ্চলের একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'সাতানি' নামে পরিচিত, তাঁরা নিজেদের চৈতন্যপন্থী বলে দাবি করেন।[২৩] মহানদীর উত্তরে জুয়াঙ্গ জাতির মধ্যে প্রচলিত একটি ব্রত চৈতন্য-প্রভাবিত বলে জানা গেছে।[২৪] তারা বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে কিছু ফলমূল পাতার ঠোঙায় সাজিয়ে অরণ্য-মধ্যে রেখে আসেন। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, একসময় চৈতন্যদেব এই পথে যাওয়ার সময় জুয়াঙ্গ দের কাছে ফল ভিক্ষা করেছিলেন। বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত জানিয়েছেন যে, বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত 'অনিগেহল্লি স্থলের' সন্নিকটে চেন্নাপা নামের জনৈক ভক্ত একটি গ্রাম দান করেছিলেন চৈতন্যদেবকে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৫৩০-৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, এইসময় রাজা অচ্যুতদেব ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের অধীশ্বর। শ্রীচৈতন্যের পক্ষে তাঁর অনুগামী ভক্তরা এই দান গ্রহণ করেছিলেন।[২৫] এর থেকেই অনুমান করা সহজ যে, চৈতন্যদেব যেখানেই গেছেন সেখানেই প্রতিষ্ঠা করেছেন ভক্তিবাদের মাহাত্ম্য। তাঁর বলিষ্ঠ পুরুষকার এবং অঙ্গকান্তির আকর্ষণে মানুষ সহজেই তাঁর মত গ্রহণ করেছিল। তাই সমগ্র ভারতবর্ষেই পরিলক্ষিত হয় তাঁর প্রভাব। ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক রূপে চৈতন্যদেব মিলন-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন মানুষকে। যা ভারতবর্ষের ধর্ম-সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

২০. A History of Kanarese Literature—E. P. Rice, P-59.

২১. Ibid, P-21.

২২. A History of South India—Nilkanta Sastri, P-393.

২৩. 'The Satani are the next most numerous religious sect...They are votaries of Vishnu, especially in the form of Krishna, and are followers of Chaitanya...They call themselves Vaishnavas, the Baisnabs of Bengal'.—Imperial Gazetteer of India, Mysore & Coorg, 1908, P-48

২৪. হিন্দু সমাজের গড়ন—নির্মলকুমার গুপ্ত, পৃ. ৫-৬

২৫. Govindadasa's Kadcha : a black forgery
শ্রীচৈতন্য প্রদক্ষিণ—বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, পৃ. ১১৭

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে বলেছেন—

'এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি।।
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভু পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ।।...
সেই যাই নিজগ্রামে বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়।।
সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ।।' [২৬]

দুই

চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হচ্ছে রায় রামানন্দ মিলন। রামানন্দ ছিলেন সহজিয়া ভাবধারার উপাসক এবং ভক্তি-ভাবনার প্রকৃত রসবেত্তা। গোদাবরী তীরে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল রামানন্দের, চৈতন্যদেব তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সেকালে শূদ্রকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা, দর্শন করাও ছিল সমাজবিগর্হিত কাজ। চৈতন্যদেব যুক্তিহীন সমাজ-শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করে, ব্রাহ্মণ্যবাদের অসারতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি অনেকটাই ভেঙেছিলেন, কিন্তু সবটুকু পারেননি। সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে শূদ্রান্ন গ্রহণ করতে পারেননি তিনি। যিনি বলেছেন, 'চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ।' তিনি যেখানেই গেছেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কেন এই দ্বিচারিতা? যাঁর কথায় এবং কাজে বর্ণভেদের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে বারবার, তিনি কেন রায় রামানন্দের মতো ভক্তের গৃহে আতিথ্য না নিয়ে জনৈক ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হলেন? তা হলে কি চৈতন্যদেব জাত্যাভিমান পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারেননি? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া কঠিন। আসলে মনে হয়, চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি আপস করে চলতে চেয়েছেন।

২৬. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/৭

বিপ্র-গৃহে অপেক্ষায় আছেন চৈতন্যদেব, সন্ধ্যায় রায় রামানন্দ এসে মিলিত হলেন। চৈতন্যদেব মায়াবাদী সন্ন্যাসীরূপে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করে রামানন্দের মুখে কৃষ্ণকথা শোনার বাসনা প্রকাশ করলেন। সাধ্যসাধনতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ শুনতে চাইলেন তিনি। রায় রামানন্দ প্রভুর চরণে প্রণাম করে তত্ত্ব আলোচনায় নিয়োজিত করলেন নিজেকে। তিনি বললেন যে, স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিভাব জন্মায়, আবার সকল কর্ম পরমপুরুষ কৃষ্ণে অর্পণ করতে পারলে সাধ্যবস্তু অর্জন করা যায়, তাছাড়া সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে ভক্তিকে যদি আশ্রয় করা যায়, তা হলেও পরম আরাধ্য বস্তু লাভ করা সম্ভব। এরপর রামানন্দ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা জানালেন, বললেন যে, এই ভক্তি সাধ্যবস্তু লাভে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু চৈতন্যদেব এই চারপ্রকার সাধন রীতিকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'

চৈতন্যদেব জ্ঞানবাদকে কোনওদিন স্বীকার করেননি, একবার অদ্বৈত আচার্যের মুখে জ্ঞানবাদের কথা শুনে তিনি তাঁকে প্রহার পর্যন্ত করেছিলেন। রামানন্দ এবারে জ্ঞানশূন্য ভক্তিবাদের প্রসঙ্গ তুলতেই চৈতন্যদেব তা স্বীকার করে নিলেন, কিন্তু তৃপ্ত হলেন না, বললেন, 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।' রামানন্দ এবার প্রেমভক্তির মহিমা কীর্তন করলেন, শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর রসের ব্যাখ্যা দ্বারা সাধ্যবস্তু লাভের উপায় নিরূপণ করলেন। শান্ত-দাস্য-সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের সংমিশ্রণে সৃষ্ট মধুর ভাব অর্থাৎ 'কান্তাপ্রেম'-ই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রভু নিজেও তা স্বীকার করে নিলেন।

'শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে।।...
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।।' [২৭]

এইভাবে দশ দিন ধরে চলল সাধনতত্ত্ব আলোচনা। চৈতন্যদেব খুশি হলেন, কিন্তু তৃপ্ত হতে পারলেন না। তাঁর মনে আরও প্রশ্ন রয়ে গেল। তিনি বললেন—

'প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।।
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে।।

---

২৭. তদেব, ২/৮

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি।।' [২৮]

এরপর রায় রামানন্দ অত্যন্ত বিনয় সহকারে রাধা প্রেমের মাধুর্য বর্ণনা করে প্রভুকে শোনালেন। কিন্তু তাতেও চৈতন্যদেবের কৌতূহল নিবৃত্ত হচ্ছে না দেখে রামানন্দ শুরু করলেন প্রেমবিলাসবিবর্ত। বললেন—

'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল।।
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি।।' [২৯]

এই সংগীতধারায় প্রস্ফুটিত হয়েছে সাধনতত্ত্বের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এখানেই বিকশিত হয়েছে গোপীভাব, রাগানুগা ভজন প্রণালী। বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভিত্তি রায় রামানন্দের মুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা। রাধাগোবিন্দ নাথের মতো বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীকার করেছেন যে, রায় রামানন্দের স্বরচিত সংগীতের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের বিপরীত রতি বা বিবর্তবিলাস বর্ণিত হয়েছে।[২৯ক] আসলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামানন্দের মুখ দিয়ে সহজিয়া সাধনতত্ত্বকে স্বীকার করিয়ে ছেড়েছেন। সহজিয়া সাধক রায় রামানন্দকে শ্রেষ্ঠ সাধক হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন। চৈতন্যদেব ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, স্ত্রী-জননীকে ত্যাগ করে আজীবন কৃচ্ছ্রসাধন করে কাটিয়েছেন। তাঁর ঐহিক-সুখ-বিবর্জিত আত্মত্যাগের মহিমা হারিয়ে গেল রাধাকৃষ্ণের বিবর্তবিলাসের অতলে।[২৯খ] আসলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে সহজিয়া পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন—এ কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন।[২৯গ] তাই চৈতন্যচরিতামৃতের পরতে-পরতে সহজিয়া ধারার বিন্যাস অতি স্পষ্ট। কবিরাজের নামে প্রচলিত 'নৃলোকসারচিন্তামণি' সহজিয়া সাধনার আকরগ্রন্থ। উত্তরকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দ দাস রচিত 'আদ্যকৌমুদী' গ্রন্থটিও সহজিয়াদের নিগূঢ়সাধনতত্ত্বের প্রাঞ্জল ভাষ্য।

সেকালে ওড়িশা ছিল সহজিয়া সাধনার পীঠস্থান। মন্দির-গাত্রে অঙ্কিত

২৮. তদেব

২৯. তদেব

২৯ক. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা—রাধাগোবিন্দ নাথ, পৃ. ২২৩-২৩৯

২৯খ. প্রেমবিলাস বিবর্ত—রাধাগোবিন্দ নাথ, পৃ. ২২৩-২৯

২৯গ. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ২৭৮

অসংখ্য মিথুন-ভাস্কর্য এ বক্তব্যকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। ওড়িশাবাসী রামানন্দ পট্টনায়েক যে সহজিয়া সাধনতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় সে ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট।[২৯ঘ] এই রামানন্দ ভাষ্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের মূল আদর্শ বিবেচিত হয়েছে। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন, সহজিয়া তত্ত্বের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তত্ত্বের গভীর সাদৃশ্য আছে।[২৯ঙ] অথচ শিষ্ট বৈষ্ণবেরা তা স্বীকার করেন না।

কবি কর্ণপুর তাঁর নাটকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রায় রামানন্দের মিলন এবং তত্ত্বালোচনার উল্লেখ করেছেন।[৩০] মুরারিগুপ্ত[৩১] এবং লোচনদাস[৩২] রামানন্দ মিলনের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তত্ত্বালোচনার উল্লেখ করেননি। কবিরাজ গোস্বামী স্বীকার করেছেন যে, তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চার অনুসরণ করে রামানন্দের মিলন সংবাদ পরিবেশন করেছেন।[৩৩]

রায় রামানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের স্তম্ভ-স্বরূপ। বাংলার বৈষ্ণবগণ রামানন্দকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ওড়িয়া গবেষক বিষ্ণুপদ পাণ্ডার মতে, রামানন্দের সহজিয়া ভক্তিবাদ ওড়িশার ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিরোধী। জ্ঞানমিশ্রাভক্তিবাদ ছিল সেখানে সমাদৃত, অথচ রামানন্দ ছিলেন প্রেমভক্তির উপাসক। তাই তাঁকে গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে, প্রকৃত অর্থে প্রেমভক্তিতত্ত্বের নির্বাসন ঘোষিত হয়েছিল।[৩৪] ১৫০১-০২ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা করেছিলেন। এই নাটকটি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত। বিষ্ণুপদ পাণ্ডার সিদ্ধান্তটি যদি সঠিক হত, তাহলে তা কি সম্ভব হত?

বিদ্যানগরে রায় রামানন্দকে কৃপা করে চৈতন্যদেব আরও দক্ষিণে গমন করলেন। মল্লিকার্জুন তীর্থে মহেশ্বর এবং অহোবলে নৃসিংহদেবকে দর্শন করে তৃপ্ত হলেন তিনি। এরপর চিঙ্গেলপুট জেলার চেয়ুর গ্রামে স্কন্দ-কার্তিকের বিগ্রহ দর্শন করে গেলেন ত্রিমঠে, সেখানে দর্শন করলেন বিষ্ণুমূর্তি। কৃষ্ণদাস

২৯ঘ. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/৮

২৯ঙ. চৈতন্যদেব ঃ ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ২৮৯

৩০. চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকং—কবি কর্ণপুর, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত, সপ্তম অঙ্ক

৩১. মুরারিগুপ্তের কড়চা, ৩/১৫/১

৩২. চৈতন্যমঙ্গল—লোচন, শেষ খণ্ড

৩৩. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/৮

৩৪. শ্রীচৈতন্য প্রদক্ষিণ—বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, পৃ. ১১৪

কবিরাজের বর্ণনানুসারে এরপর সিদ্ধবট, বুদ্ধকাশী, ত্রিপদীমল্ল, বেঙ্কট অঞ্চল, পানানরসিংহ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, পক্ষীতীর্থ, বৃদ্ধকোল, বেদাবন প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে অন্য ধর্মাবলম্বী বহু মানুষের মধ্যে স্বমত স্থাপন করে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পৌঁছলেন তিনি। এই তীর্থস্থানটি কাবেরী নদীতীরে অধুনা তিরুচিরাপল্লির সন্নিকটে। সেখানে বেঙ্কটভট্ট নামে এক বৈষ্ণব পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে চৈতন্যদেবের। তিনি বর্ষার চার মাস বেঙ্কটভট্টের গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করেন। কৃষ্ণকথা আলোচনার মধ্যে দিয়ে চার মাস আনন্দেই কাটালেন তিনি। শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্র থেকে চৈতন্যদেব এলেন ঋষভ পর্বতে, সেখানে সাক্ষাৎ ঘটল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে। ঠিক হল তিনি বাংলাদেশ যাবেন, সেখান থেকে ফিরে এসে পুরীতে চৈতন্য-সান্নিধ্যে কাল কাটাবেন।

ঋষভ পর্বত থেকে শ্রীশৈল, কামকোষ্ঠী ঘুরে এলেন দক্ষিণ মথুরায়, অর্থাৎ আধুনিক মাদুরাইয়ে। সেখানে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করে দুর্বেশন পৌঁছলেন, রঘুনাথ এবং মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দর্শন করে তিনি সেতুবন্ধে গমন করলেন। সেখানে ধনুতীর্থে স্নান করে রামেশ্বর দর্শন করে পরমতৃপ্তি লাভ করলেন। এরপর তাম্রপর্ণী, চিড়য়তালা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্রমক্ষণ, পানাগড়, চামতাপুর, মলয় পর্বত অতিক্রম করে পৌঁছলেন কন্যাকুমারীতে। সেখান থেকে আমলিতলা হয়ে এলেন মল্লার দেশে, এখানে ভট্টমারিদের আস্তানা ছিল।[৩৫] চৈতন্যদেবের সঙ্গী কৃষ্ণদাস ভট্টমারিদের খপ্পরে পড়ে গেলেন। পরদিন চৈতন্যদেব নিজে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। এখানেই তিনি ব্রহ্মসংহিতা পুথিটির সন্ধান পেলেন এবং দেখলেন রামানন্দের মুখে তিনি যে রসতত্ত্বের কথা শুনেছিলেন, তার পুরোটাই এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। চৈতন্যদেব কালক্ষেপ না করে পুথিটির অনুলিপি করিয়ে নিলেন।

এবারে এলেন ত্রিবান্দ্রমে, সেখানে অনন্তশয্যায় পদ্মনাভকে দর্শন করে শঙ্করাচার্যের শৃঙ্গেরীমঠে উপস্থিত হলেন। ঘুরতে-ঘুরতে এরপর তিনি এলেন মৎস্যতীর্থে, তুঙ্গভদ্রা নদীতে স্নান করে তত্ত্ববাদী মধবাচার্যের মঠে এসে পৌঁছলেন। সেখানে উডুপকৃষ্ণের মূর্তি দেখে ভাবাবেগে নৃত্য করতে লাগলেন। সেখানকার তত্ত্ববাদীগণ নবীন সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন। সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনায় প্রবীণ তত্ত্ববাদীগণের গর্ব চূর্ণ করে চৈতন্যদেব ফল্গুতীর্থের দিকে চলে গেলেন। ত্রিতকূপ, পঞ্চাপ্সরা, গোকর্ণ, সুর্পারক অতিক্রম করে তিনি কোঙ্কণের কোলাপুরে পৌঁছলেন। এখানে

৩৫. ভট্টমারি হচ্ছে সিরিয় ক্যাথলিক খ্রিস্টান—চৈতন্যাবদান, পৃ. ৫৮

লক্ষ্মীমূর্তি দর্শন করে তিনি গেলেন পুনায়, এখানে আছেন চোরাভগবতী। ঘুরতে-ঘুরতে এবার এলেন পাণ্ডুপুরে, সেখানে বিঠ্‌ঠল বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করে আবার প্রেমাবিষ্ট হলেন। এখানে সাক্ষাৎ ঘটল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরীর সঙ্গে। এঁর কাছেই সংবাদ পেলেন যে, বিশ্বরূপ ওরফে শঙ্করারণ্য এখানেই প্রয়াত হয়েছিলেন। সেখানে পাঁচ-সাত দিন কৃষ্ণালোচনায় মগ্ন থেকে চৈতন্যদেব কৃষ্ণবেন্না নদীতীরে এলেন, এখানে এক দেবতার মন্দিরে কৃষ্ণকর্ণামৃত পুথি পড়তে দেখে তিনি আকৃষ্ট হলেন এবং বিল্বমঙ্গল রচিত পুথিটি নকল করিয়ে নিলেন। তারপর তাপ্তী-নর্মদা নদীতীরে বহু দেবালয় দর্শন করে দণ্ডকারণ্যে পৌঁছলেন, ঘুরতে-ঘুরতে এরপর এলেন পঞ্চবটী, নাসিক, ব্রহ্মগিরি, কুশাবর্ত হয়ে আবার বিদ্যানগরে পৌঁছলেন। সেখানে রামানন্দের কাছে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে চৈতন্যদেব বললেন—

'তীর্থযাত্রা কথা তবে সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা, দুটি পুঁথি দিলা।।
প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত করিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে।।' [৩৬]

ইতিমধ্যে রায় রামানন্দ রাজকার্যে ইস্তফা দিয়ে নীলাচল গমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। এ কথা শুনে চৈতন্যদেব খুশি হলেন। পুরীতে ফিরে এলে রাজগুরু কাশীমিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল চৈতন্যদেবের। তিনি তাঁকে কৃপা করলেন। রাজাদেশে এবার চৈতন্যদেবের বাসস্থান নির্দিষ্ট হল কাশীমিশ্রের গৃহ-সংলগ্ন চত্বরে।

'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক একটি গ্রন্থে চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কিন্তু জাল প্রমাণিত হওয়ায় গ্রন্থটিতে পরিবেশিত তথ্য এখানে গ্রহণ করা হয়নি।[৩৭] বৃন্দাবনদাস, মুরারিগুপ্ত, কবি কর্ণপুর, জয়ানন্দ প্রভৃতি চরিতকারেরা সেতুবন্ধ পর্যন্ত চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। পুরী থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত দর্শন করে তিনি যদি ফিরে আসতেন তা হলে তাঁর দু-বছর সময় লাগার কথা নয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, তা হলে তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন? দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে কর্ণাটকে চৈতন্যদেবের সবিশেষ প্রভাব দেখে অনুমিত

৩৬. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/৯

৩৭. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ১২৮

হয়, তিনি সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করেছিলেন এবং সমাজের মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।[৩৮]

তিন

এদিকে চৈতন্য-অনুগামী ভক্তরা তাঁর বিরহে জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন। তাঁরা চৈতন্যদেবকে কাছে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে নীলাচলবাসী আরও কিছু মানুষ চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর কৃপালাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌম সেইসব নতুন ভক্তদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের পরিচয় ঘটালেন। এঁদের মধ্যে জগন্নাথ-সেবক জনার্দন, স্বর্ণ-বেত্রধারী এক কৃষ্ণদাস, লিখন অধিকারী শিখি মাহিতী, তাঁর ভ্রাতা মুরারি মাহিতী, বৈষ্ণব প্রদ্যুম্নমিশ্র, জগন্নাথদাস, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি, বিষ্ণুদাস, প্রহররাজ মহাপাত্র, পরমানন্দ মহাপাত্র, রায় রামানন্দের পিতা ও পাঁচ ভ্রাতা চৈতন্য-অনুগ্রহ লাভ করলেন। নবাগত ভক্তদের বিদায় করে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় ভক্তদের সামনে ভ্রমণসঙ্গী কৃষ্ণদাসকে পরিত্যাগ করলেন, ভট্টমারিদের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার অপরাধে। নিত্যানন্দ তাঁকে গৌড়ে পাঠিয়েদিলেন, চৈতন্যদেবের নীলাচল আগমনের খবর পৌঁছে দিতে। প্রভুর নীলাচল আগমনের সংবাদ পেতেই গৌড়ের ভক্তরা পুরী গমনের উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করে দিল। এই সময় পরমানন্দপুরী নবদ্বীপে এসে চৈতন্যদেবের নীলাচল আগমনের খবর পেয়ে আর কালক্ষেপ না করে যাত্রা করলেন পুরীর উদ্দেশে।

নীলাচলে চৈতন্য-পরিকরদের সংখ্যা ক্রমশ স্ফীত হতে লাগল। এলেন পরমানন্দপুরী, তিনি চৈতন্যের অভিভাবক রূপে নীলাচলেই থেকে গেলেন। নবদ্বীপ থেকে এলেন স্বরূপ দামোদর। এঁর পূর্বনাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কাশীতে গিয়ে বেদান্ত পাঠ শুরু করেন। পুরোপুরি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের আগেই ইনি নীলাচলে এসে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। পরবর্তী পর্যায়ে ইনি চৈতন্যের এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন যে,

৩৮. A History of Kanarese Literature, E. P. Rice, P-59
A History of South India—Nilkanta Sastri, P-393
The Folk Songs of Southern India—Charles E. Gover
Imperial Gazetteer of India, Mysore & Coorg, P-48.

তাঁর অনুমতি ভিন্ন চৈতন্য-দর্শন ছিল প্রায় অসম্ভব। আবার ঈশ্বরপুরীর ইচ্ছানুসারে তাঁর তিরোধানের পর তাঁর দুই সেবক শূদ্র গোবিন্দ এবং কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী এলেন চৈতন্যদেবের কাছে, তাঁর সেবা করতে। গোবিন্দ আগেই এসে হাজির হলেন, তীর্থভ্রমণ করে কয়েকদিন পরে এলেন কাশীশ্বর। চৈতন্যদেব শূদ্র গোবিন্দকে নিজের সেবক নিযুক্ত করে সেকালের প্রচলনির্ভর সমাজ-শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করেছিলেন। ওদিকে বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দপুরী নীলাচলে চৈতন্য-সান্নিধ্যে এসে ভক্তিবাদের পথকে স্বীকার করে পুরীতেই থেকে গেলেন।

ক্রমে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার কাল উপস্থিত হল। গৌড়দেশ থেকে দুই শত বৈষ্ণব ভক্ত নীলাচলে এসে পৌঁছলেন। চৈতন্যদেব সকল ভক্তের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং দক্ষিণদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা পুথি দুটি তাঁদের হাতে তুলে দিলেন। বাসুদেব দত্ত এবং আরও কেউ কেউ পুথি দুটি নকল করিয়ে নিলেন। সন্ধ্যায় গৌড়ীয় ভক্তরা চৈতন্যদেবকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ দর্শন করতে গেলেন। সেখানে চৈতন্যদেব কীর্তনের সূচনা করলেন। চারটি সম্প্রদায়ে কীর্তন দলকে ভাগ করা হল। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর ও শ্রীবাস—এই চার জনকে চার সম্প্রদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হল। আটটি মৃদঙ্গ আর বত্রিশ জোড়া করতাল বাজতে লাগল। পড়িছা এসে সকল ভক্তকে ফুলের মালা ও চন্দন চর্চিত করে দিল। সংকীর্তন বেশ জমে উঠল। চৈতন্যদেব মধ্যখানে নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর চোখে অশ্রুধারা বর্ষিত হতে লাগল। অভিনব নাম-সংকীর্তন, নৃত্য এবং কৃষ্ণপ্রেমের ভাবাবেশ দেখে ওড়িশাবাসীরা আবিষ্ট হয়ে পড়ল। নবদ্বীপের পর চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নামসংকীর্তনের সূচনা হল নীলাচলে।[৩৯]

উৎকল অধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর কীর্তনাবেশ দেখে এতটাই মুগ্ধ হলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন। চৈতন্যদেবের সব খবরই তিনি রাখতেন। প্রতাপরুদ্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পূর্বে অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু চৈতন্যদেব কোনওভাবেই রাজদর্শনে রাজি হননি। একদিন সার্বভৌম মহাপ্রভুকে বললেন—

সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়।।
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।

৩৯. চৈতন্যাবদান—সুকুমার সেন, পৃ. ৬৫

সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন।।
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ।।' [৪০]

সার্বভৌমের চেষ্টা ব্যর্থ হল। চৈতন্যদেব রাজদর্শনে রাজি হলেন না। তিনি সার্বভৌমকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, আবার যদি ও কথা মুখে আনো তা হলে আমাকে আর এখানে দেখতে পাবে না। ওদিকে রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুরাগ দিন দিন বাড়তে লাগল। তিনি বললেন—

'তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজ দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন।।
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ।।' [৪১]

চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলনের জন্য প্রতাপরুদ্রের গভীর আগ্রহ দেখে সার্বভৌম একটি কৌশল ঠিক করলেন। তিনি রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, রথযাত্রার দিন প্রভু যখন ভাবাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করবেন তখন যেন তিনি রাজবেশ ত্যাগ করে প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়েন, তা হলেই বাহ্যজ্ঞানরহিত প্রভু বৈষ্ণব-জ্ঞানে তাঁকে আলিঙ্গন করবেন। এইভাবেই রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও জানিয়েছেন যে, চৈতন্যদেবের কৃপা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব প্রতাপরুদ্র কটক থেকে ভট্টাচার্যের কাছে অনুনয়-বিনয় করে পত্র লিখে পাঠালেন। তিনি লিখলেন—

'যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী।।' [৪২]

প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা দেখে বাসুদেব সার্বভৌম গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে সব কথা খুলে বললেন এবং সকলে মিলিতভাবে চৈতন্যদেবকে অনুরোধ জানালেন রাজার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে। কিন্তু চৈতন্যদেব বিষয়ী মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কোনওরকমেই রাজি হলেন না। অবশেষে নিত্যানন্দের

৪০. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/১১
৪১. তদেব, ২/১১
৪২. তদেব, ২/১২

সনির্বন্ধ অনুরোধে চৈতন্যদেব রাজাকে একখণ্ড বহির্বাস পাঠাতে সম্মত হলেন। বস্ত্রখণ্ড পেয়ে রাজার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হল ঠিকই, কিন্তু তিনি প্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য প্রয়াস চালাতে লাগলেন। এদিকে রায় রামানন্দ পুরীতে ফিরে এলে প্রতাপরুদ্র তাঁকেও অনুরোধ জানালেন প্রভুর সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটাবার জন্যে। রায় রামানন্দ বিষয়টি চৈতন্য-সমীপে উত্থাপন করলে তিনি বললেন—

'প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি।।
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়।।' [৪৩]

অবশেষে রায় রামানন্দের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি রাজপুত্রের সঙ্গে মিলিত হতে রাজি হলেন। তবুও রাজদর্শনে তাঁকে রাজি করানো গেল না। এর থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি সাধারণ সন্ন্যাসীর মতো ছিলেন না। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি যথাসম্ভব নিয়মনিষ্ঠা পালন করে চলতেন। এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ়তা ছিল আদর্শস্থানীয়। সংযমী জীবনযাপন করতেন তিনি। নিজে যেমন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি, তেমনি তিনি তাঁর পরিকরদের বিপথগামিতাকেও প্রশ্রয় দেননি। জীবনাচরণের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কঠোর অভিব্যক্তি।

ইতিমধ্যে রথযাত্রার দিন সমাগত হল। চৈতন্যদেব কাশীমিশ্র ও সার্বভৌমকে বলে গুণ্ডিচা-মন্দির পরিষ্কার করার অনুমতি চেয়ে নিলেন রাজার কাছ থেকে। রাজ-আজ্ঞায় মন্দির-মার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ঝাঁটা কলশি এনে হাজির করল পড়িছারা। চৈতন্যদেব গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালনের কাজে লেগে পড়লেন। রথযাত্রার প্রথম দিবসে রাজা স্বয়ং সোনার ঝাঁটা দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে লাগলেন। চৈতন্যদেব গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় কীর্তনের সূচনা করলেন। সাত সম্প্রদায়ের কীর্তনের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। এদের মধ্যে ছিল শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়, কুলীনগ্রামের সম্প্রদায় আর শান্তিপুরের সম্প্রদায়। সাত জোড়া খোল আর ছাপ্পান্ন জোড়া করতাল ধ্বনির মধ্যে চৈতন্যদেব নৃত্য করতে লাগলেন। এই কীর্তনের মধুর সুরমূর্ছনা এবং ভাবাবেশে চৈতন্যদেবের নৃত্য দেখতে অসংখ্য মানুষের ভিড় জমে গেল। আজানুলম্বিত তাঁর দুই বাহু,

---

৪৩. তদেব

বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় আলোকোজ্জ্বল তাঁর অঙ্গকান্তি, কন্দর্পকান্তির মতো রূপ-মাধুর্যে নীলাচলবাসী ভক্তরা পরম বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে গেলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য চৈতন্যদেব উদ্দণ্ড নৃত্যকালে পতনোন্মুখ হলে প্রতাপরুদ্র তাঁকে রক্ষা করলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি রাজাকে দেখে অখুশি হলেন। রাজা নিজেও সংকুচিত হয়ে রইলেন। সার্বভৌম এসে রাজাকে সান্ত্বনা দিলেন। এরপর রথ এসে থামল বলখণ্ডিতে। এখানে জগন্নাথের ভোগ হবে তারপর শুরু হবে পথ চলা। পরিশ্রমে ক্লান্ত চৈতন্যদেব এক উপবনে বিশ্রাম করতে গেলেন। সার্বভৌমের উপদেশে প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করে সাধারণ ভক্তের বেশে প্রভুর নিকটে উপস্থিত হয়ে পদসংবাহন করতে লাগলেন আর সেইসঙ্গে কৃষ্ণের রাসলীলার শ্লোক শোনাতে লাগলেন। প্রেমাবেশে আত্মমগ্ন চৈতন্যদেব রাজাকে আলিঙ্গন করলেন। প্রতাপরুদ্রের এতদিনের ইচ্ছা পূরণ হল, রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে।

শেষ হল রথযাত্রা। চৈতন্যদেব নিজগণ সহ কীর্তনানন্দে মেতে রইলেন। ইতিমধ্যে এসে গেল জন্মাষ্টমী। চৈতন্যদেব ভক্তগণ সঙ্গে 'কৃষ্ণযাত্রা' অভিনয় করেছিলেন। চৈতন্যদেব গোপবেশ ধারণ করেছিলেন, কহ্নাই খুঁন্টিয়া নন্দের ভূমিকায়, জগন্নাথ মাহিতী ব্রজেশ্বরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সেখানে রাজা প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, বাসুদেব সার্বভৌম এবং পড়িছারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ দক্ষ ওস্তাদের মতো লাঠিখেলা দেখিয়ে উপস্থিত সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন।[৪৪] আবার বিজয়া দশমীর দিন 'রামযাত্রা' পালায় চৈতন্যদেব হনুমানবেশে লঙ্কার গড় ভেঙে ফেলেছিলেন। এইভাবে রাসলীলা, দীপাবলি এবং উত্থানদ্বাদশী যাত্রা নীলাচলবাসী দর্শকবৃন্দকে তৃপ্ত করেছিল। চৈতন্যদেবের অভিনয় প্রীতি নবদ্বীপের সীমা লঙঘন করে শান্তিপুর এবং নীলাচল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল।

গৌড়ের ভক্তরা এবার দেশে ফিরে চললেন। বিদায় জানাবার সন্ধিক্ষণ এসে উপস্থিত হল। চৈতন্যদেব বললেন—

'সবারে কহিল প্রভু প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া।।
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদিরে করিহ কৃষ্ণভক্তি দান।।

৪৪. তদেব, ২/১৫

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে।।' [৪৫]

বৃন্দাবনদাস অবশ্য ঘটনাটিকে অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। ঘটনার কালক্রম নিয়েও চরিতকারদের মধ্যে ঐক্য নেই। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের আগেই গৌড় ভ্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন। এবং গৌড় হতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার কাহিনি উপস্থাপনা করেছেন। মুরারিগুপ্তের বর্ণনায় দেখা যায়, মথুরা-বৃন্দাবন থেকে ফিরে তবে চৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করেছিলেন। অথচ কবি কর্ণপুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের পরেই ঘটনাটিকে ব্যক্ত করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্ণপুরকেই অনুসরণ করেছেন। এক্ষেত্রে কর্ণপুর ও কৃষ্ণদাসের বিবরণই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, কর্ণপুর নিজে পুরী গেছেন, চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছে। সর্বোপরি সমকালীন নীলাচলের ভক্তদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। বিশেষ করে রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গেও ছিল তাঁর সুগভীর সম্পর্ক। আবার কৃষ্ণদাস কবিরাজও স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। যা অভ্রান্ত বলেই আমরা মনে করি। তাই নীলাচল লীলার অধিকাংশ তথ্যসূত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ থেকেই সংগৃহীত হল।

বৃন্দাবনদাসের মতে, গৌড়ীয় ভক্তদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় উপস্থিত হলে চৈতন্যদেব বললেন—

'প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি।।
প্রতিজ্ঞা করিল আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাব প্রেমসুখে।।
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি।।
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার।।
ভক্তিরস-দাতা তুমি তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার কিবা নিমিত্তে করিলে।।
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও।।

---

৪৫. তদেব

মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবারে মোচন।।
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে।।' [৪৬]

এইভাবে প্রত্যেক ভক্তের কাছে গিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন চৈতন্যদেব। শ্রীবাস পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করে তাঁর হাতে বস্ত্র ও প্রসাদ পাঠালেন মায়ের জন্য। যেখানেই থাকুন তিনি মাকে কখনও ভুলে যাননি। মায়ের প্রতি এই মমত্ববোধ তাঁর মানবিক সত্তাকে বিকশিত করে তুলেছে। আমরা যতই তাঁকে ফুল-চন্দনে আচ্ছাদিত করে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই না কেন, তিনি কিন্তু বারবার তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শিশুর প্রতি, আর্ত-অভাজনের প্রতি, পতিতজনের প্রতি তাঁর যে মমতা, তা তাঁকে মানব-প্রেমের শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

আবার ফিরে যাই পুরীতে, সেখানে তিনি বাসুদেব দত্তের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব প্রদান করেছেন শিবানন্দ সেনকে। পরম উদার বাসুদেব দত্ত সঞ্চয়ে বিশ্বাসী ছিলেন না, দিনে যা আয় হয় তা তিনি দিনেই ব্যয় করেন। চৈতন্যদেব বলেছেন—

'গৃহস্থ হয়েন ইহোঁ চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্বভরণ না যায়।।' [৪৭]

সংসার সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। সংসারী ভক্তদের তিনি সঞ্চয় করতে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদের তা উপেক্ষা করতে বলেছেন। কুলীনগ্রামের সত্যরাজ খানকে প্রতি বছর রথ টানার শক্ত রেশমের দড়ি জোগানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। সত্যরাজ খান ছিলেন বিষয়ী গৃহস্থ। তিনি চৈতন্যচরণে প্রণত হয়ে তাঁর সাধন-কর্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রভু বললেন—

'প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন।।' [৪৮]

৪৬. চৈতন্যভাগবত, ৩/৫

৪৭. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/১৫

৪৮. তদেব

কিন্তু এতেও সত্যরাজের প্রশ্নের নিরসন হয় না। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে যে, বৈষ্ণব তিনি কেমন করে চিনবেন? চৈতন্যদেব তার উত্তরে বলেছিলেন, যার মুখে একবার মাত্র কৃষ্ণনাম শোনা যাবে তিনিই বৈষ্ণব, তিনি সকলের পূজ্য। সত্যরাজ খান কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। পরের বছর আবার বৈষ্ণবের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করায় চৈতন্যদেব বললেন—

'কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে।।' [৪৯]

তার পরের বারে সত্যরাজ খান পুনরায় একই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে প্রভু নির্দেশ করেছিলেন—

'যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।।' [৫০]

বৈষ্ণবের লক্ষণ সম্পর্কীয় চৈতন্যদেবের এই উপদেশ ভক্তদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এবারে শ্রীখণ্ডের মুকুন্দদাস, রঘুনন্দন, নরহরি সরকার প্রমুখকে সম্ভাষণ জানালেন। মুকুন্দ ছিলেন রাজবৈদ্য, বাংলার নবাব হোসেন শাহের চিকিৎসক। চৈতন্যচরণে তিনি ভক্তিমান হয়েছিলেন। এরপর বিদ্যাবাচস্পতি বাসুদেব এবং মুরারিগুপ্তকে বিদায় দিয়ে চৈতন্যদেব বিষণ্ণ হয়ে রইলেন। গৌড়ের ভক্তরা ফিরে গেলেন, নীলাচলে রইলেন গদাধর পণ্ডিত, পুরীগোসাঁই, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত আর দুই সেবক গোবিন্দ ও কাশীশ্বর।

চার

এবারে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু রায় রামানন্দ, রাজা প্রতাপরুদ্র এবং সার্বভৌমের আপত্তিতে ক্রমাগত তাঁর যাত্রার তারিখ পিছিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে ১৪৩৬ শকাব্দের (১৫১৪ খ্রি.) বিজয়া দশমীর দিনে শুরু হল তাঁর বৃন্দাবন যাত্রা। ঠিক হল তিনি গৌড় হয়ে মথুরা বৃন্দাবনে যাবেন। ভবানীপুর, ভুবনেশ্বর হয়ে কটকে উপস্থিত হলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র

৪৯. তদেব, ২/১৬

৫০. তদেব

কটকেই ছিলেন, তিনি প্রভুকে স্বাগত জানালেন। বারবার প্রণাম করেও তাঁর আশা মিটছে না দেখে প্রভু খুশি হলেন এবং রাজাকে কৃপা করলেন। রাজা প্রভুর যাত্রাপথ সুগম করার জন্য নির্দেশ জারি করলেন। কটকে নদী পার হয়ে জাজপুর, রেমুণা অতিক্রম করে ওড়িশার সীমানায় পৌঁছলেন। সেখানে যবন-রাজের অধিকারী চৈতন্য-প্রভাবে পড়লেন এবং প্রভুর গমনের জন্য নতুন নৌকোর ব্যবস্থা করে সঙ্গে সেনা পাঠিয়ে পিছলদা পার করে দিলেন। এরপর চৈতন্যদেব নদীপথে পানিহাটি পৌঁছলেন।

চৈতন্যদেবের গৌড় ভ্রমণের ক্রমবর্ণনায় চরিতকারেরা সহমত হতে পারেননি। কর্ণপুরের মতে, প্রভু পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে রাত্রি যাপন করে কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে উপনীত হন। এরপর শিবানন্দ-গৃহে কিছুকাল অবস্থানের পর প্রভু এলেন শান্তিপুরে, অদ্বৈত-গৃহে। এখান থেকে জলপথেই নবদ্বীপ-সংলগ্ন কুলিয়ায় মাধবদাসের গৃহে সাত দিন অবস্থান করে চৈতন্যদেব স্থলপথ ধরে উত্তরবঙ্গের দিকে যাত্রা করলেন।[৫১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্ণপুরকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস বিষয়টিকে অন্যভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি পথের বিবরণ সম্পূর্ণভাবে অনুক্ত রেখেছেন এবং প্রভুকে প্রথমেই বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে এনে উপস্থিত করেছেন।[৫২] মুরারিগুপ্তের কড়চাতেও এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে।[৫৩] বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

'সার্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম।
শান্ত দান্ত ধর্মশীল মহাভাগ্যবান।।
সব পারিষদ সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তান ঘর।।' [৫৪]

চৈতন্যদেব বিদ্যানগরে এসেছেন এ খবর রটে যেতেই নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ গঙ্গা পেরিয়ে এসে ভিড় জমালেন। অতিরিক্ত লোক-সংঘট্ট দেখে চৈতন্যদেব কাউকে কিছু না বলে কুলিয়ায় মাধবদাসের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে সাতদিন অবস্থান করে ভক্তগণকে মহাসুখী করে গঙ্গার তীর বরাবর রামকেলির পথে অগ্রসর হলেন।

৫১. চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, নবম অঙ্ক
৫২. চৈতন্যভাগবত, ৩/৩
৫৩. মুরারিগুপ্তের কড়চা, ৩/১৭/১৪
৫৪. চৈতন্যভাগবত, ৩/৩

রামকেলির অবস্থান ছিল গৌড়ের সন্নিকটে। ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। বিশেষত হিন্দু রাজ-কর্মচারীরা অনেকেই এই গ্রামে বাস করতেন। এখানে বিদ্যাবাচস্পতির টোল ছিল। রূপ ও সনাতন ছিলেন তাঁর ছাত্র। সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব। তাঁকে দেখবার জন্যে ভিড় ক্রমশ বাড়তে লাগল। অসংখ্য জনসমাগমের খবর সুলতান হোসেন শাহের কানেও পৌঁছল। তিনি হিন্দু কর্মচারীদের ডেকে চৈতন্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁর ক্রিয়াকর্মে বাধা না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। ভক্তসঙ্গে চার-পাঁচ দিন কীর্তনানন্দে মেতে রইলেন চৈতন্যদেব। একদিন গভীর রাত্রে বেশ বদল করে এলেন দবিরখাস আর সাকরমল্লিক। তাঁরা দীন বেশে দাঁতে তৃণ ধারণ করে চৈতন্যচরণে আছড়ে পড়লেন। মহাপ্রভু এঁদের দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে নতুন নামকরণ করলেন রূপ আর সনাতন। এঁরা দুই ভাই সংসার ত্যাগ করে চৈতন্যচরণে আশ্রয় চাইলেন। ইতিপূর্বে চিঠিতেও তাঁরা বারবার এ কথা জানিয়েছেন। চৈতন্যদেবও চিঠির জবাবে অপেক্ষা করার কথা বলেছেন—

'দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার।।
তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রদ্বারে।
শিখাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে।।...
গৌড়-নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন।।
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলিগ্রামে।।' [৫৫]

চৈতন্যদেব অচিরেই দুই ভাইকে উদ্ধার করার অঙ্গীকার করলে তাঁরা প্রীত হলেন। ফিরে যাওয়ার আগে তাঁরা চৈতন্যচরণে নিবেদন জানালেন যে, তীর্থযাত্রায় এত লোক-সংঘট্ট যুক্তিযুক্ত নয়, যবন রাজাকে বিশ্বাস নেই, কখন যে তাঁর মতিগতির পরিবর্তন হবে তা কেউ বলতে পারে না। রূপ-সনাতনের পরামর্শ স্বীকার করে চৈতন্যদেব এই গ্রাম ত্যাগ করে কানাইয়ের নাটশালায় পৌঁছলেন। সুকুমার সেন বলেছেন, 'নাম থেকেই বোঝা যায় এই গ্রামে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় চিত্র অথবা প্রতিমার স্থায়ী প্রদর্শনী অথবা গীত-অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল।'[৫৬] তিনি সেখানে কৃষ্ণলীলা দর্শন করলেন। সংখ্যাতীত ভক্ত সমাহারে

---

৫৫. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/১

৫৬. চৈতন্যাবদান, পৃ. ৭২

বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছা ত্যাগ করে তিনি শান্তিপুরে ফিরে এলেন। নবদ্বীপে মাতা শচীদেবীর কাছে সংবাদ পাঠালেন। শচীদেবী সত্বর শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে উপস্থিত হলেন। মাকে দেখে প্রীত হলেন চৈতন্যদেব। এখানে দিন দশেক আনন্দেই কাটল। অদ্বৈত-গৃহে সাক্ষাৎ ঘটল রঘুনাথদাসের সঙ্গে। সপ্তগ্রামের ধনী জমিদার গোবর্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ। শিশুকাল থেকেই তিনি বিষয়-বিরক্ত। চৈতন্যচরণে ভক্তিমান হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে নীলাচল যেতে চাইলেন। প্রভু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

'মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈঞা।।
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার।।' [৫৭]

আচার্যের কাছে বিদায় নিয়ে এবার তিনি এলেন কুমারহট্টে, শ্রীবাস গৃহে। শ্রীবাস ছিলেন নবদ্বীপের ধনী গৃহস্থ। তাঁর অঙ্গনে কীর্তনের আসর বসত প্রতিদিন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পর সেই শ্রীবাসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কুমারহট্টে। এখানে দেখতে পাচ্ছি, শ্রীবাস মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সংসারেও নেমে এসেছে বিপর্যয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়। বৃন্দাবনের ভাষায়—

'প্রভু বলে তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে বা কুলাইবা কেমতে কুলাও।।
শ্রীবাস বলেন প্রভু কোথাও যাইতে।
না লয় আমার চিত্ত কহিনু তোমাতে।।
প্রভু বলে পরিবার অনেক তোমার।
নির্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার।।
শ্রীবাস বলেন যার অদৃষ্টে যা থাকে।
সেই হইবেক মিলিবেক যে তে পাকে।।...
শ্রীবাস বলেন এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার।।
তবে সত্য কহোঁ ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিনু প্রভু সর্বথা গঙ্গায়।।' [৫৮]

৫৭. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/১৬

৫৮. চৈতন্যভাগবত, ৩/৫

শ্রীবাসের কেন এই বিপর্যয়? কেন তাঁকে নবদ্বীপ ত্যাগ করতে হয়েছিল? তবে কি অভর্তিকার গর্ভে বৃন্দাবনদাসের জন্মের পর নবদ্বীপ থেকে তাঁকে উৎখাত করা হয়েছিল? চরিতকারদের রচনায় এসব প্রশ্নের উত্তর অনুক্তই থেকে গেছে।

এবার শ্রীবাসের কাছে বিদায় নিয়ে তিনি গেলেন পানিহাটি, রাঘবের গৃহে। সেখানে গদাধরদাস, পুরন্দর পণ্ডিত ও পরমেশ্বরদাসের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটল। এরপর বরানগর হয়ে চৈতন্যদেব আবার নীলাচলে ফিরে গেলেন। সে বছর তাঁর বৃন্দাবন যাওয়ার ইচ্ছা থাকায় ভক্তগণকে নীলাচল যেতে নিষেধ করে গেলেন।

চৈতন্যদেব গৌড়ে এসেছিলেন প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত জননী ও জন্মভূমি দর্শনের আকর্ষণ তাঁর অন্তরে সুপ্ত ছিল। দ্বিতীয়ত রূপ-সনাতন বারবার পত্র পাঠাচ্ছিলেন তাঁদের অভিপ্রায় জানিয়ে। তাঁদের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিকে স্বমতে এনে বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক-ভিত্তি সুদৃঢ় করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। আর তা করেছিলেন বলেই রূপ-সনাতনকে উদ্ধারের জন্য তিনি রামকেলি পর্যন্ত গমন করেছিলেন। সব চরিতকারদের রচনায় রূপ-সনাতন মিলনের ঘটনাটি উহ্য থাকলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গুরুত্বের সঙ্গে এটিকে বর্ণনা করেছেন। মুরারিগুপ্তের কড়চার প্রক্ষিপ্ত অংশে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।[৫৭] এর থেকেই মনে হয় বিষয়টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কারণ রূপ ও সনাতনের সঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর সাক্ষাৎ ঘটেছিল বৃন্দাবনে। সুতরাং তিনি তাঁদের কাছ থেকে সঠিক ঘটনাটি জেনেছিলেন। তাই রামকেলিতে রূপ-সনাতনের মিলন কাহিনিটি সঠিক বলেই মনে হয়।

পাঁচ

বর্ষার আগেই চৈতন্যদেব নীলাচলে ফিরে এলেন। সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তরা এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। এবার তিনি বৃন্দাবন যাওয়ার অভিপ্রায় জানালেন। কিন্তু ভক্তদের অনুরোধে বর্ষার চার মাস তাঁকে অপেক্ষা করতে হল। শরৎকালে যাওয়ার সব আয়োজন পাকা হল। এবার চৈতন্যদেব কাউকে সঙ্গে নিতে রাজি হলেন না। ভক্তরা অনেক বোঝালেন, শেষমেশ ঠিক হল বলভদ্র ভট্টাচার্য তাঁর

৫৭. মুরারিগুপ্তের কড়চা, ৩/১৮/১-৬

সঙ্গে যাবেন। একদিন শেষরাত্রে কাউকে কিছু না জানিয়ে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রা শুরু করলেন। জনসমাগম এড়াতে তিনি উপপথ ধরে নির্জন বনবীথির মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলেন। কটককে বামভাগে রেখে তিনি ঝাড়খণ্ডের পথ ধরলেন। এ পথ অতি দুর্গম, বিপদসঙ্কুল। চৈতন্যদেব সব বাধাকে তুচ্ছ করে এগোতে লাগলেন। পথে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। সঙ্গী ব্রাহ্মণ বলভদ্র ভয়ে আঁতকে উঠলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব নির্বিকার। তিনি সংকীর্তন করতে-করতে নির্ভয়ে এগিয়ে চললেন। পথে যে সব গ্রাম পড়ল সেখানে তিনি কৃষ্ণনাম প্রচার করলেন। কোল-ভিল প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়কে প্রেমনাম দিয়ে উদ্ধার করলেন। এইভাবে বনপথে গাছপালা, পশুপক্ষী, লতাপাতার সুখস্পর্শে আনন্দিত চৈতন্যদেব পৌঁছলেন কাশীতে। সেখানে মণিকর্ণিকার ঘাটে সাক্ষাৎ ঘটল তপন মিশ্রের সঙ্গে। তিনি চৈতন্যদেবকে পেয়ে উল্লসিত হলেন এবং অতিথি রূপে নিজের বাড়িতে নিয়ে তুললেন। সেখানে মিশ্রের বন্ধু শূদ্র চন্দ্রশেখরকে কৃপা করলেন চৈতন্যদেব।

সেকালে বারাণসী ছিল মায়াবাদের পীঠস্থান। ষড়দর্শনের চর্চা হত, ভক্তিবাদ সম্পর্কে সকলেই ছিল উদাসীন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মতো মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা এখানে বেদান্ত পড়াতেন। এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করে ধন্য হলেন। তিনি মায়াবাদীদের কাছে বেদান্ত পড়তেন। চৈতন্যদেব এখানে দিন দশেক কাটিয়ে মথুরার দিকে চলে গেলেন। যেখানেই যান সেখানেই মানুষকে তিনি প্রেমনামে বিভোর করে তোলেন। প্রয়াগ পেরিয়ে অবশেষে তিনি পৌঁছলেন মথুরায়। সেখানে এক সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। তিনি ছিলেন ব্রাত্য শ্রেণিভুক্ত ব্রাহ্মণ, সেকালের সমাজ-শৃঙ্খলা অনুসারে সাধু-সন্ন্যাসীরা এঁদের হাতে অন্নগ্রহণ করতেন না। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন—

'যদ্যপি সনৌড়িয়া জাতি হয় সে ব্রাহ্মণ।
সনৌড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন।।
তথাপি পরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার।।' [৬০]

এই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়েই চৈতন্যদেব মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মথুরার ঘাটে-ঘাটে স্নান করলেন, বৃন্দাবনের বনে-বনে ঘুরে বেড়ালেন। অবশেষে পৌঁছলেন আরিট গ্রামে। সেখানে লুপ্ততীর্থ রাধাকুণ্ড

---

৬০. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/১৭

আবিষ্কার করলেন দক্ষ প্রত্নবিদের মতো। এরপর গাঠুলি গ্রামে উপস্থিত হয়ে এক বিপ্র-গৃহে মাধবেন্দ্র পুরীর প্রতিষ্ঠিত গোপাল মূর্তি দর্শন করলেন। তার আগে গোবর্ধন গ্রামে হরিদেব দর্শন করে প্রেমমত্ত হলেন। এই সময় ঘুরতে-ঘুরতে এক রাজপুত বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস এসে চৈতন্যচরণে ভক্তিমান হলেন। চৈতন্যদেবের গোষ্ঠী ক্রমশ বাড়তে লাগল।

এই সময় একদিন একটি ঘটনা ঘটল। মথুরায় গুজব ছড়াল যে রাত্রিতে যমুনার জলে কৃষ্ণকে দেখা যাচ্ছে, কালীয়দমন করতে। চৈতন্যদেবের ভ্রমণসঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য কৃষ্ণকে দর্শনের এমন সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না, তিনি প্রভুর অনুমতি চাইলেন। শুনে মহাপ্রভু খুব রেগে গেলেন, বললেন, 'মূর্খের বাক্যে মূর্খ হও পণ্ডিত হইয়া।' এর থেকে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, চৈতন্যদেব ছিলেন বাস্তববাদী, অলৌকিকত্বকে সহজে স্বীকার করতেন না। যে কোনও বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ না করে তিনি গ্রহণ করতে চাইতেন না। এক্ষেত্রেও চৈতন্যদেবের অনুমানই সঠিক হল। পরদিন সকালে জানা গেল যে, জেলেরা নৌকায় আলো জ্বেলে কালিদহের জলে মাছ ধরছিল, তার থেকেই এই গুজব।[৬১]

চৈতন্যদেব ছিলেন একজন মানুষ। এত গুণে গুণান্বিত মানুষ যে, লোকে তাঁকে ঈশ্বরত্বে বরণ করে নিয়েছিল। তবু তাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর বা তাঁর অবতার বললে তিনি খুশি হতেন না, বরং জোরদার প্রতিবাদ করতেন। এক্ষেত্রেও আমরা তাঁর বস্তুবাদী সত্তার প্রকাশ দেখতে পাই। বৃন্দাবন ভ্রমণকালে কিছু সজ্জন ব্যক্তি চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে, পূর্বরাত্রে গুজবের কথা উল্লেখ করে চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁরা কৃষ্ণ দর্শন করেছেন কিনা? উত্তরে তাঁরা প্রভুকেই কৃষ্ণের অবতার রূপে ঘোষণা করলেন। চৈতন্যদেব তা স্বীকার না করে বললেন—

'প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিও।
জীবাধমে বিষ্ণু-জ্ঞান কভু না করিও।।
সন্ন্যাসী চিৎকর্ণ জীব কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম।।
জীব আর ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।।' [৬২]

৬১. তদেব
৬২. তদেব

জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে যে ভেদ এখানে তা স্পষ্টীকৃত হয়েছে। ঈশ্বরকে তিনি দীপ্ত সূর্যের সঙ্গে অপরদিকে জীবকে সেই সূর্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিরণকণার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবুও চৈতন্যদেবকে আমরা দেবতার আসনে বসিয়ে ফুল-বেলপাতায় আচ্ছাদিত করে মন্দিরে স্থাপন করেছি। তাঁর সামাজিক অবদান যে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিল, মানুষ চৈতন্যদেব যে এই জন্যেই মহামানবের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন, সে কথা আমরা মনে রাখিনি।

তত্ত্ব আলোচনার স্থান নেই এখানে। আবার আমরা ফিরে যাই বৃন্দাবনে, যেখানে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা চৈতন্যদেব যমুনার নীল জলকে পরম আরাধ্য ভেবে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন। এদিকে তাঁর ভক্ত তিন ব্রাহ্মণ চিন্তামগ্ন, তাঁরা তিন জনে পরামর্শ করে চৈতন্যদেবকে প্রয়াগ নিয়ে যেতে চাইলেন। প্রয়াগের পথে এক ঘটনা ঘটল। গঙ্গাতীরের পথ ধরে তাঁরা যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বংশীর ধ্বনি শুনে প্রভুর ভাবাবেশ হল। তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হল একদল পাঠান সৈন্য। আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসীকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাদের ধারণা হল যে, সঙ্গীরা ধুতুরার বিচি খাইয়ে তাঁর সব ধনসম্পদ হরণ করে নিয়েছে। তারা ঘোড়া থেকে নেমে সঙ্গীসাথিদের বেঁধে ফেলল। এই দলের নেতা ছিলেন বিজুলি খান। ইতিমধ্যে চৈতন্যদেবের সংবিৎ ফিরে এলে প্রকৃত ঘটনা জানা গেল। তখন পাঠানেরা বন্দিদের ছেড়ে দিল। বিজুলি খানের দলে একজন পির ছিলেন, তিনি প্রভুর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা শুরু করলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে আলোচনায় তৃপ্ত হয়ে সেই পির তাঁর চরণে ভক্তিমান হলেন। চৈতন্যদেব তাঁকে কৃপা করলেন, নাম দিলেন 'রামদাস'। এসব দেখে দলনেতা বিজুলিখানও চৈতন্যদেবের কৃপাপ্রার্থী হলেন, চৈতন্যদেব তাঁকেও কৃপা করলেন। বিজুলিখান ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কালিঞ্জর দুর্গের অধীশ্বর বিহারখানের পালিত পুত্র।[৬৩]

দুই পাঠানকে স্বমতে আনয়ন করে স্বগণ সহ প্রয়াগে এসে পৌঁছলেন তিনি। এখানে রূপ আর তাঁর ভাই অনুপম বল্লভের সঙ্গে চৈতন্যদেবের মিলন ঘটল। এমন সময় বল্লভভট্ট এসে এঁদের নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পরিচয় ঘটল রঘুপতি উপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি প্রভুর ভাবাবেশ দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। প্রভুও তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব তৃপ্তি পেলেন। এখানে দু-তিন দিন কাটিয়ে চৈতন্যদেব আবার

৬৩. নানা চর্চা—প্রমথ চৌধুরি, পৃ. ১১১

প্রয়াগে ত্রিবেণি সঙ্গমের কাছে ফিরে এলেন। লোকের ভিড় এড়াতে দশাশ্বমেধ ঘাটে রূপ গোসাঞিকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন—

'কৃষ্ণভক্ত ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিক্ষা হল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত।।
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল।।' [৬৪]

প্রয়াগে দশ দিন কাটিয়ে তিনি বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গীসাথি সকলকেই এখান থেকে বিদায় দিলেন। রূপকে পাঠালেন বৃন্দাবনে। চন্দ্রশেখর বৈদ্য প্রভুকে সমাদর করে নিজগৃহে নিয়ে এলেন। খবর পেয়ে তপন মিশ্র হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। কুশলবার্তা বিনিময়ের পর তপন মিশ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন। এরপর যে ক'দিন চৈতন্যদেব কাশীতে ছিলেন, সে ক'দিন চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করলেন আর ভিক্ষাগ্রহণ করলেন তপন মিশ্রের গৃহে। এখানে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন সনাতন। তাঁর গায়ে দামি ভোটকম্বল দেখে চৈতন্যদেব বারবার তাকাতে লাগলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। প্রভুর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে সনাতন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে এক বৃদ্ধার কাঁথা নিয়ে ভোটকম্বলটি দিয়ে এলেন। এতে চৈতন্যদেব খুশি হলেন। তিনি দু-মাস বারাণসীতে থেকে সনাতনকে শাস্ত্রশিক্ষা দিলেন। অবশেষে বললেন—

'তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরা লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার।।' [৬৫]

প্রকৃত অর্থে চৈতন্যদেব ছিলেন একজন পুরাতাত্ত্বিক। তাই লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের নির্দেশ দিতে তিনি ভোলেননি। এদিকে বারাণসীতে যে ক'দিন ছিলেন সে ক'দিন কীর্তনানন্দে মাতিয়ে রাখলেন। পরমানন্দ ছিলেন দক্ষ কীর্তনীয়া, তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে আসর জমাতে লাগলেন। সঙ্গে তপন, চন্দ্রশেখর, সনাতন তো ছিলেনই। একদিন সকলে মিলে নামসংকীর্তন করতে-করতে মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের ডেরায় গিয়ে উঠলেন। দুজনেই দুজনের চরণ-বন্দনা করলেন। প্রকাশানন্দ প্রভুকে পরমব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করায় চৈতন্যদেব তার প্রতিবাদ জানালেন, বললেন, জীব আর ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ সীমাহীন। তাই ক্ষুদ্র জীবের সঙ্গে গুণাতীত ব্রহ্মের তুলনা অনুচিত। এইভাবে শুরু হল আলোচনা।

৬৪. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/১৯
৬৫. তদেব, ২/২৩

চৈতন্যদেব মায়াবাদকে নস্যাৎ করে কাশীতে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রকাশানন্দের মতো কট্টর মায়াবাদীকে স্বমতে আনয়ন করলেন।

চৈতন্যদেবের সঙ্গে সুবুদ্ধি রায়ের সাক্ষাৎ হল এই বারাণসীতে। একদা সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের আঞ্চলিক প্রশাসক। সেই সময় হোসেন খাঁ তাঁর অধীনে চাকরি করতেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁকে একটি দিঘি খোঁড়ার কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কাজে হোসেন খাঁর গাফিলতি থাকায় সুবুদ্ধি রায় তাঁকে চাবুক মেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও হোসেন খাঁ সুবুদ্ধি রায়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ভাগ্যের পরিবর্তনে হোসেন খাঁ একদিন বাংলার সুলতান হলেন। আর সুবুদ্ধি রায়কে মন্ত্রী পদে বহাল করলেন। এদিকে সুলতানের পিঠে চাবুকের দাগ দেখে বেগম পীড়াপীড়ি করে প্রকৃত ঘটনাটি জেনে নিলেন এবং প্রতিশোধ নিতে বাধ্য করলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুলতান হোসেন খাঁ মুখে করোয়ার পানি ছিটিয়ে দিয়ে তাঁর জাতি নষ্ট করলেন। সুবুদ্ধি রায় কাশীর পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইলে তাঁরা তপ্ত ঘৃত পানে প্রাণত্যাগ করতে পরামর্শ দিলেন। চৈতন্যদেব বারাণসীতে এলে সুবুদ্ধি রায় তাঁর কাছে বিধান চাইলে, তিনি কাশীর পণ্ডিতদের বিধান লঙঘন করে শুধুমাত্র নামসংকীর্তন করতে পরামর্শ দিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় চৈতন্যদেবের দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, মুক্ত, উদার ও মানবিক।

সনাতনকে বৃন্দাবনে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে চৈতন্যদেব আগের পথ ধরে আবার নীলাচলে ফিরে এলেন। অবশ্য চরিতকারদের মধ্যে মুরারিগুপ্তের বর্ণনায় জানা যায় যে, বৃন্দাবন ভ্রমণের পর চৈতন্যদেব দ্বিতীয়বার নবদ্বীপে এসেছিলেন।[৬৬] জয়ানন্দের বিবরণেও এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে।[৬৭] লোচনের রচনায় একবারই চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনের উল্লেখ আছে, তবে তা মথুরা-বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাগমনের কালে।[৬৮] লোচন জানিয়েছেন প্রভু নবদ্বীপে বারকোণা ঘাটের নিকটে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।[৬৯] বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের উল্লেখ নেই। বলরামদাসের একটি পদে পাওয়া যায়, কুলিয়ায় অবস্থান কালে ঘোমটায় মুখ ঢেকে বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যদেবকে দর্শন করেছিলেন।[৭০]

৬৬. মুরারিগুপ্তের কড়চা, ৪/১৪/৪

৬৭. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ-উত্তর খণ্ড

৬৮. চৈতন্যমঙ্গল—লোচন-শেষ খণ্ড

৬৯. তদেব

৭০. 'চল চল মাগো। আমায় নিয়ে চল.
লুকাইয়া চল ঝাঁপিয়া অঞ্চল,
ঐ যে দেখা যায় দীঘল অঙ্গ,
ঐ তো আমার প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ।'—বিষ্ণুপ্রিয়া জীবন ও সাধনা—মালা মৈত্র, পৃ. ৮২

চৈতন্যদেব ছিলেন নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী। লোকে যাতে উপহাস না করে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। সন্ন্যাসজীবনের যাবতীয় কর্তব্য তিনি কঠোরভাবে পালন করতেন। তাই তিনি যে দুবার জন্মভূমিতে এসেছিলেন, তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কেউ-কেউ বলেছেন যে, তিনি নিজ বাসস্থানে এসে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে মূর্তি পূজার অনুমতি দিয়েছিলেন। স্ত্রীর মুখদর্শন সন্ন্যাসীর কাছে মৃত্যুতুল্য, সুতরাং চৈতন্যদেব এ কাজ করেছিলেন বলে মনে হয় না। মুরারিগুপ্তের কড়চায় চতুর্থ প্রক্রমটি প্রক্ষিপ্ত বলে ইতিহাসবেত্তাদের ধারণা।[৭১]

ছয়

চৈতন্যদেবের নীলাচল প্রত্যাগমনের খবর রটে যেতেই ভক্তরা এসে মিলিত হতে লাগলেন। স্বরূপ দামোদর গৌড়ে এ সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন। গৌড়ীয় ভক্তরা যুক্তি করে নীলাচলের পথ ধরলেন। পূর্বের মতোই তাঁরা পুরীতে রথযাত্রা দেখলেন, চৈতন্যদেবের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করলেন, কীর্তনানন্দে পুরী প্লাবিত করলেন। এইভাবে চারমাস অতিবাহিত করে ফিরে এলেন বাংলায়। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের আগে পর্যন্ত প্রতি বছর তাঁরা নীলাচলে এসে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে লাগলেন।

'ছয় বৎসর করিল যৈছে গমনাগমন।।
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্ত্তন-বিলাস।।' [৭২]

শেষ আঠারো বছর একটানা নীলাচলেই ছিলেন চৈতন্যদেব। প্রায় প্রতিদিনই ভক্তরা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন, উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়াতেন। একদিন ভগবান আচার্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথাসময়ে আচার্য-গৃহে উপস্থিত হয়ে চৈতন্যদেব দেখলেন অতি উত্তম তণ্ডুলে অন্ন প্রস্তুত হয়েছে। ভগবান আচার্য ছিলেন খঞ্জ, হালিশহরনিবাসী শতানন্দ খানের পুত্র। তাঁর পক্ষে উৎকৃষ্ট চাউল সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। তাই চৈতন্যদেব জানতে চাইলেন, এ চাউল কীভাবে

৭১. চৈতন্য পরিকর—রবীন্দ্রনাথ মাইতি, পৃ. ১৬৯
৭২. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/২৫

সংগৃহীত হল। ভগবানদাস জানালেন যে, শিখি মাহিতীর ভগ্নী মাধুবীদেবীর কাছ থেকে ছোট হরিদাস এই চাল সংগ্রহ করে এনেছে। চৈতন্যদেব ভিক্ষা গ্রহণ করে বাসায় ফিরে এসে সেবক গোবিন্দকে নির্দেশ দিলেন যে, ছোট হরিদাস যেন এখানে প্রবেশ করতে না পারে, তিনি তাঁর মুখ দর্শন করবেন না। হরিদাস প্রকৃত কারণ বুঝতে না পেরে স্বরূপ দামোদরকে গিয়ে ধরলেন। তিনি প্রভুর কাছে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলে চৈতন্যদেব বললেন—

'প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।।' [৭৩]

হরিদাস মনের দুঃখে আহার-নিদ্রা বন্ধ করে দিলেন। গৌড়ীয় ভক্তরা চৈতন্যদেবকে অনেক অনুরোধ জানালেন, কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। অবশেষে সকলে যুক্তি করে পরমানন্দ পুরীকে চৈতন্যদেবের কাছে পাঠালেন। পুরীর মুখেও হরিদাসের প্রতি সদয় হওয়ার অনুরোধ শুনে চৈতন্যদেব বিরক্ত হলেন এবং পুরী ত্যাগ করে আলালনাথে চলে যাবেন বলে জানালেন। ভক্তরা ভয় পেয়ে সবাই চুপ করে গেলেন।

হরিদাসের প্রসঙ্গটি যখন সবাই ভুলতে বসেছে, তখন একদিন খবর পাওয়া গেল যে, প্রয়াগে ত্রিবেণি সঙ্গমে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ছোট হরিদাস আত্মহত্যা করেছেন। চৈতন্যদেবকে এই ঘটনাটি জানানো হলে তিনি বললেন, 'স্বকর্ম্মফলভাক্ পুমান্' অর্থাৎ মানুষকে নিজের কর্মফল ভোগ করতে হবে।[৭৪]

এই ঘটনাটি চৈতন্য-চরিত্রের কঠোরতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পর ভক্তদের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাঁরা যাতে বিপথগামী না হন, ভ্রষ্টাচারী না হন—সেদিকে চৈতন্যদেবের দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত। রবীন্দ্রনাথ মাইতী লিখেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে, মহাপ্রভুচৈতন্য-বিহিত ঘটনাটি হয়তো বিপুল 'মর্যাদা'-বহনে ও লোকশিক্ষায় পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ইহা যে নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্কের অঙ্ক হইতে চিরন্তন কলঙ্কের মতো উঁকি দিতেছে না, তাহাও কি নিঃসন্দেহে বলা যায়।'[৭৫]

রবীন্দ্রনাথবাবুর অনুমান যে অমূলক নয়, প্রত্যক্ষদর্শী ওড়িয়া ভক্ত মাধব পট্টনায়ক রচিত 'বৈষ্ণব লীলামৃত' গ্রন্থে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মাধব

৭৩. তদেব, ৩/২

৭৪. তদেব

৭৫. চৈতন্য-পরিকর, পৃ. ২৩৭

নিজেকে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য রূপে বর্ণনা করেছেন। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'বৈষ্ণব লীলামৃত' গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা ও বঙ্গানুবাদ করেছেন ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। এখানে তাঁর অনুবাদ থেকেই প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হল—'শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে আগত বঙ্গীয় ভক্তেরা সকলেই কিন্তু মহাপুরুষ ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে ছোট হরিদাস (যিনি কীর্তন গায়ক হিসেবেই শ্রীচৈতন্যের প্রীতিধন্য হয়েছিলেন) মাধবীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর বাসভবনে যাতায়াত শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে রন্ধনের জন্য চাল, নুন এসবের অভাব আছে—এই অছিলায় তিনি এগুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাধবীর গৃহে যেতেন। এতে মাধবীর অর্থাৎ শিখি মাহিতীর প্রতিবেশীরাও নিন্দাবাদ শুরু করেন। শিখি এবং মুরারি এই দুই ভাই ছোট হরিদাসকে তাঁদের বাড়ি যেতে মানা করেছিলেন, কিন্তু হরিদাস তাতে কর্ণপাত করেননি। এক রাত্রে আপন গৃহে হরিদাসকে দেখে শিখি তাঁকে প্রহার করেন। হরিদাস বিষয়টি গৌড়ীয় সঙ্গীদের এবং সেই সঙ্গীরা শ্রীচৈতন্যকে জানালেন। সব শুনে শ্রীচৈতন্য ঘোষণা করলেন যে, তিনি আর ছোট হরিদাসের মুখদর্শনও করবেন না। নিন্দা এবং অপমানে দগ্ধ হয়ে ছোট হরিদাস শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন এবং গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন করলেন।'[৭৬]

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ছোট হরিদাস নিষ্কলঙ্ক ছিলেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে চৈতন্যদেব যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল সঠিক এবং অভ্রান্ত। এই ঘটনার পর ভক্তরা আরও সতর্ক হলেন—

'দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে।।'[৭৭]

সাত

চৈতন্যদেবের অন্তরের অন্তস্তলে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল বাৎসল্য স্নেহের একটি প্রস্রবণ। সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও তিনি যেমন জননী ও জন্মভূমিকে ভুলতে পারেননি, তেমনি ভুলতে পারেননি অগণিত ভক্তবৃন্দকে। নীলাচলে এক পিতৃহীন ব্রাহ্মণ কুমারকে তিনি ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন। কুমারের মাতা ছিলেন

৭৬. শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব—বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, পৃ. ৫০
৭৭. চৈতন্যচরিতামৃত, ৩/২

সুন্দরী যুবতী। তাই চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর এই মেলামেশা মোটেই পছন্দ করতেন না। একদিন তিনি চৈতন্যদেবকে সাবধান করে দিয়ে বললেন—

'পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর।।
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী।।
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কানাকানি বাতে দেহ অবসর।।' [৭৮]

স্বরূপ দামোদর সতর্ক করায় চৈতন্যদেব খুশি হলেন। প্রকৃত অর্থে, ধর্মের স্বচ্ছতা বজায় রাখার প্রয়োজনে মানবিক স্নেহ-ভালোবাসাকেও তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন। এর থেকেই মনে হয়, স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিও তাঁর প্রীতি ছিল সীমাহীন, কিন্তু লোকশিক্ষার প্রয়োজনে তিনি স্ত্রীর নাম পর্যন্ত মুখে আনেননি। বলরাম দাসের একটি পদ থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেব প্রতি বছর মাতা শচীদেবী ও স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্যে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ও শাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। নন্দোৎসবের দিন চৈতন্যদেব এই বস্ত্র রাজার কাছ থেকে উপহার পেতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া কিন্তু প্রভুর প্রেরিত শাড়ি গ্রহণ করেননি।[৭৯]

এদিকে সনাতন বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে এসে উপস্থিত হলেন। বনপথে আসতে গিয়ে তাঁকে নানাপ্রকার বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছিল। ফলে তাঁর শরীরে খোস-পাঁচড়া জাতীয় বিস্ফোটক দেখা দিল। সনাতন মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, আজীবন ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শে ব্রাত্য দূষিত এ জীবন তিনি আর রাখবেন না। পুরীতে চৈতন্যচরণ দর্শন করে জগন্নাথের রথের চাকায় তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন। কিন্তু চৈতন্যদেব জানতে পেরে তাঁকে নিরস্ত করেন এবং বলেন—

'কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন।।
নীচজাতি নহে ভজনে অযোগ্য।
সৎকুলজ বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।

৭৮. তদেব, ৩/৩

৭৯. বিষ্ণুপ্রিয়া জীবন ও সাধনা, পৃ. ৭৭-৭৮

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।।' [৮০]

সনাতন কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। চৈতন্যদেব তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। দূষিত-ক্ষতের রস তাঁর গায়ে লাগল। সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দোলযাত্রা পর্যন্ত নীলাচলে কাটিয়ে সনাতন ফিরে গেলেন বৃন্দাবনে।

ওদিকে সপ্তগ্রামের জমিদার-পুত্র রঘুনাথদাস চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে উৎকণ্ঠিত। চৈতন্যদেব নীলাচল ফিরে এসেছেন শুনে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। একদিন সকলের অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে নীলাচলের পথ ধরলেন। পিতার রক্ষকগণ তাঁকে ধরে ফেলতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি ব্যবহৃত পথ ত্যাগ করে বনপথ দিয়ে লুকিয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে পুরীতে পৌঁছলেন মাত্র বারো দিনে, এর মধ্যে মাত্র তিন দিন পথে আহার জুটেছিল তাঁর। চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে প্রণাম জানাতেই তিনি রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর শরীরের অবস্থা দেখেই প্রভু বুঝলেন যে, আসার পথে রঘুনাথ নিয়ম লঙঘন করে শরীরকে কষ্ট দিয়েছে। গোবিন্দকে বলে তিনি তাঁর সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলেন। স্বরূপকে বললেন—

'রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হঞা।।
এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে।।' [৮১]

স্বরূপ দামোদরের তত্ত্বাবধানে রঘুনাথের শিক্ষা চলতে লাগল। চৈতন্যদেব আদেশ দিলেন রঘুনাথকে সাধ্যসাধনতত্ত্বে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে। রঘুনাথ যোগ্য পাত্র, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু তবুও তাঁর মনে প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গেল। তিনি ভাবলেন বিষয়-সম্পত্তি, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে তিনি যে নীলাচলে এলেন, এখন তাঁর কর্তব্যকর্ম কী? চৈতন্যদেবের সামনে এ প্রশ্ন উঠতেই তিনি বললেন, স্বরূপ তোমার উপদেষ্টা, সে তোমাকে সব শিক্ষা দেবে, 'আমি যত নাহি জানি ইহ তত জানে।' এরপর তিনি রঘুনাথকে নিজেই শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, বললেন—

৮০. চৈতন্যচরিতামৃত, ৩/৪

৮১. তদেব, ৩/৬

'গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।।' [৮২]

রঘুনাথ ছিলেন ধনীর সন্তান। কিন্তু নীলাচলে তিনি কৃচ্ছ্রসাধন করেই জীবনধারণ করতে লাগলেন। কেউ দিলে তবেই তিনি আহার গ্রহণ করেন, অন্যথায় চলত উপবাস। কোনও কোনও দিন সিংহদ্বারে অন্ন ভিক্ষা করে উদরপূর্তি করতে লাগলেন। কিছুদিন অতিক্রান্তের পর সিংহদ্বার ছেড়ে রঘুনাথ ছত্রে গিয়ে চেয়ে খেতে লাগলেন। এতে চৈতন্যদেব খুশি হলেন। তিনি রঘুনাথ দাসকে স্বপূজিত গোবর্ধন শিলা এবং স্বকণ্ঠের গুঞ্জামালা উপহার দিলেন। রঘুনাথ দাস ছিলেন শূদ্র, জাতিতে বৈদ্য। সে যুগে শূদ্রের গোবর্ধন শিলা পুজো করার অধিকার ছিল না। চৈতন্যদেব স্মৃতি-বিধানকে অস্বীকার করে শূদ্রকে মান্যতা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রঘুনাথ ষড়গোস্বামীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন, 'বঙ্গীয় 'শূদ্র'-দের সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস যদি কখনও লেখা হয়, তবে তাতে রঘুনাথদাস গোস্বামীর নাম সর্বাগ্রে থাকবে। তিনি লিখেছিলেন 'স্তবাবলী', 'মুক্তাচরিত্রম্' এবং 'দানকেলি চিন্তামণি'। সংস্কৃত কবিতা রচনায় তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা ছিল।'[৮৩]

দেখতে-দেখতে আবার এসে গেল জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। গৌড় থেকে ভক্তরা এলেন। বল্লভভট্টও এলেন চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। এঁর জন্ম ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে, তামিলনাড়ুর কণকরব গ্রামে। ইনি বেশিরভাগ সময় মথুরা-বৃন্দাবনে বাস করতেন। ইনি বল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল। তিনি ভাগবতের টীকা রচনা করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল ভাগবতের ব্যাখ্যা তিনি যেভাবে করেন তা সর্বোৎকৃষ্ট। চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে বল্লভভট্ট তাঁর গুণকীর্তন করলেন, স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করলেন। মুখে বিনয় বাক্য বললেও তাঁর অন্তরে যে অহংবোধ রয়েছে তা জেনে চৈতন্যদেব বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে, তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তির কিছুই তাঁর জানা নেই। হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির যেটুকু উদ্ভাস দেখা দিয়েছে তা বিশিষ্ট ভক্তদের সঙ্গ লাভের ফলেই ঘটেছে। বল্লভ বিশিষ্ট ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

৮২. তদেব

৮৩. বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম—রমাকান্ত চক্রবর্তী, পৃ. ৫৩

রথযাত্রার পর্ব কেটে যেতে একদিন বল্লভভট্ট ভাগবতের টীকার কথা তুললেন, বললেন যে, তিনি শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছেন। এ কথা শুনে চৈতন্যদেব বললেন—

'স্বামী না মানে যেইজন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন।।' [৮৪]

বল্লভভট্ট দুঃখিত মনে বাসায় ফিরে গেলেন। এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের গর্ব বিসর্জন দিয়ে পরদিন এসে চৈতন্যদেবের চরণে ভক্তিমান হলেন। পরে গদাধর পণ্ডিতের কাছে বল্লভভট্ট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।[৮৫] সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে বল্লভভট্টের বল্লভী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় চৈতন্য-প্রভাবিত।[৮৬]

বৈষ্ণব-সাহিত্যে ব্যঞ্জনাদির তালিকা দেখে সহজেই অনুমিত হয় যে, চৈতন্যদেব ভোজনরসিক ছিলেন। এ জন্যে তাঁকে কথাও কম শুনতে হয়নি। একবার নীলাচলে বাসুদেব সার্বভৌমের ঘরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সেদিন শাঠির মাতা কী-কী আয়োজন করেছিলেন আসুন আমরা তা কৃষ্ণদাস কবিরাজের মুখ থেকেই শুনি—

'দশ প্রকাশ শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝালা ছানা-বড়া বড়ী ঘোল।।
দুগ্ধতুম্বী দুগ্ধকুষ্মাণ্ড বেসারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ সাকরা।।
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার।।
নব নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।।
ভ্রষ্ট মাষ মুদ্গ-সূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়া অম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।।
মুদগবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট।।

৮৪. চৈতন্যচরিতামৃত, ৩/৭

৮৫. তদেব

৮৬. Complete Works of Swami Vivekananda—Centenary Volume IV, P-337

কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিঁড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি।।
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাহা ধরি।।
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার।।' [৮৭]

এত সব আয়োজন দেখে চৈতন্যদেব বিস্মিত হলেন। আলাদা পাত্রে কিছু প্রসাদ তুলে দিতে ভট্টাচার্যকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ভট্টাচার্য নাছোড়বান্দা। নিরুপায় হয়ে চৈতন্যদেব আহারে বসলেন। এমন সময় ভট্টাচার্যের জামাতা নিন্দুক অমোঘ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন—

'এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন।।' [৮৮]

ভট্টাচার্য ক্ষিপ্ত হয়ে অমোঘকে তাড়া করলেন। অমোঘ পালিয়ে গেল। চৈতন্যদেব অবশ্য অমোঘের নিন্দাবাদ হেসেই উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র পুরীকে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। রামচন্দ্রপুরী ছিলেন নিন্দুক প্রকৃতির। তিনি পুরীতে এসে চৈতন্যদেবের ছিদ্র খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। সমালোচনা করার মতো তেমন কোনও ত্রুটি খুঁজে না পেয়ে কল্পিত অভিযোগ আরোপ করলেন। একদিন সকালে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে রামচন্দ্রপুরী দেখলেন যে, ঘরের মধ্যে ইতস্তত পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইভাবে সব ঘরেই পিঁপড়ে ঘুরে বেড়ায়, এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী এই সূত্র থেকেই ত্রুটির কল্পনা করে নিলেন। তিনি আরোপ করলেন যে, গতরাত্রে এখানে মিষ্টান্ন ছিল বলেই পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

'সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভোক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়বারণ।।' [৮৯]

রামচন্দ্রপুরী চৈতন্যদেবের নিন্দা করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু প্রতিদিনই তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। চৈতন্যদেব সব জেনেশুনেও

---

৮৭. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/১৫

৮৮. তদেব

৮৯. তদেব, ৩/৮

তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর করেন। তা করলেও চৈতন্যদেব আরও সতর্ক হতে শুরু করলেন। সেবক গোবিন্দকে নির্দেশ দিলেন—

'আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত' নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন।।' [৯০]

তার মানে চৈতন্যদেব শুধুমাত্র প্রাণ ধারণের জন্য যৎসামান্য আহার গ্রহণ করবেন। এর ফলে প্রভুর শরীর ক্রমশ ক্ষীণ হতে লাগল। তাতেও রামচন্দ্রপুরীর হাত থেকে নিস্তার নেই। একদিন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতগীতার (৬/১৬) শ্লোক উচ্চারণ করে চৈতন্যদেবকে উপদেশ দিলেন যে, অতিভোজী, একান্ত অনাহারী, অতি নিদ্রাতুর এবং অধিক জাগরণশীলের যোগসাধনা হয় না।

চৈতন্যদেব রামচন্দ্রপুরীকে শ্রদ্ধা করতেন, তাই তাঁর কোনও কথারই প্রতিবাদ করেননি। এদিকে প্রভুর শরীর কৃশ হতে দেখে ভক্তরা এসে অনুনয়-বিনয় জানাতে লাগলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে রাজি হলেন না। ভক্তরাও নাছোড়বান্দা, তাঁদের সকলের অনুরোধে ঠিক হল চৈতন্যদেব অর্ধেক আহার গ্রহণ করবেন।

আট

ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্র রায় চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। তবু চৈতন্যদেব কখনও রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করেননি। একবার প্রভুর কাছে সংবাদ এল যে, রায় রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথকে চাঙে চড়ানো হয়েছে। প্রভু কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, দুই লক্ষ কাহন কড়ি রাজকোশে জমা না পড়ায় রুষ্ট রাজা গোপীনাথকে চাঙে চড়ানোর আদেশ দেন। চৈতন্যদেব সব শুনে বললেন যে, রাজার প্রাপ্য অর্থ না দিলে তাকে তো উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে। এমন সময় আরও কিছু লোক এসে জানাল যে, বাণীনাথকেও সবংশে বেঁধে নিয়ে গেল। ভক্তরা চৈতন্যদেবের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল যে, তিনি যেন রাজাকে বলে এদের প্রাণদণ্ডের আদেশ রদ করেন। প্রভু ভক্তদের নিবেদন শুনে ক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন যে, তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, বিষয়ীর কথা তিনি শুনতে চান না। তাকে যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে জগন্নাথের কাছে গিয়ে সকলে প্রার্থনা কর।

---

৯০. তদেব

গোপীনাথ এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেন ঠিকই, কিন্তু মহাপ্রভু অখুশি হয়ে কাশীমিশ্রকে জানালেন—

'ইহাঁ রহিতে নারি আমি যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রবে ইহাঁ না পাই সোয়াথ।।
ভবানন্দরায়ের গোষ্ঠী করে রাজ বিষয়।
নানা প্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয়।।
রাজার কি দোষ রাজা নিজ দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য দণ্ড আমারে জানায়।।
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি আমারে জানাইল।।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জনে ত বসি।
আমাকে দুঃখ দেন নিজ দুঃখ কহি আসি।।
আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে, যদি না দিবে রাজধন।।
বিষয়ীর বার্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাহে ইহাঁ রহি আমার নাহি প্রয়োজন।।' [৯১]

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব এতটাই অনাসক্ত ছিলেন যে, বিষয়ীর বিষয়চর্চাকে তিনি বিষবৎ এড়িয়ে চলতেন। কৃষ্ণপ্রেমে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে, তাঁর বিরহে চৈতন্যদেব সর্বদা উন্মাদ হয়ে থাকতেন। রাজা তাঁর অনুগত জেনেও রাজকার্যে কখনও হস্তক্ষেপ করেননি। তবুও কোনও কোনও গবেষক শুধুমাত্র বিতর্কের সৃষ্টি করে নিজেকে জাহির করবার জন্যই ওড়িশা রাজ্যের পতনের জন্য চৈতন্যদেবকেই দায়ী করেছেন।[৯২] আমার মনে হয় এঁরা চৈতন্য-চরিত্র সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি, তা যদি পারতেন তা হলে এত বড় একটি ঘটনার দায় তাঁর উপর আরোপ করতেন না। ওড়িশার পতনের অন্যতম কারণ হচ্ছে, রাজকর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নৈতিক চরিত্রের অবনমন। ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭-১৫৪০ খ্রি.) বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলেও রাজকার্যে কখনও অবহেলা দেখাননি। চৈতন্যদেবের সঙ্গে রাজার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল ১৫১২-১৩ খ্রিস্টাব্দে। এরপর প্রায় চার-পাঁচ বছর প্রতাপরুদ্রদেব বিজয়নগরের রাজা

৯১. তদেব, ৩/৯

৯২. History of Orissa—Rakhaldas Bandopadhaya, PP-329-331

কৃষ্ণদেব রায়ের (১৫০৯-১৫২৯ খ্রি.) সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই যুদ্ধে প্রতাপরুদ্রদেব জয়লাভ করতে পারেননি। উদয়গিরি ও কোণ্ডবীড়ুর পতন ঘটে। অপমানজনক শর্তে কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়। তবে এই পরাজয়ের জন্য চৈতন্যদেবকে কোনওভাবেই অভিযুক্ত করা যায় না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কাঞ্চী থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে ওড়িশীরা বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। এর পরিণতি সহজেই অনুমেয়।...উড়িষ্যাবাসীদের সামরিক বলবীর্যের এই শোচনীয় পতনের জন্য চৈতন্য আন্দোলনকে দায়ী করা চলে না।'[৯২ক]

প্রতাপরুদ্রদেব ছিলেন মহাপরাক্রমশালী, সাহসী যোদ্ধা। এ কথা খুব জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, তিন দিক থেকে আক্রান্ত হয়েও তিনি ওড়িশার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দ বিদ্যাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুভঞ্জের বিশ্বাসঘাতকতায় উৎকলে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার দায়ও যাঁরা চৈতন্যদেবের উপর চাপিয়ে বাহবা কুড়োতে চেয়েছেন, তাঁরা মূলত চৈতন্য-বিদ্বেষী। আচ্ছা বলুন তো, ওড়িশার সংলগ্ন হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরে তো চৈতন্যদেব ছিলেন না, তা হলে এই রাজ্যটির পতনের জন্য তথাকথিত ইতিহাসবেত্তারা কাকে দায়ী করবেন। ইতিহাসের সীমানা থেকে কল্পনাকে বহিষ্কার করতে বলছি না, তবে মনে রাখতে হবে যে, তা যেন বাস্তবতার সীমা অতিক্রম না করে।

নীলাচলে বসবাসকারী গৌড়ীয় ভক্তদের মধ্যে যবন হরিদাস ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। তিন লক্ষ বার নাম জপ করে তবেই তিনি প্রসাদ গ্রহণ করতেন। ক্রমশ তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। চৈতন্যদেব ভক্তগণ-সঙ্গে হরিদাসকে দেখতে এসে বুঝলেন তাঁর অন্তিমকাল সমাসন্ন। প্রভুর নির্দেশে ভক্তরা কীর্তন জুড়ে দিলেন। হরিদাস প্রভুর চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করলেন, প্রভুকে সামনে বসিয়ে নয়ন ভরে দর্শন করতে লাগলেন, আর মুখে 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নাম উচ্চারণ করতে-করতে সাধনোচিত ধামে গমন করলেন। চৈতন্যদেব হরিদাসের শরীর কোলে নিয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। সঙ্গের ভক্তগণও প্রভুর সঙ্গে নাচতে লাগলেন। অবশেষে হরিদাসের দেহ একটি শকটে চাপিয়ে সমুদ্রের তীরে আনা হল। সেখানে শবদেহ স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিয়ে মালা, চন্দন, তিলক দিয়ে তাঁকে সমাধিস্থ করা হল। সবার আগে মাটি দিলেন চৈতন্যদেব, তারপর অন্য সকলে। নাম সংকীর্তন চলতে লাগল। এরপর সকলে মিলে সমুদ্রস্নান করে

৯২ক. উড়িষ্যার পতনে চৈতন্য আন্দোলনের দায়িত্ব—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

হরিদাসের সমাধি প্রদক্ষিণ করে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে ফিরে এসে আঁচল পেতে পসারিদের কাছে ভিক্ষা চাইলেন। মন্দির থেকেও প্রচুর প্রসাদ এল। চৈতন্যদেব সকলকে নিয়ে হরিদাসের বিজয়োৎসব পালন করলেন। সুকুমার সেনের মতে, এরপর থেকেই বাঙালি সমাজে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভোজ-কাজের প্রচলন ঘটে।[৯৩]

হরিদাসের মহাপ্রয়াণের ঘটনাটি ছিল চৈতন্যদেবের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর এই মানবিক বোধ আমাদের চেতনায় আজও আঘাত করে। পাঁচশো বছর আগে অতি সহজেই তিনি যা পেরেছিলেন, আজ বহু ঢাকঢোল পিটিয়েও আমরা তা পারি না। এর থেকেই বোঝা যায় আমরা প্রকৃত অর্থে চৈতন্যদেবের উত্তরাধিকার অর্জন করতে পারিনি। সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, 'চৈতন্য ধর্মের আর এক মর্মকথা যবন হরিদাস বিজয়োৎসবে ব্যক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার সাফল্যের মূলে জাতিভেদ-বিরোধী উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার কথা চৈতন্যদেব যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি ব্যক্তিগতভাবে হরিদাসের প্রতি তাঁর আত্যন্তিক শ্রদ্ধা প্রীতি চৈতন্যলীলায় তাঁর প্রকৃত স্থান নির্ণয়ে কবিরাজ গোস্বামীকে সাহায্য করেছে। হরিদাস নির্বাণের ঘটনা চৈতন্য-চরিত্রেরও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।'[৯৪]

চৈতন্যদেবের আর এক প্রিয় সহচর ছিলেন জগদানন্দ পণ্ডিত। ইনি ছিলেন অভিমানী, তাই চৈতন্যদেব এঁকে একটু সমীহ করে চলতেন। জগদানন্দের বাড়ি ছিল নবদ্বীপে, প্রভুর বাড়ির সন্নিকটে। তিনি চৈতন্যদেবকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। প্রভুর কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারতেন না। জগদানন্দকে মাঝে মাঝেই নবদ্বীপ পাঠাতেন চৈতন্যদেব। তাঁর হাতে শচীদেবীর জন্য পাঠাতেন জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আর শাড়ি। জগদানন্দ জননী আর জাহ্নবীর খবর নিয়ে আবার নীলাচলে ফিরে আসতেন। একবার প্রভুর বায়ু-পিত্ত নিবারণের জন্য জগদানন্দ বঙ্গদেশ থেকে এক কলশি সুগন্ধী তৈল এনে গোবিন্দের হাতে দিলেন। গোবিন্দ যথাসময়ে চৈতন্যদেবকে এ কথা জানাতেই তিনি চটে গেলেন—

'প্রভু কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈল অধিকার।
তাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার।।

৯৩. চৈতন্যাবদান, পৃ. ৮৬

৯৪. শ্রীচৈতন্যচরিত ও বাণী—সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ২৫৮

জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে।
তাঁর পরিশ্রম হবে পরম সফলে।।' [৯৫]

জগদানন্দ এ কথা শুনে হতাশ হলেন ঠিকই, কিন্তু আশা ছাড়লেন না। গোবিন্দের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের কাছে আবার অনুরোধ জানালেন। এবারে চৈতন্যদেব ক্রোধান্বিত হয়ে উত্তর দিলেন—

'মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন।।
এই সুখ লাগি আমি করিল সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশে তোমা সবার পরিহাস।।
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাইবে।
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে।।' [৯৬]

জগদানন্দ এ কথা শুনে দুঃখ পেলেন। ঘর থেকে তেলের কলশি বাইরে এনে উঠানে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেললেন। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। জগদানন্দ দু'দিন অনশনে আছেন, এ খবর পেয়ে চৈতন্যদেব নিজেই তাঁর গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলেন। এরপর জগদানন্দ আর রাগ করে থাকতে পারলেন না। তিনি স্নান সেরে রান্না চাপালেন। দুপুরে চৈতন্যদেব জগদানন্দের গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে একত্রে ভোজন করতে চাইলেন। জগদানন্দ প্রভুকে আশ্বস্ত করলেন যে, তিনি অবশ্যই প্রসাদ গ্রহণ করবেন তবে প্রভুর ভোজন সমাপ্ত হওয়ার পরে। চৈতন্যদেবের আহার সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি নিজের সামনে বসিয়ে জগদানন্দকে খাওয়াতে চাইলেন কিন্তু তাতেও তিনি রাজি হলেন না। তিনি জানালেন যে, রান্নার কাজে যারা সাহায্য করেছে তাদের খাইয়ে তবেই খাবেন। চৈতন্যদেব বিশ্রাম করতে চলে গেলেন কিন্তু গোবিন্দকে পাহারায় রেখে গেলেন। বলে গেলেন যে, জগদানন্দের আহার সমাপ্ত হলে সংবাদটি যেন প্রভুর কাছে পৌঁছে দেয়। চৈতন্যদেব গৃহে গমন করলে জগদানন্দ গোবিন্দকে প্রভুর পদসেবা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। বললেন যে, প্রভু নিদ্রা গেলে সে যেন এসে খেয়ে যায়। ওদিকে চৈতন্যদেব ছটফট করছেন। ভক্তকে অভুক্ত রেখে প্রভু কি নিদ্রা যেতে পারেন? তিনি আবার গোবিন্দকে পাঠালেন। এইভাবে জগদানন্দের অনশন ভঙ্গ হল ঠিকই, কিন্তু আর একদিন ঘটল আর এক ঘটনা। চৈতন্যদেব কলার শরলার উপর শয়ন করতেন।

৯৫. চৈতন্যচরিতামৃত, ৩/১২

৯৬. তদেব

তাতে তাঁর কষ্টই হত। ভক্তগণ মনে দুঃখ পেতেন কিন্তু কিছু বলতে পারতেন না। একদিন জগদানন্দ এক কাজ করে বসলেন, তিনি কাপড় গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে শিমুল তুলো দিয়ে বালিশ বানিয়ে গোবিন্দের হাতে দিলেন প্রভুর ব্যবহারের জন্য। চৈতন্যদেব তুলোর বালিশ দেখে রুষ্ট হলেন। গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, জগদানন্দ তুলোর বালিশ তৈরি করিয়েছেন। জগদানন্দের নাম শুনে চৈতন্যদেব একটু সংকুচিত হলেন, তবুও বললেন—

'প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।।
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমার খাট তূলী বালিস মস্তক মুণ্ডন।।' [৯৭]

স্বরূপ দামোদর একটা উপায় বের করলেন। তিনি কলার শুকনো পাতা চিরে প্রভুর বহির্বাসে ভরে ওড়ন-পাড়ন তৈরি করে দিলেন। চৈতন্যদেব তার উপর শয়ন করতেন। এরপর জগদানন্দ প্রভুর অনুমতি নিয়ে মথুরা-বৃন্দাবন চলে গেলেন। অবশ্য অল্পকাল পরে আবার ফিরে এলেন নীলাচলে।

সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে ত্যাগ—এ দর্শন থেকে কখনও বিচ্যুত হননি চৈতন্যদেব। তিনি ঐহিক সুখ বিসর্জন দিয়ে সাধারণ জীবনে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। উত্তরসূরি বৈষ্ণব-ভক্তদের যাতে বিচ্যুতি না ঘটে, সদাচার যাতে বিনষ্ট না হয়, সেদিকে চৈতন্যদেবের দৃষ্টি ছিল সজাগ। সংসারি মানুষের চোখে সন্ন্যাসীর স্থান যেমন উচ্চে ছিল, তেমনি জীবনাচরণের ত্রুটি অতি সহজেই তাঁর সাধনমার্গকে মসীলিপ্ত করে দিত। চৈতন্যদেব লোকনিন্দাকে ভীষণ ভয় পেতেন, তিনি জানতেন অপপ্রচারে সামান্য ত্রুটি বিশাল আকার নিতে পারে। সর্বনাশ করে দিতে পারে সন্ন্যাসীর জীবনের সমস্ত ত্যাগ-তিতিক্ষাকে, সাধন-ঐশ্বর্যকে। তাই তিনি আজীবন নিষ্ঠাকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন, সদাচার বিসর্জন দেননি। জগদানন্দের সুগন্ধী তেল, তুলোর বালিশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভূমিতে শয়নের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। এমনকী আহারের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ সংযম ভক্তদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তাঁর মতে সাধক হবে আত্মমগ্ন, সর্বত্যাগী এবং ইষ্ট-সাধনায় নিষ্ঠাবান।

এদিকে তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য নীলাচলে এলেন চৈতন্য-সান্নিধ্যে থাকবার জন্যে। চৈতন্যদেব তাঁকে আট মাস নিজের কাছে রেখে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেন। তারপর বিবাহ না করার পরামর্শ দিয়ে তাঁকে

৯৭. তদেব, ৩/১৩

কাশীতে ফিরে গিয়ে পিতামাতার সেবা আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বললেন। বছর চারেক পরে পিতামাতা স্বর্গগত হলে রঘুনাথ প্রভুর নির্দেশ মতো আবার নীলাচলে ফিরে এলেন। এবারেও তাঁকে আট মাস নিজের কাছে রাখলেন চৈতন্যদেব। তারপর তাঁকে বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের কাছে গিয়ে সাধনায় রত থাকতে বললেন। জগন্নাথের তুলসীর মালা আর ছুটা পানবিড়া উপহার দিলেন রঘুনাথকে। রঘুনাথ বৃন্দাবনে গিয়ে ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন হলেন। জয়পুরের রাজা মানসিংহ তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন এবং তাঁর অনুরোধে বৃন্দাবনে বিশাল গোবিন্দ মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন।

নয়

নীলাচল লীলার অন্তিমপর্বে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন স্বরূপ গোস্বামী আর রঘুনাথ দাস। এঁরা দুজনেই কড়চা রচনা করেছিলেন, বর্ণনা করেছিলেন চৈতন্যলীলা-মাধুর্য। এঁদের দুজনের কড়চা অবলম্বনেই চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তিনি লিখেছেন—

'উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-প্রলাপ।।
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান।।' [৯৮]

এই সময় কৃষ্ণপ্রেমে চৈতন্যদেব এতটাই বিভোর থাকতেন যে, প্রায়শই তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত। শয়নে-স্বপনে তিনি কৃষ্ণের বিরহে আবিষ্ট থাকতেন, উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করতেন, মাঝে মাঝে বলতেন, 'পাইনু বৃন্দাবন নাথ পুনঃ হারাইনু।' একবার গোবর্ধনগিরি ভেবে চটকপর্বত অভিমুখে ছুটেছিলেন উন্মাদের মতো, সঙ্গীসাথিরা সে যাত্রায় তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, ধরে ফেলেছিলেন। একবার সমুদ্রতীরবর্তী উদ্যানে ঘুরতে-ঘুরতে যমুনা ভ্রমে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, এক জেলের জালে উদ্ধার হয়েছিল তাঁর অচেতন দেহ। কৃষ্ণ-বিরহে বিকারগ্রস্ত চৈতন্যদেবের নিশি কাটত জাগরণে। সারারাত্রি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতেন, মেঝেয় মুখ ঘষতেন, নাকে-মুখে রক্ত ঝরত। সঙ্গীরা সদা সতর্ক থাকতেন, উদ্বেগে তাঁরাও স্থির থাকতে পারতেন না। স্বরূপ দামোদর আর গোবিন্দ দরজা জুড়ে শুয়ে

৯৮. তদেব, ৩/১৪

থাকতেন, রায় রামানন্দ থাকতেন পাশের ঘরে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাহ্যজ্ঞানরহিত চৈতন্যদেব সবার অলক্ষ্যে ঘরের বাইরে চলে যেতেন। 'কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীমোহন'—এই ভাবে বিভোর চৈতন্যদেব একবার অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন মন্দিরের সিংহদ্বারে। কথিত আছে, এই সময় তাঁর হস্ত-পদের তিনগুণ বৃদ্ধি ঘটেছিল।[৯৯] অপর এক রাত্রে ঘরের বাইরে গাভিদের মধ্যে পড়েছিলেন চৈতন্যদেব। এবারে তাঁর দেহে ঘটেছিল সংকোচন, 'কমঠের' মতো।

নীলাচল লীলার শেষ বারো বছর চৈতন্যদেব যে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিয়েছিলেন 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তা বর্ণিত হলেও ওড়িয়া ভক্ত মাধব পট্টনায়কের 'বৈষ্ণবলীলামৃত' অনুসারে জানা যায় যে, শেষ বারো বছর চৈতন্যদেবের মানসিক সুস্থিতি নষ্ট হয়ে গেলেও তিনি যে সর্বক্ষণ বাহ্যজ্ঞানরহিত অবস্থায় কাল যাপন করতেন তা কিন্তু নয়; মাধবের মতে, এই সময় চৈতন্যদেব পঞ্চসখার সঙ্গে নাম-সংকীর্তন প্রচারেও যেতেন। বছরের বিভিন্ন সময়ে আলালনাথ, ভুবনেশ্বর, জাজপুর, কোনারক, কটক প্রভৃতি স্থানে তাঁরা নাম প্রচার করতেন।[১০০]

এরই মধ্যে জগদানন্দকে পাঠালেন নবদ্বীপে, মাতার সংবাদ আনার জন্যে--

'জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাঞা যতনে।
মাতাকে পৃথক পাঠান আর ভক্তগণে।।
মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।।' [১০১]

জগদানন্দ নবদ্বীপে এসে শচীদেবীর চরণে চৈতন্যদেবের প্রণাম নিবেদন করে কুশল সংবাদ জানালেন। মাসখানেক নবদ্বীপে অবস্থানের পর তিনি গেলেন অদ্বৈত আচার্যের সন্নিধানে। আচার্য একটি প্রহেলি ছড়ার মাধ্যমে কিছু গোপন সংবাদ চৈতন্যদেবের কাছে পাঠালেন। বললেন—

'বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলেরে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।' [১০২]

৯৯. তদেব
১০০. শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব—বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, পৃ. ৫৬
১০১. চৈতন্যচরিতামৃত, ৩/১৯
১০২. তদেব

ছড়াটি শোনার পর চৈতন্যদেবের বিরহ-যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত অবস্থায় প্রলাপ বকতে লাগলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন হল, কী ছিল এই প্রহেলিকাতে? এ ব্যাপারে পাণ্ডিতদের মধ্যে মতৈক্য নেই। সাধারণভাবে বোঝা যায় যে, ভক্তি বিতরণের কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখন আর হাটে ভক্তি বা প্রেম বিক্রি হচ্ছে না। মানুষ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হয়েছে। কিন্তু আচার্য যে সময়ে (১৫৩২ খ্রি.) প্রহেলিকাটি পাঠাচ্ছেন তখন বাংলার প্রতিটি গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করা যায়নি, ভক্তিবাদের বন্যায় দেশ প্লাবিত হয়নি। বরং তখন বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকেরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন। অদ্বৈত আচার্য কিছুটা রক্ষণশীল কর্মকাণ্ডের সমর্থক হয়ে পড়েছেন। তিনি হয়তো নিত্যানন্দের আচণ্ডালে ধর্মপ্রচারের বিষয়টিকে পছন্দ করতে পারেননি। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরি মনে করেছেন যে, আচার্যের ছড়াটিতে নিত্যানন্দের উদারতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষিত হয়েছে।[১০৩] আসলে সেকালের বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ ছিলেন একটি অনভিপ্রেত চরিত্র। তিনি কোনও নিয়ম-নীতির ধার ধারতেন না। সেজন্য বৈষ্ণবসমাজের একাংশ তাঁকে পছন্দ করতেন না। চৈতন্যভাগবতে বারবার এ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। তাই মনে হয় ছড়াটি ছিল উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের অভিযোগ-সংবলিত। ড. সুকুমার সেন মনে করেছেন যে, ছড়াটি ছিল বাংলার ভক্তিধর্ম প্রচারের গতিপ্রকৃতির ইঙ্গিতবাহী।[১০৪] এই ঘটনার পর চৈতন্যদেব আর বেশি দিন ধরাধামে ছিলেন না।

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল মহামানব চৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে।

১০৩. বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরি, পৃ. ৩৩৮

১০৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ড. সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২৪
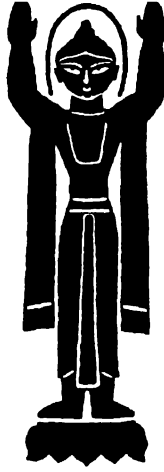
চৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য

প্রস্তাবনা

চৈতন্যদেব ছিলেন মহামানব। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ছিলেন তিনি। গৌড়বঙ্গের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে যে উৎকর্ষ আজও পরিলক্ষিত হয়, তার মূলে আছে চৈতন্য-বিভব। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপের এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপ ত্যাগ করে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি পুরীধামে গমন করেন। আজীবন তিনি সেখানেই ছিলেন। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পুরীধামেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে। আজ থেকে প্রায় পৌনে পাঁচশো বছর আগে দূরদেশে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু বিষয়ে গবেষণা করে মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করতে হলে সর্বাংশে নির্ভর করতে হবে জীবনীকাব্যের উপর, এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পন্থা নেই। আলোচনা শুরু করার আগে আমরা তাঁর মৃত্যুপর্বকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে চাই। প্রথমত, চৈতন্যদেবের মৃত্যুর স্থান। জীবনীকারদের রচনায়

তাঁর মৃত্যুর স্থান বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেউ বলেছেন তিনি জগন্নাথে লীন হয়েছেন, আবার কেউ বলেছেন টোটা গোপীনাথে, আবার কেউ ভিন্ন মতও প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কাল বা সময়। এক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। লোচনদাস বলেছেন আষাঢ় মাসের সপ্তমীর দিন রবিবার তৃতীয় প্রহরে, জয়ানন্দ বলেছেন আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় সপ্তমীর দিন রাত্রি দশ দণ্ডে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। দুজন বাঙালি কবি রথযাত্রার সময় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে উল্লেখ করলেও ওড়িয়া কবি মাধব পট্টনায়ক, ঈশ্বর দাস, দিবাকর দাস প্রমুখ জীবনীকার বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ায় চন্দনযাত্রার সময় চৈতন্যদেবের মৃত্যু হয়েছিল বলে স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে যে, বাঙালি জীবনীকারেরা, যাঁরা চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করেছেন, তাঁরা কেউ চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। অপরদিকে ওড়িয়া কবিরা কেউ-কেউ চৈতন্যলীলা স্বচক্ষে দেখেছিলেন, কেউ-বা প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাই তাঁদের পরিবেশিত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে আমরা ওড়িয়া কবিদের মতকে স্বীকার করে বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রার দিনটিকে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কাল হিসেবে চিহ্নিত করব। অবশ্য আর এক ওড়িয়া কবি গোবিন্দদাস ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কাল নির্ধারণ করেছেন ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু তাঁর রচনার বহু স্থানে স্ববিরোধ আছে, চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কিত বর্ণনায় তাঁর বক্তব্য স্পষ্টীকৃত হয়নি। গ্রন্থটির প্রামাণিকতা নিয়েও গবেষকেরা প্রশ্ন তুলেছেন। এ ছাড়া বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারেও মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়ত, চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কারণ। তাঁর মতো মানবতাবাদীর মৃত্যু কীভাবে ঘটেছিল, তা জানতে চায় সকলেই। আমরা এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত ধরন নির্ণয়ের চেষ্টা করব। অবশ্য এক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে যে, একমাত্র জীবনীকাব্য ব্যতীত এ সম্পর্কিত ইতিহাসচর্চার উপাদান ভীষণভাবে অপ্রতুল।

চৈতন্যদেবের মৃত্যু-বিতর্কের সূচনা

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর চারশো বছর পর পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেননি, কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেননি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম এই বিতর্কের সূচনা করেন। তিনি তাঁর রচিত 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে লেখেন,—'পুরীর পাণ্ডাদের মধ্যে আর একটি প্রবাদ

প্রচলিত আছে—তাহা আমি তথায় শুনিয়াছি। জগন্নাথ বিগ্রহ হইতেও শ্রীচৈতন্যের প্রতিপত্তি বেশি হওয়ায় পাণ্ডারা নাকি গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া মান্য করিতেন, যাঁহার তিরোধানের পর রাজার ঘোর বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহারই রাজধানীতে কি এরূপ একটা ঘটনা ঘটিতে পারে?'[১] আবার ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ড. দীনেশচন্দ্র সেন 'Chaitanya and His age' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, পুরীর ক্রুদ্ধ পাণ্ডারা চৈতন্যদেবকে হত্যা করে সমাধিস্থ করে।[২] অবশ্য তিনি এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, এটি কোনও সিদ্ধান্ত নয়, নিছক অনুমান মাত্র। এই গ্রন্থে তিনি আরও লিখেছেন, 'For fifty years after the Tirodhan of the great teacher, the Vaisnab community lay exervated by the great shock. Their Kirthana music which had taken the whole country by surprise, stopped for a time after that melancholy went and was not heard for nearly half a century in the great provinces of Bengal and Orissa.'[৩]

অধ্যাপক ড. সেন দুটি গ্রন্থে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, এবারে তা পর্যালোচনা করে দেখা যাক—প্রথমত, সব প্রবাদ বা জনশ্রুতি ইতিহাসের উপাদান হতে পারে না। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার আগে প্রবাদ বা জনশ্রুতিকে কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয়—সম্ভবত ড. সেন তা করেননি।

দ্বিতীয়ত, অতীতকে যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে উপস্থাপনা করাই হচ্ছে ইতিহাস। ড. সেন প্রবাদটির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেননি। শুধু পাঠকের উদ্দেশে একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েই দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন।

তৃতীয়ত, প্রায় চারশো বছর পরে পুরীর পাণ্ডারা চৈতন্যদেবের মৃত্যু প্রসঙ্গে তাঁকে যে তথ্য দিয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া হয় যে, পাণ্ডারা বংশপরম্পরায় চৈতন্যদেবের মৃত্যুর ঘটনাটি জানতে পেরেছিল, তা হলে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, গত চারশো বছর ধরে যেসব ভক্ত ও অনুসন্ধিৎসু মানুষ পুরীতে পাণ্ডাদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন

১. বৃহৎবঙ্গ—ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪০

২. Chaitanya and His age—Dr. Dinesh Chandra Sen, P-264

৩. Ibid, P-259

তাঁরা সকলেই চৈতন্যদেবের হত্যার ঘটনাটি জেনেছিলেন। চৈতন্য জীবনীকারেরাও ঘটনাটি পাণ্ডাদের কাছে শুনেছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জীবনীকারদের রচনায় কোথাও চৈতন্যদেবের মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, এ কথাও বলা হয়নি। এতক্ষণ আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পুরীর পাণ্ডাদের উপর আরোপিত প্রবাদটি সত্যি নয়—এটি ড. সেনের কল্পনাপ্রসূত।

চতুর্থত, 'Chaitanya and His age' গ্রন্থে ড. সেন স্বীকার করেছেন যে, চৈতন্যদেবকে হত্যার পর পঞ্চাশ বছর বাংলা ও ওড়িশার কীর্তন গান বন্ধ ছিল—ড. সেনের এই সিদ্ধান্তটি ইতিহাসসম্মত নয়। কারণ, সেকালে ওড়িশা ছিল হিন্দু রাজ্য আর বাংলা ছিল মুসলমান শাসিত রাজ্য। ওড়িশায় যদি কোনও অঘটন ঘটেও থাকে তা হলে বাংলার ভক্তদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছিল কি? তা যদি না থাকে তা হলে কীর্তন গান বন্ধ হবে কেন?

পঞ্চমত, চৈতন্য পরিকর নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরেও ৮-৯ বছর বেঁচে ছিলেন।[৩ক] তিনি খড়দহ থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত অসংখ্য জনপদে যেভাবে কীর্তনের ঝড় তুলেছিলেন, সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ষষ্ঠত, ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে খেতুরিতে বৈষ্ণব মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের প্রধান উপজীব্য ছিল কীর্তন। সবচেয়ে বড় কথা, এই সম্মেলনে একটি নতুন ঘরানার জন্ম হয়েছিল, যার নাম গরাণহাটি। একটি নতুন ঘরানা তো একদিনে গজিয়ে ওঠেনি, বছরের পর বছর অনুশীলনের পর তবেই এর জন্ম হয়েছিল। সুতরাং বাংলায় কীর্তন গান বন্ধ ছিল—এ তথ্য বৈষ্ণব ঐতিহ্য-বিরোধী।

৩ক. ঈশান নাগরের হিসাব অনুযায়ী নিত্যানন্দ ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন (অদ্বৈত প্রকাশ, ২২ অধ্যায়, পৃ. ৯৯-১০০)। ওড়িয়া কবি ঈশ্বর দাসের গ্রন্থে এই মত সমর্থিত হয়েছে (চৈতন্যভাগবত)। তিনি লিখেছেন যে, নিত্যানন্দের প্রয়াণকালে তাঁর পুত্র বীরভদ্রের বয়স ছিল সাত বছর। প্রেমবিলাসের মতে (উনিশশো বিলাস)। শ্রীচৈতন্যের প্রয়াণের দু-বছর পরে নিত্যানন্দের তিরোভাব ঘটে—যা সঠিক নয়। কারণ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। এরপর পুত্র বীরভদ্র এবং কন্যা গঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং মাত্র দু-বছরের মধ্যে এতসব ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল না। নিত্যানন্দ যে দু-বছরের অধিককাল জীবিত ছিলেন ড. বেলা দাশগুপ্তা তা স্বীকার করেছেন। তিনি ১৫৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল সাব্যস্ত করেছেন। ('শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ', পৃ. ১২৬)।

চৈতন্য-জীবনী কাব্য আলোচনা

প্রবাদ নয়, অনুমান নয়, চৈতন্যদেবের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে হলে চৈতন্য-চরিতকাব্য নিয়ে চর্চা করতে হবে। বাঙালি ও ওড়িয়া মিলিয়ে তেরোজন জীবনীকার ও একজন পদকর্তা চৈতন্যদেবের তিরোধান বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আবার কয়েকজন বরিষ্ঠ চরিতকার মহাপ্রভুর প্রয়াণ বিষয়টিকে অনুক্ত রেখেছেন। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের তিরোধান বিষয়ে বলেছেন, 'জগন্নাথ পরশিয়া হৈলা অন্তর্ধান।।' (৩/১৪)। মুরারিগুপ্ত তাঁর কড়চায় 'জগাম নিলয়ং' শব্দ উচ্চারণ করেই দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন (১/২/১৪)। কবি কর্ণপুর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য গ্রন্থে প্রভু 'স্বধামে' গেলেন বলেই প্রসঙ্গটির ইতি টেনেছেন। তিনি লিখেছেন—'নানালীলালাস্যমাসাদ্য ভূমৌ ক্রীড়ন্ ধাম স্বং ততহসৌ জগাম।।'[৪] চৈতন্যদেবের নীলাচল লীলার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে স্বরূপ দামোদর একটি কড়চা রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেই মূল্যবান গ্রন্থটি আজও উদ্ধার করা যায়নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটির রচনাকাল ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ। ইনি বৃন্দাবনে ষড় গোস্বামীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কড়চা থেকে ইনি চৈতন্যদেবের নীলাচল লীলার তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অথচ চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণ বিষয়ে মাত্র অপ্রকটের সালটির উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি।।
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান।।'[৫]

ষোড়শ শতকের যে দুজন কবি মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলাকে যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁরা হলেন জয়ানন্দ ও লোচনদাস। জয়ানন্দ শিশুকালে একবার শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তিনি চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নন। তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থটি আনুমানিক ১৫৪৮-৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। জয়ানন্দের পরবর্তীকালের কবি ছিলেন লোচনদাস। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যটির আনুমানিক রচনাকাল ১৫৬০-৭৬ খ্রিস্টাব্দ। জয়ানন্দের

৪. শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য—কবি কর্ণপুর, ২০/৪০-৪১
৫. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ১/১৩

কথায় পরে আসছি, আগে দেখি চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে লোচনদাস কী বলেছেন—

'আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্তন সার।।
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ।।
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়।।
তৃতীয় প্রহরে বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইলা তখন।।
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা।।
ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন।।
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন।।' [৬]

লোচনদাসের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীর রবিবার তৃতীয় প্রহরে চৈতন্যদেব জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হয়েছিলেন। তবে লোচন প্রত্যক্ষদর্শী নন, তিনি ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি। সম্ভবত সমকালীন ভক্তমণ্ডলীর কাছে শুনে, বিশেষ করে নরহরি সরকারের মতো ঘনিষ্ঠ চৈতন্য-পরিকরের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, সেকালে গৌড়ীয় ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে চৈতন্যদেবের প্রয়াণ সম্পর্কে প্রাগুক্ত ধারণাই প্রচলিত ছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে ঈশান নাগর তাঁর 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থে লোচনকেই অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

৬. শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস ঠাকুর, শেষ খণ্ড

'একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া।
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিলা হা নাথ বলিয়া।।
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল।।
কিছুকাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিলা।
গৌরাঙ্গ প্রকট সভে অনুমান কৈলা।' [৭]

লোকনাথদাসের 'সীতাচরিত্র' গ্রন্থে ঈশান নাগরের মতকেই স্বীকার করা হয়েছে। অবশ্য ঐতিহাসিক বিচারে শেষোক্ত গ্রন্থ দুটির নির্ভরযোগ্যতা যৎসামান্য।

চৈতন্যপরিকর ও নবদ্বীপ লীলার সঙ্গী বাসুঘোষের একটি পদে চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

'কি করিব কোথা যাব বচন না সরে।
হারাইনু গোরাচাঁদ গোপীনাথের ঘরে।।' [৮]

এটি একটি ইঙ্গিতপূর্ণ পদ। চৈতন্যদেবের অপ্রকটের সঙ্গে টোটা গোপীনাথের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। রথযাত্রার পাঁচদিন পরে জগন্নাথদেব এখানেই অবস্থান করছিলেন। তাই সপ্তমীর দিন জগন্নাথ দর্শন করতে চৈতন্যদেব এখানেই এসেছিলেন। এরপর তিনি টোটা গোপীনাথ মন্দিরেই অপ্রকট হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি নরহরি চক্রবর্তীর কণ্ঠেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

'প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হইলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে।।' [৯]

এতক্ষণ বাঙালি চরিতকারদের রচিত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্যগুলি উপস্থাপন করা হল। ষোড়শ শতাব্দীতে কাশী ও বৃন্দাবনে সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার সবগুলিতেই চৈতন্যদেবের তিরোধান প্রসঙ্গ অনুক্ত রয়ে গেছে। চৈতন্যদেব শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন ওড়িশার পুরীধামে। ওড়িয়া ভক্তরা অনেকেই চৈতন্যদেবকে নিয়ে গ্রন্থ রচনা

৭. অদ্বৈত প্রকাশ—ঈশান নাগর, ২১ অধ্যায়
৮. বাসুঘোষের পদাবলি—মালবিকা চাকী, পদ সংখ্যা ১৪৬
৯. ভক্তিরত্নাকর—নরহরি চক্রবর্তী, ৮/৩৫৪-৫৭

করেছেন। চৈতন্যদেবের ওড়িশা আগমনের অল্পকাল পরেই ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে মাধব পট্টনায়ক রচনা করেন 'চৈতন্য বিলাস'। আবার চৈতন্যদেবের মৃত্যুর দু-বছর পরে 'বৈষ্ণব লীলামৃত' নামে আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেন মাধব, এই গ্রন্থটির রচনাকাল ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দ। অপর এক ওড়িয়া ভক্ত গোবিন্দদাস বাবাজি ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত 'শ্রীচৈতন্যচকড়া' গ্রন্থটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের মূল পুথি পাওয়া যায়নি। অনুলিপির অনুলিপি দৃষ্টে গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা। এক্ষেত্রে মূল পুথির পাঠ সঠিকভাবে রক্ষিত হয়েছে কিনা, এ বিষয়ে ইতিহাসবেত্তারা প্রশ্ন তুলেছেন।[১০] ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় চপলাকান্ত ভট্টাচার্য 'মহাপ্রভুর অপ্রকটের নতুন কাহিনি শ্রীচৈতন্যচকড়া' নামক প্রবন্ধে গ্রন্থটির প্রামাণিকতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডাও গ্রন্থটিকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন।[১১] এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে আমাদের আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। চৈতন্যদেব পুরীধামে 'পঞ্চসখা' স্থাপন করেছিলেন। পঞ্চসখার সদস্য অচ্যুতানন্দদাস রচনা করেছিলেন 'শূন্যসংহিতা'। ইনি চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। সম্প্রতি বৈষ্ণবদাস রচিত 'চৈতন্যচকড়া' গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা নিজেকে চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেছেন। বাদবাকি ওড়িয়া কবিরা সবই পরবর্তীকালের। ঈশ্বরদাস ও দিবাকরদাস— এঁরা দুজনেই সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি সূর্যব্রহ্মা রচনা করেছিলেন 'প্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থ।

এবারে দেখা যাক ওড়িয়া ভক্তরা তাঁদের গ্রন্থে চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে কী তথ্য পরিবেশন করেছেন। 'শূন্যসংহিতা'-য় অচ্যুতানন্দদাস বলেছেন চৈতন্যদেব জগন্নাথ অঙ্গে লীন হয়েছিলেন—

'চৈতন্যঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎ প্রায় মিশি গলে।।'[১২]

অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন—

'কলারে কলা মিশিলা নোহিলা
সে বারি।'

১০. যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্য—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি, পৃ. ৭১
১১. শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব—ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, পৃ. ১০
১২. শূন্যসংহিতা—অচ্যুতানন্দদাস, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ২৭১

অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যদেব জগন্নাথের কালো অঙ্গে মিশে গেলেন, কোথাও তাঁর চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল না।

অচ্যুতানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের লীলাসঙ্গী। তাঁর বর্ণনায় জানা যাচ্ছে যে, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথে লীন হয়েছিলেন। সপ্তদশ শতকের কবি দিবাকরদাসের কণ্ঠেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। অচ্যুতানন্দের সুরে সুর মিলিয়ে 'জগন্নাথ চরিতামৃত' গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, জগন্নাথ বিগ্রহে চন্দন লেপনের সময় চৈতন্যদেব লীন হয়ে যান। তখন সেখানে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব উপস্থিত ছিলেন—

'এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য। শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন।
গোপন হইলে স্বদেহে। দেখি কার দৃষ্টি মোহে।।' [১৩]

সদানন্দ কবি সূর্যব্রহ্মা অষ্টাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। ইনি ছিলেন গদাধর শাখার শিষ্য। এঁর রচিত গ্রন্থ 'প্রেমতরঙ্গিণী'-তে টোটা গোপীনাথে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের কথা বলেছেন—'অষ্টচালিয়া বরষে অন্তর্ধান টোটা গোপীনাথ স্থানে।'[১৪]

ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থটি সপ্তদশ শতকের রচনা। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ চৈতন্য জীবনচরিত। ঈশ্বরদাস তাঁর গ্রন্থে এমন কিছু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন যা বৈষ্ণব ঐতিহ্য-বিরোধী। তিনি বলেছেন যে, গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, কাবেরী ও গোদাবরী নদী সন্নিহিত জাহ্নবী নগরের শ্রীশমুনির কন্যা; জগাই-মাধাই কর্ণাটকের লোক; রূপ-সনাতন কূর্মদেশের রাজা সুধর্মার পুত্র এবং রামানন্দ ছিলেন বারাণসীর রাজা।[১৫] এমন তথ্যের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। চৈতন্যদেবের প্রয়াণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রার দিনে রাজা প্রতাপরুদ্রের সামনে জগন্নাথ বিগ্রহে চন্দন লেপন করার সময় চৈতন্যদেব লীন হলেন। ঈশ্বরদাস তাঁর গ্রন্থে কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন, তিনি বলেছেন, জগন্নাথদেবেরই নির্দেশে মহাপ্রভুর পার্থিব মরদেহ গঙ্গায় (প্রাচীনদী) ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল—

'কালেক সন্ন্যাসে বিহরি। প্রবেশ যাই নীলগিরি।।
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন। দেখন্তি সর্ব বিদুজ্জন।।... ....
সেহি স্বরূপ শ্রীচৈতন্য। লীন এ নীলাদ্রি ভুবন।।

১৩. যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩২১
১৪. ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য—ড. অমূল্য সেন, পৃ. ১৯৭
১৫. ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা রচিত 'শ্রীচৈতন্য ও উড়িষ্যা' প্রবন্ধটি 'চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান' গ্রন্থে মুদ্রিত, পৃ. ১৬৪

শ্রীজগন্নাথ কলেবর। একাত্মা একাঙ্গ শরীর।।
সমস্তে এমন্ত দেখন্তি। মায়া শরীর ন জানন্তি।।
চৈতন্য পিণ্ড সিংহাসন। দেখন্তি ত্রৈলোক্যমোহন।।
ক্ষেত্র পালস্কু আজ্ঞা দেই। এ পিণ্ড নিঅ বেগে কই।।
অন্তর্খে নেই গঙ্গাজল। মেলিণ দিঅ ক্ষেত্রপাল।।
শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই। অন্তর্খে নেলে শব বহি।।
গঙ্গারে মেলি দেলে শব। সে শব হইলাক জীব।।
চৈতন্যরূপ প্রকাশিলে। গঙ্গারে লীন হোই গলে।।
কেহ্হ ন জানে এহ্হ রস। ভক্তংকু মুখরে প্রকাশ।।
লেখন নাহি শাস্ত্র পোথা। অত্যন্ত গুপ্ত এহ্হ কথা।।' [১৬]

ঈশ্বরদাস স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, ভক্তদের মুখ থেকে শুনেই তিনি এই তথ্য বর্ণনা করেছেন। এই তথ্যের মধ্যে কিছুটা বাস্তবতার স্পর্শ আছে। চৈতন্যদেবের পার্থিব শরীর যে ভূমিতে পড়েছিল এবং তাঁর শবদেহ যে গোপনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—এ তথ্যটি অতি মূল্যবান। সবার অলক্ষে শবদেহ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মন্দিরের গুপ্তপথ ব্যবহার করা হয়েছিল বলে স্বীকার করেছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়।[১৭] কাহ্নাই খুন্টিআর 'মহাভাব প্রকাশ' গ্রন্থে গুপ্তপথের উল্লেখ আছে।[১৮] বিদেশি আক্রমণের সময় দেববিগ্রহ গুপ্তপথ দিয়ে বাইরে এনে চিল্কার কাছে পর্বতগুহায় লুকিয়ে রাখা হত।[১৯]

গোবিন্দদাস বাবাজি রচিত 'চৈতন্যচকড়া' একটি বিতর্কিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্যে স্ববিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাসবেত্তারাও গ্রন্থটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এবারে দেখা যাক গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে কী তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'পঞ্চমীর পর সপ্তমী তিথিতে চার সম্প্রদায় নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলেন, কীর্তন করলেন, মহারাসস্থলীতে (গুণ্ডিচাবাড়ির নামান্তর) বিরহ কীর্তন, কীর্তনের সময় ক্রমাগত অশ্রু বিসর্জন; তাঁর কীর্তনের ধরন থেকেই সকলে বুঝতে

১৬. চৈতন্য ভাগবত—ঈশ্বর দাস (ওড়িয়া), অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তি সম্পাদিত। চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ১৬৭
১৭. চৈতন্যাষ্টক—প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪৭
১৮. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ১৬৮
১৯. শ্রীমহাভাব প্রকাশ—ফকিরমোহন দাস সং, পৃ. ১৫

পারলেন লীলা সংবরণের কাল হয়ে এসেছে। কীর্তনের পর বিশ্রামের জন্য তিনি পাদোদক কুণ্ডের কাছে বসলেন। সন্ধ্যা আরতির সময় সেবকরা তাঁকে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেল। তিনি গরুড়স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে লাগলেন। আরতির বিপুল বাদ্যধ্বনি আর কোলাহলের মধ্যে সহসা মন্দিরে দিব্যজ্যোতির প্রকাশ হল, জগন্নাথের মালা ছিঁড়ে পড়ে গেল। সকলে দেখলেন গরুড়স্তম্ভের পিছন থেকে এক তেজ এসে জগন্নাথে বিলীন হয়ে যাচ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল মহাপ্রভু নেই। সন্ধান আরম্ভ হল, কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। টোটা গোপীনাথের মন্দিরের কাছে পাওয়া গেল তাঁর বহির্বাস। রায় রামানন্দ সকলকে বোঝালেন মহাপ্রভু সেখানেই গিয়েছিলেন। তাঁর দিব্যসত্তা টোটা গোপীনাথে লীন হয়েছে বিগ্রহের হাঁটুর মধ্য দিয়ে, অপ্রাকৃত দিব্য দেহ লীন হয়েছে জগন্নাথের মূর্তিতে। টোটা গোপীনাথের হাঁটুতে একটা ফাটলও দেখা গেল যা পূর্বে ছিল না। মন্দির-প্রাঙ্গণে মহাপ্রভুর বহির্বাসের সমাধি দেওয়া হল। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন যে, চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তদের সম্মুখেই সমুদ্রতীরে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো অদৃশ্য হয়েছিলেন। তাঁর মতে ঘটনাটি ঘটেছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাবেলা।[২০]

ষোড়শ শতকের আর এক কবি বৈষ্ণবদাস চৈতন্যদেবের মৃত্যুর ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখেছেন বলে দাবি করেছেন। কিন্তু ইতিহাসবেত্তারা এই গ্রন্থটির প্রামাণিকতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।[২১] 'চৈতন্যচকড়া' গ্রন্থে বৈষ্ণবদাস বলেছেন—

'বুড়ো লেংকা' যাই বালি নবরে প্রবেশিল।
রাজা আজ্ঞা ছামুয়ে একথা নিবেদিল।।
আঙ্গা দিলে বিলোপিনো রাজ শ্রীঅঙ্গকু।
সমাধি করলি সর্বে নাম রতন ঘোষি।।'

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুসংবাদ বালিসায় রাজপ্রাসাদে রাজার কাছে গিয়ে নিবেদন করল বুড়ো লেংকা। প্রভুর মৃত্যুসংবাদ শুনে রাজা বিলাপ করতে-করতে আদেশ দিলেন যে, নাম সংকীর্তন করতে-করতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গকে যেন সমাধিস্থ করা হয়।

২০. শ্রীচৈতন্য প্রদক্ষিণ—ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, পৃ. ১৯৫-২০০
শ্রীচৈতন্যচকড়া—গোবিন্দদাস, পৃ. ৩০২-১২

২১. বিশ্ববাণী পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ 'মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধান রহস্য', ১৯৮১

বৈষ্ণবদাস তাঁর গ্রন্থে আরও একটি সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

'রাত দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হল।
তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে।।
কান্দিল বৈষ্ণবগণ কুহাতো কুহাড়ে।।' [২২]

অর্থাৎ চন্দন বিজয়ের দিন রাত দশ দণ্ডের সময় গরুড়স্তম্ভের পিছনে মহাপ্রভুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। তাই দেখে বৈষ্ণব ভক্তগণ বুক চাপড়ে হাহাকার করে কাঁদতে লাগল। বৈষ্ণবদাস যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা যে কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক, সচেতন পাঠক মাত্রেই তা বুঝতে পারছেন। সত্যিই যদি গরুড়স্তম্ভের পিছনে শ্রীচৈতন্যের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেত এবং বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁকে ঘিরে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করত, তা হলে একটি কথা সুনিশ্চিত যে, চৈতন্যদেবের পার্থিব দেহ সরিয়ে ফেলে জগন্নাথে লীন হয়ে যাওয়ার গল্পটি প্রচার করা সম্ভব হত না। বৈষ্ণবদাস বলেছেন যে, চৈতন্যদেবের মৃতদেহটি সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

এবারে চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী উৎকলীয় ভক্ত মাধব পট্টনায়কের গ্রন্থে বর্ণিত মহাপ্রভুর প্রয়াণ সম্পর্কিত তথ্য আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করব। চৈতন্যদেবের নীলাচল লীলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীকাব্য রচনা করেছিলেন মাধব পট্টনায়ক। তিনি নিজেকে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য বলে দাবি করেছেন। আর রায় রামানন্দ ছিলেন তাঁর আশ্রয়দাতা ও শিক্ষাগুরু। চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময় মাধব ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তাঁর গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, সেদিনের সমস্ত ঘটনার বিবরণ আশ্রয়দাতা রায় রামানন্দের কাছে শুনেছিলেন। রামানন্দ ঘটনাটি গোপন রাখার আদেশ দিলেও তাঁর মৃত্যুর পর মাধব তা লিপিবদ্ধ করে যান সত্য প্রকাশের অভিপ্রায়ে।[২৩] এখন আমরা দেখব মাধব তাঁর গ্রন্থে কী বলেছেন।

মাধব পট্টনায়ক রচিত 'বৈষ্ণবলীলামৃত' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, নীলাচলে অবস্থানকালে চৈতন্যদেব 'পঞ্চসখা'-র সঙ্গে নিয়মিত কীর্তন প্রচারে যেতেন। আলালনাথ, ভুবনেশ্বর, কোনারক, কটক, জাজপুর প্রভৃতি গ্রামে নাম প্রচার করতে যেতেন। সেই সময় উদ্দাম নৃত্যে মত্ত থাকতেন চৈতন্যদেব। ঘটনার দিন দলটি কীর্তন প্রচার করে ফিরে এসেছে, মন্দির চত্বরে তখনও চলছে কীর্তন। এই সময়

২২. চৈতন্যচকড়া—বৈষ্ণবচরণ দাস, সদাশিব রথশর্মা সম্পাদিত।
২৩. শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব, পৃ. ৬৭

নৃত্যরত প্রভুর পায়ে ইটের আঘাত লাগে। মাধবের বর্ণনায়—

'বাটে ইটা এ পড়িথিলা। তঁহিকি দৃষ্টি তা ন থিলা।।
বাজিলা বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি। রুধির ঝরই নিকিটি।।
পদখঞ্জাই মোড়ি হেলা। গলবাজি তলে পড়িলা।।
স্বামী যে কাশীশ্বর মিশ্র। যশোবন্ত শ্রীবৎস অনন্ত।।
সর্বে হোইন এক মেল। প্রভুকু সম্ভালে ভূতল।।
প্রভু সে হতজ্ঞান হোই। তলে পড়িছি চেতা নাহি।।
প্রভুঙ্কু কান্ধে টেকি নেলে। রুক্মিণী অমাবস্যা সায়ংকালে।।
উত্তর পারুশ মণ্ডপে। শুআই দেলে চিতা টোপে।।
নাসারু অনিল বহই। চক্ষু মুজিন পড়ি যাই।।
মুখেন সলিল সিঞ্চন। কেতে বেলেকে উদে জ্ঞান।।' [২৪]

ড. পাণ্ডা-কৃত অনুবাদ, 'উদ্দাম নৃত্য করে চলেছেন শ্রীচৈতন্য। পথে ইষ্টকখণ্ড একটি পড়েছিল, সেটির দিকে কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে তিনি আঘাত পেলেন এবং ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হল। তিনি পা মুড়ে পড়ে গেলেন এবং তাঁর কণ্ঠ থেকে গভীর কাতরোক্তি শোনা গেল। জগন্নাথদাস, কাশীমিশ্র, যশোবন্তদাস, শ্রীবৎস এবং অনন্তদাস সকলে একত্রিত হয়ে ভূপতিত প্রভুকে সামলানোর চেষ্টা করেন। প্রভু জ্ঞান হারিয়েছিলেন। অজ্ঞান হয়েই তিনি মাটিতে পড়েছিলেন। সেই রুক্মিণী অমাবস্যার (অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ববর্তী অমাবস্যা) দিন সন্ধ্যায় সঙ্গীরা অজ্ঞান প্রভুকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে উত্তর পাশের মণ্ডপে চিত করে শুইয়ে দিলেন। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক ছিল কিন্তু অচেতন অবস্থায় তিনি চক্ষু মুদ্রিত করে পড়েছিলেন। সকলে জল এনে তাঁর মুখে সিঞ্চন করতে থাকলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো।'[২৫] মূল পাঠ্যাংশে জগন্নাথদাসের নাম নেই, তা সত্ত্বেও অনুবাদক কীভাবে ওই নামটি ব্যবহার করলেন তা বোঝা গেল না।

সন্ধ্যার পর সকলে চলে গেলেন, একমাত্র জগন্নাথদাস প্রভুর সেবায় বৃত রইলেন। খবর পেয়ে রায় রামানন্দ এসে উপস্থিত হলেন। পরদিন সকালে প্রভুর শরীর জ্বরে পুড়ে যেতে লাগল। মনে হল ধান ছড়িয়ে দিলে খই হয়ে যাবে। সন্ধ্যার দিকে বাঁ-পা ফুলে গেল, যন্ত্রণা বেড়ে গেল। রাত্রে প্রবল জ্বরে সারা

২৪. বৈষ্ণবলীলামৃত—মাধব পট্টনায়ক, ৯/৪৬-৫৫

২৫. শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব, পৃ. ৬১-৬২

শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। জগন্নাথদাস পরম শ্রদ্ধায় প্রভুর সেবা করতে লাগলেন কিন্তু জ্বর একটুও কমল না, ক্রমে তাঁর সর্বাঙ্গ ফুলে গেল। এরপর মাধবের বর্ণনায়—

'অক্ষয় তৃতীয়া প্রবেশ। চন্দন যাত অবকাশ।।
ব্রাহ্ম মুহূর্ত আসি হেলা। প্রভুর পিণ্ড প্রাণ গলা।।' [২৬]

প্রভু প্রয়াত হলেন। রায় রামানন্দের কাছে সংবাদ পাঠানো হল। তিনি এসে সযত্নে প্রভুর সারা শরীরে হাত বোলাতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগল। তিনি কিছুটা সামলে নিয়ে রাজার কাছে খবর পাঠালেন আর নির্দেশ দিলেন, 'আজ মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকবে এবং দেবতার সমস্ত সেবাপূজা বা 'নীতি'ও বন্ধ থাকবে।' ওদিকে রাজার সঙ্গে পথেই দেখা হল, সংবাদ শুনে রাজার মুখ শুকিয়ে গেল। রাজা দ্রুতগতিতে মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। এরপর মাধবের বর্ণনায়—

'রাম রায় সে জানাইলে। প্রভুকু কি করিবা বোলে।।
গজপতি যে দারুভূত। কথা না স্ফুরে মুখুঁ মত।।
রাম রায় সে বলে শুন। এ শব নেলে অর্কারণ।।
গৌড়ীয় কদর্থ করিবে। ম্লেচ্ছ রাজারে খর বোলিবে।।
লাগিব কোন্দল বহুত। শূন্য কথাকু মিছ সত।।
যোড়িবে অনেক বারতা। শেষে পাইবু অপনিন্দা।।
মন্দিরে মরা গলা প্রভু। এহাকু এথে পোতাইবু।।
মণিমা রথ যাত বেলে। প্রভু বোলিহি যাত্রী মেলে।।
এ প্রভু সে প্রভুরে লীন। হেলা বোলিবাটি কারণ।।
শব পোতাইবা তুরিতে। কোইলী বৈকুণ্ঠ পুরীতে।।
জগন্নাথ জীর্ণ বিগ্রহ। পোতা হেলা ঠারু এ নীত।।
গজপতি যে অধোমুখে। সম্মত হেলেক তুরিতে।।
কোইলী বৈকুণ্ঠে শব নেই। পোতাইলে গাত খোলাই।।
রাম রায় যে স্বামীপদে। আট সেবক দুই এক।।
এহা ন জানে আন কেহি। পড়িলা দুআর ফিটাই।।' [২৭]

২৬. বৈষ্ণবলীলামৃত, ৯/৮৯-৯১

২৭. তদেব, ৯/১১২-২৬

ড. পাণ্ডাকৃত অনুবাদ, 'রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের মরদেহ নিয়ে কি করা কর্তব্য সে সম্পর্কে রাজাকে প্রশ্ন করলেন কিন্তু রাজা দুঃখে প্রায় চেতনাহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকে কোন কথাই বেরুলো না। তখন রামানন্দই বললেন, 'এই শবদেহ মন্দিরের বাইরে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই। গৌড়ীয় ভক্তরা শুনলে এর অনেক নিন্দা প্রচার করবেন, হয়ত মুসলমান রাজাকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবেন। যার মধ্যে সার বস্তু কিন্তু নেই তার সঙ্গে সত্য-মিথ্যা নানা কথা যুক্ত হয়ে বিবাদ উপস্থিত হবে। এতে আমরাই নিন্দিত হবো। যেহেতু প্রভু মন্দিরেই দেহত্যাগ করেছেন, এঁর মরদেহ এখানেই সমাধিস্থ করবো। পরে যখন শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা আসবে তখন যাত্রীরা অবশ্যই প্রভুর খোঁজ করবে। তখনই তাঁদের জানানো হবে যে এ প্রভু ওই প্রভুর দেহেই লীন হয়ে গিয়েছেন। এখন তাড়াতাড়ি কোইলী বৈকুণ্ঠে এই মরদেহ সমাধিস্থ করবো। ওখানেই জগন্নাথদেবের জীর্ণ দারুমূর্তি সমাধিস্থ করার নীতি প্রতিপালিত হয়ে আসছে। গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব অধোমুখে তাঁর সম্মতি জানালেন। শবদেহ কোইলী বৈকুণ্ঠে বহন করে নিয়ে গিয়ে সেবকদের দ্বারা নির্মিত একটি খাদের মধ্যে সমাহিত করা হলো। জগন্নাথ দাস, রামানন্দ আর কয়েকজন সেবক ছাড়া এ কথা আর কেউ জানলেন না। রাজাদেশ ঘোষিত হল—'এ কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে।'[২৮]

চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণের ঘটনাটি মাধব নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন। এই ঘটনাটি আর কোনও চরিতকার এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করতে পারেননি। এতদ্‌সত্ত্বেও মাধবের গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের সামনে ভিড় জমায়। প্রথমত, শ্রীচৈতন্যের প্রয়াণকালে গৌড়ীয় ভক্তরা কোথায় ছিলেন? গদাধর, জগদানন্দ, গোবিন্দ প্রমুখ ভক্ত সদা সর্বদা প্রভুকে ঘিরে থাকতেন, তাঁর প্রয়াণের সময় তাঁরা একজনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না—এ বক্তব্য কি বিশ্বাসযোগ্য? দ্বিতীয়ত, অদ্ভুত লাগে যখন দেখি, এই গ্রন্থে বাঙালি কবি জয়দেবকে এবং চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষকে ওড়িশাবাসী বলে দাবি করেছেন মাধব পট্টনায়ক। তিনি বলেছেন যে, ভুবনেশ্বরের নিকটে প্রাচী নদীতীরে অবস্থিত কেন্দুলিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জয়দেব[২৯] এবং চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষের বাসস্থান নির্দিষ্ট করেছেন জাজপুরে।[৩০] যার প্রতিফলন ঘটেছে জয়ানন্দের রচনায়।

২৮. শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব, পৃ. ৬৫

২৯. বৈষ্ণবলীলামৃত, ৮/৪২-৫৩

৩০. তদেব, ৮/৬৮-৭১

এ সব বিষয়ের অবতারণা দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, গ্রন্থটি আঞ্চলিকতাবাদে পুষ্ট নয় তো? তৃতীয়ত, গ্রন্থটিতে সন-তারিখের আধিক্য দেখে প্রশ্ন জাগে যে, বইটি জাল নয় তো? সেকালে ভক্তিমার্গের সাধকেরা গ্রন্থ রচনার কালে সাল-তারিখকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু মাধব প্রতিটি ঘটনার সন-তারিখ এত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন দানা বাঁধে। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা তাঁদের রচনায় শকাব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু মাধব কোথাও কোথাও খ্রিস্টাব্দ ব্যবহার করায় সন্দেহ আরও গভীর হয়েছে। চতুর্থত, চৈতন্যদেবের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় ভক্তরা সমালোচনা করতে পারেন—রায় রামানন্দের মনে এমন চিন্তা স্থান পেল কী করে?

বাঙালি চরিতকারদের মধ্যে চৈতন্যদেবের প্রয়াণ বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেছেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দের রচনায় মাধব পট্টনায়কের প্রভাব রয়েছে। জয়ানন্দ হয় মাধবের পুথি পাঠ করেছিলেন, অথবা গুরু গদাধর পণ্ডিতের কাছে ঘটনাটি শুনেছিলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে, মাধব পট্টনায়ক ও জয়ানন্দ একই গুরুর শিষ্য ছিলেন। জয়ানন্দ বলেছেন—

'আষাঢ় বঞ্চিতা রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে।।
অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে।
নিভৃত কর্ম কথা কহিল বিশেষে।।
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পরিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে।।
চরণে বেদনা বড় ষষ্টি দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে।।
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা।।... ...
মায়া শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।।' [৩১]

জয়ানন্দ ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি লীন হয়ে যাওয়ার ঘটনা স্বীকার করেননি। জাগতিক নিয়মেই যে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল জয়ানন্দের রচনায় তা স্পষ্টীকৃত হয়েছে। জয়ানন্দ বলেছেন যে, পায়ে ইটের আঘাত লাগার ফলেই

৩১. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, সুকুমার সেন ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, উত্তর খণ্ড, পৃ. ১৪৪-৪৮, ১৫১

চৈতন্যদেবের মৃত্যু ঘটেছিল এবং তাঁর মায়া শরীর মাটিতে পড়েছিল। বাঙালি চরিতকারদের মধ্যে একমাত্র জয়ানন্দ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাই তাঁর মতটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেনি।

জীবনীকাব্য অনুসারে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর ধরন—

ক) জগন্নাথে লীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে স্বীকার করেছেন লোচনদাস, ঈশান নাগর, অচ্যুতানন্দদাস, দিবাকরদাস, লোকনাথদাস এবং সদানন্দ কবি সূর্যব্রহ্মা।

খ) ঈশ্বরদাস জগন্নাথে লীন হওয়ার ঘটনাটিকে উল্লেখ করলেও তিনি বলেছেন চৈতন্যদেবের পার্থিব দেহ মাটিতে পড়েছিল এবং জগন্নাথের নির্দেশে তা সবার অলক্ষ্যে প্রাচী নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

গ) মাধব পট্টনায়ক এবং জয়ানন্দ বলেছেন যে, বাম পায়ে ইটের আঘাত লাগার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। মাধব বলেছেন কোইলী বৈকুণ্ঠে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

ঘ) কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে, একবার চৈতন্যদেব ভাবোন্মাদ অবস্থায় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, দীর্ঘ সময় পরে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল—এক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু ঘটেনি। এই সূত্র ধরে অনেকে অনুমান করেন, সমুদ্রে পতনের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। ওড়িয়া কবি গোবিন্দদাস জানিয়েছেন যে, প্রভু সমুদ্রতীরে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় অদৃশ্য হয়েছিলেন।

ঙ) বৈষ্ণবদাস জানিয়েছেন যে, হরিনাম সহকারে প্রভুকে টোটা গোপীনাথে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

জীবনীকারদের মতামত বিশ্লেষণ—

ক) অধিকাংশ জীবনীকারই জগন্নাথে লীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে সমর্থন করেছেন। আসলে জীবনীকারেরা সকলেই ভক্ত ছিলেন। তাঁরা চৈতন্যদেবকে ভগবান বলে স্বীকার করেছিলেন। ভগবানের মৃত্যু সাধারণ মানুষের মতো হোক এটা তাঁদের অভিপ্রেত ছিল না। তাই তাঁরা লীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, জাহ্নবা দেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, নরহরি সরকার, নরোত্তম দাস প্রমুখ বৈষ্ণব ধর্মগুরু লীন হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে নরোত্তম দাসের তিরোভাবের প্রসঙ্গটি তো আরও বেশি চিত্তাকর্ষক। 'নরোত্তমবিলাস' থেকে জানা যায় যে,

গঙ্গাজলে স্নান করার সময় দুই অনুচরকে গাত্র মার্জনা করতে নির্দেশ দিলেন নরোত্তম। আর তার পরই ঘটল সেই অদ্ভুত ঘটনা। দুই অনুচর তাঁকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ দুধ হয়ে গঙ্গার জলে মিশে গেল।[৩২] এ সম্পর্কে কী ব্যাখ্যা দেবেন তথাকথিত ইতিহাসবেত্তারা?

খ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদাসের সূত্র ধরে কেউ-কেউ মনে করেছেন সমুদ্রে পতনের ফলেই চৈতন্যদেবের মৃত্যু ঘটেছিল। M. T. Kennedy স্বীকার করেছেন যে, সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, 'However, the common supposition that the end came by drowning in the ocean during one of his fits of ecstasy has a great deal of probability in his favour, considering the many times Chaitanya was rescued from just such a death. The body was probably buried in the temple by the priests, and the miraculous tales that arose, of the master's disappearance in various images were doubtless created and encouraged by them for purposes of revenue.'[৩৩] প্রভাত মুখোপাধ্যায় মনে করেছেন যে, সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।[৩৪] মিস্টার কেনেডির বক্তব্যটি যুক্তিপূর্ণ হলেও একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, চরিতকারেরা কেউই এ ধরনের পরিণতির কথা বলেননি। সুতরাং অভিমতটি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যাবে না। সমুদ্রগর্ভে পতনের ফলে তাঁর মৃত্যু হওয়া সম্ভব কিন্তু লীন হওয়া সম্ভব নয়। কারণ সমুদ্র কিছুই গ্রহণ করে না, ফিরিয়ে দেয় বেলাভূমিতে। সত্যিই যদি সমুদ্রে পতনের ফলে চৈতন্যদেবের মৃত্যু ঘটত, তা হলে তাঁর পার্থিব শরীর বেলাভূমিতে ফিরে আসত। সেক্ষেত্রে তাঁর মৃতদেহটি গোপন রাখা সম্ভব হত না। স্বাভাবিক কারণেই ভক্তদের সম্মুখে তাঁকে সমাধিস্থ করার প্রশ্ন উঠত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা ঘটেনি।

৩২. নরোত্তম বিলাস—নরহরি চক্রবর্তী, রামদেব মিশ্র প্রকাশিত, ১১ অধ্যায়

৩৩. The Chaitanya Movement—M. T. Kennedy, P-51

৩৪. চৈতন্যাষ্টক—প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০, পৃ. ৪৮

গ) মাধব পট্টনায়ক এবং বৈষ্ণবদাস জানিয়েছেন যে, প্রয়াণের পর চৈতন্যদেবের পার্থিব শরীর সমাধিস্থ করা হয়েছিল। তবে সমাধির স্থান বিষয়ে দুজনের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মাধব বলেছেন কোইলী বৈকুণ্ঠে, অপরদিকে বৈষ্ণবদাস জানিয়েছেন টোটা গোপীনাথে প্রভুকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, পুরীধামে চৈতন্যদেবের কোনও সমাধি নেই।

ঘ) মাধব পট্টনায়ক ও ঈশ্বরদাস এ বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য দিয়েছেন। মাধবের মতে, পায়ে আঘাতজনিত কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। জয়ানন্দ এই মত সমর্থন করেছেন। অপরদিকে ঈশ্বরদাস বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তিনি জানিয়েছেন যে, গোপনে প্রভুর দেহ প্রাচী নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই দুটি মত যুক্তিবাদীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলি বিচারবিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন আছে।

গবেষকদের মতামত

এতক্ষণ বাঙালি ও ওড়িয়া ভক্তদের রচিত জীবনীকাব্য নিয়ে আলোচনা করা হল। দেখা গেল তাঁদের রচনায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকী সমকালীন জীবনীকারদের রচনাতেও কোনও সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। চরিতকারদের রচনায় মতানৈক্য লক্ষ করেই গবেষকদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, অগণিত ভক্ত যাঁকে স্বয়ং ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছেন, স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র, রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, রাজগুরু কাশীমিশ্র সহ সংখ্যাতীত ভক্ত যাঁর কৃপাপ্রার্থী ছিলেন, তাঁর তিরোভাব নিয়ে এত জটিলতা কেন? কেন তাঁর শবদেহ সৎকার করা হয়নি? কেন পুরীতে তাঁর সমাধি নেই? তাঁর প্রয়াণ দিবসে মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা হয়েছিল কেন? এত সব কেন নিয়ে গবেষকদের মনে প্রশ্ন তো জাগবেই। সুতরাং তাঁরা মহাপ্রভুর মৃত্যু বিষয়ে যেভাবে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চরিতকারদের রচনায় এত পরস্পরবিরোধী বক্তব্য কেন?

অনুমিত হয়, চৈতন্যদেবের তিরোভাবকে অলৌকিকত্ব প্রদানের অভীপ্সায় কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ভক্ত আগে থেকেই একটি পরিকল্পনা ছকে রেখেছিলেন। সম্ভবত রায় রামানন্দ, জগন্নাথদাস এবং স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্রদেব এই

পরিকল্পনায় শামিল ছিলেন। অকস্মাৎ মহাপ্রভুর মৃত্যু ঘটলে পরিকল্পনা মতোই মন্দিরের দরজা বন্ধ রেখে তাঁর মরদেহটি সরিয়ে ফেলা হয় এবং প্রচার করা হয় তিনি জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হয়ে গেছেন। সব ঠিকঠাকভাবেই চলছিল, কিন্তু ভক্তরা প্রভুকে দেখতে না পেয়ে যখন ছোটাছুটি করছেন তখন তাঁদের চোখেও কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ধরা পড়ে। তাঁরা দেখলেন এতদিনের প্রথা ভেঙে মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা হয়েছে, প্রভু রয়েছেন মন্দির অভ্যন্তরে, তাঁর কোনও সংবাদ জানা যাচ্ছে না। এর ফলে নানা গালগল্প প্রচারিত হয়, ভক্তদের মনেও নানা প্রশ্ন দানা বাঁধে। এক মুখ থেকে আর একমুখ, এক যুগ থেকে আর এক যুগে ভক্তদের মুখে পল্লবিত হয়ে ঘটনাটি বিচিত্র আকার ধারণ করে। চরিতকারেরা যখন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তখন এক-একজন ভক্তের কাছে এক-একরকম বর্ণনা তাঁরা শুনেছিলেন। তাই তাঁদের রচনায় ঐক্য রক্ষিত হয়নি। যিনি যেভাবে শুনেছেন সেভাবেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তাই এই বিভ্রান্তি।

চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণ বিষয়ে চর্চার প্রধান উপাদান হচ্ছে জীবনীকাব্য। কেউ-কেউ জীবনীগ্রন্থগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে ওড়িশার ইতিহাসের পটপরিবর্তন, ধর্মচেতনায় বৌদ্ধ প্রভাব এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালোভীদের চক্রান্তকে দায়ী করেছেন। এককালে ওড়িশা ছিল বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি প্রসারণের যুগে বৌদ্ধরা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে ঠিকই, কিন্তু বৌদ্ধ-সংস্কৃতির একটি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ অন্তঃসলিলার ন্যায় ওড়িশার জনজীবনে প্রবাহিত ছিল।[৩৫] পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটিও ছিল বৌদ্ধ প্রভাবিত। এটি নির্মিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা অনন্তবর্মা চোড় গঙ্গদেবের (১১১২-৪৮ খ্রি.) আমলে।[৩৬] ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙঘ মূর্তিকে রাতারাতি জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামে রূপান্তরিত করেন।[৩৭] জগন্নাথ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তা সকলেই স্বীকার করে নেন। আবার চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর তাঁকে সচল জগন্নাথ রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।[৩৮] শ্রীচৈতন্য ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু, সর্বধর্মসমন্বয়বাদে বিশ্বাসী। ওড়িশার বৌদ্ধবাদীদের সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক বজায় ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের মূল প্রবক্তা ছিলেন রায় রামানন্দ।

৩৫. শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—বিমানবিহারী মজুমদার, ২য় সং, পৃ. ৪৯১

৩৬. শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব, পৃ. ৭৫

৩৭. শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য—যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো), ৩য় সং, পৃ. ৮২

৩৮. চৈতন্য ভাগবত—ঈশ্বর দাস, ১ম অধ্যায়

অনেকে মনে করেন শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের অন্তিম নির্যাস।[৩৯]

ওড়িশার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গঙ্গাবংশীয়দের পর ওড়িশার সিংহাসন অধিকার করেন সূর্যবংশীয় রাজারা। কপিলেন্দ্রদেব (১৪৩৬-৭০ খ্রি.) ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। বিরাট হস্তীবাহিনী ছিল তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান শক্তি। এই হস্তীবাহিনীকে সকলেই সমীহ করে চলত। দুর্ধর্ষ হস্তীবাহিনীর অধিপতি হওয়ার সুবাদে এই বংশ 'গজপতি রাজবংশ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এরপর পুত্র পুরুষোত্তমদেব (১৪৭০-৯৭ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি ওড়িশার অধিপতি ছিলেন। চৈতন্যদেবের ওড়িশা আগমনের সময় এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭-১৫৪০ খ্রি.)।[৪০] 'মাতলাপঞ্জি'[৪১] থেকে জানা যায় যে, রাজা প্রতাপরুদ্র যখন দক্ষিণ ভারত অভিযানে ব্যস্ত, তখন গৌড়ের বাদশা হুসেনশাহ পুরী আক্রমণ করে জগন্নাথ মূর্তি ধ্বংস করেন। প্রতাপরুদ্রদেব পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন, তিনি সংবাদ পেয়ে দ্রুতগতিতে রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে বাদশাকে প্রতিহত করে গঙ্গাতীর পর্যন্ত অধিকার করে নেন। বৈষ্ণব সাহিত্যেও এ তথ্যের সমর্থন মেলে।[৪২] প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে জানা যায় যে, এই সময় কটক দুর্গের অধ্যক্ষ গোবিন্দ বিদ্যাধর বিশ্বাসঘাতকতা করায় রাজা প্রতাপরুদ্রদেব বাধ্য হয়ে বাদশার সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেন এবং গোবিন্দকে সেই অঞ্চলের শাসনভার প্রদান করেন।[৪৩] কেউ-কেউ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর জন্য গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই-কে দায়ী করেছেন—এ অভিমত যে সঠিক নয়, সে আলোচনায় পরে আসছি। তার আগে গবেষকেরা কে কী বলেছেন দেখা যাক—

৩৯. শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদবর্গ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরি, পৃ. ৪১

৪০. ভারতকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪, এখানে প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকাল ১৪৯৭—১৫৩৯ সাল বলা হয়েছে।
শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব, পৃ. ২৯
শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য, পৃ. ২৮৬

৪১. মাতলাপঞ্জি, প্রাচীন সংস্করণ, ১৯৪০

৪২. চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস, সুকুমার সেন সম্পাদিত, ৩/৪, পৃ. ২৭৪

৪৩. The Gajapati King of Orissa—P. Mukharjee
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও নির্মলনারায়ণ গুপ্ত, ১৯৮৫, পৃ. ১১-১২

বিশিষ্ট চৈতন্য গবেষক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরি বলেছেন, 'এই মৃতদেহের আকস্মিক অন্তর্ধানে গুপ্তহত্যার সন্দেহ বৃদ্ধি পায়। জগন্নাথে লীন হওয়া সাধারণভাবে ভক্তদের বিশেষভাবে প্রতাপরুদ্রকে প্রবোধ দিবার জন্য হত্যাকারীদের তৈরি কথা।'[৪৪] চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে মিস্টার রায়চৌধুরির অভিমতটি সঠিক নয়। কারণ আকস্মিক অন্তর্ধানের প্রকৃত অর্থ তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। চৈতন্যদেবের মৃত্যুকে অলৌকিকত্ব প্রদানের জন্য তাঁর অনুগত কয়েকজন ভক্ত তাঁর মৃতদেহটি গোপনে সরিয়ে ফেলেছিল। এখানে তাঁকে হত্যার কল্পনাটি বৈষ্ণব ঐতিহ্যসম্মত নয়। আবার বিশিষ্ট গবেষক ড. নীহাররঞ্জন রায় দেশ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখেন, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে গুমখুন করা হয়েছিল পুরীতেই এবং সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের দেহের কোনও অবশেষ চিহ্নও রাখা হয়নি কোথাও।'[৪৫] অপরদিকে প্রথিতযশা ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এদিকে জগন্নাথদেবের পাণ্ডারা দেখিল যে, রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ (অচল) অপেক্ষা মহাপ্রভুকেই (সচল জগন্নাথ) অধিকতর সম্মান দিয়াছেন এবং মহাপ্রভুর প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং রাজ-অমাত্য ও পাণ্ডারা স্থির করিল যে, মহাপ্রভুকে গোপনে হত্যা করিলেই রাজ্যও রক্ষা পায় আর জগন্নাথের প্রতি প্রতাপরুদ্রের ভক্তি ও আকর্ষণ ফিরিয়া আইসে। গুপ্তহত্যার কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। কিন্তু এক অনুমান ভিন্ন যথেষ্ট প্রমাণের একান্তই অভাব।'[৪৬] এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন যে, এ সবই অনুমাননির্ভর, হাতে কোনও প্রমাণ নেই। আমরাও মনে করি যে, চৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়েছিল বলে যাঁরা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করছেন, তাঁদের হাতে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ নেই। শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে নয়কে হয় করার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে কল্পনাবিলাসী কেউ-কেউ তো রীতিমতো ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখে ফেলেছেন। এ সব গ্রন্থের বক্তব্য নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়, কিন্তু সে সুযোগ এখানে নেই। স্বঘোষিত গবেষক ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায় রচিত 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' গ্রন্থ সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেই এ প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই। প্রথমত, জয়দেববাবু শান্তা মায়ির মুখরোচক গল্প শুনিয়েছেন পাঠকদের। বলেছেন, চৈতন্যদেব আত্মগোপন করে পুরী থেকে

৪৪. বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরি, পৃ. ৩৪৪

৪৫. দেশ, ২৪ মার্চ, ১৯৯০, পৃ. ৯

৪৬. বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, পৃ. ৩৪৩-৪৪

পালিয়ে কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তাঁর নাম হয় আউলিয়া চাঁদ। এবারে জয়দেববাবুর বক্তব্যটি পর্যালোচনা করে দেখা যাক। ইতিহাসচর্চা করতে হলে বাস্তবভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তা করতে হবে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় নানা তথ্য উঠে আসতে পারে, তা সরাসরি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করলেই গবেষকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তথ্যগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তটি পাঠকের সামনে তুলে ধরাই হচ্ছে গবেষণা। কিন্তু ড. মুখোপাধ্যায় তা করেননি। শান্তা মায়ির কথা স্বীকার করে নিলে এ কথা মানতে হবে যে, পুরীতে চৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়নি। তিনি গোপনে পালিয়ে এসেছিলেন। আমরা মনে করি, চৈতন্যদেব ছিলেন বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা সে যুগের আপামর জনগণকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। মধ্যযুগে নবদ্বীপের মাটিতে শাসক কাজির অনৈতিক নির্দেশনামার বিরুদ্ধে তিনি যে জনজাগরণ ঘটিয়েছিলেন, তার তুলনা দ্বিতীয়রহিত। সেই মানুষটি গোপনে পালিয়ে আসতে পারেন—এ যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। তা ছাড়া যে মানুষটি পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তিনি বাংলায় পালিয়ে এসে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ পরিকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে একটি উপসম্প্রদায় গঠন করবেন—এ যুক্তির কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, চৈতন্যদেব আউলিয়া চাঁদ সেজেছিলেন, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে তিনি ২৮৪ বছর বেঁচেছিলেন—এ যুক্তি তো হাস্যকর। এই ধরনের যুক্তিহীন অলৌকিক বিষয় যে ইতিহাসের আলোচনায় আসতে পারে, তা আমাদের বোধের অগম্য। দ্বিতীয়ত, এরপর তিনি শুনিয়েছেন প্রভুজির গল্প। সেখানে তিনি জানিয়েছেন যে, চৈতন্যদেবের ভক্তদের মধ্যে অনেকে নাকি গোবিন্দ বিদ্যাধরের চর ছিলেন। রায় রামানন্দ এ তথ্য জানিয়ে চৈতন্যদেবকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। প্রভুজি সেই চিঠি সংগ্রহের জন্য রাজামুন্দ্রি গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না—এ তথ্যটি বৈষ্ণব ঐতিহ্যবিরোধী। পাঠককে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই প্রসঙ্গটির অবতারণা। যাঁরা বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ করেছেন তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন যে, চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। চৈতন্যদেবের অনুরোধে রামানন্দ রাজকার্যে ইস্তফা দিয়ে রাজামুন্দ্রি ত্যাগ করে পুরীতে এসে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে বসবাস করেছিলেন। প্রতিদিনই চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটত, শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা হত। মহাপ্রভুকে কোনও বিষয়ে অবহিত করতে চাইলে তিনি

মুখোমুখি বসেই তা করতে পারতেন। এর জন্য চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, রামানন্দ প্রভুকে একটি পত্র লিখেছিলেন, তা হলে আমাদের সামনে অন্তত দুটি প্রশ্ন দানা বাঁধে। প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে রায় রামানন্দ ১৫১২ সালের পর আর রাজামুন্দ্রিতে ফিরে যাননি সেখানে তাঁর লিখিত পত্রটি রাজামুন্দ্রিতে গেল কীভাবে? তা ছাড়া একটি সাধারণ চিঠি পাঁচশো বছর ধরে অবিকৃত অবস্থায় টিকে রইল— এ যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য?

১৯৮১ সালে অধ্যাপক ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য 'বিশ্ববাণী' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।[৪৭] এর উত্তরে উক্ত গ্রন্থের প্রকাশক সুরেশ ভকত লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' পত্রিকায়। সেখানে তিনি বলেছেন যে, 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লেখকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত কিছুই নেই। শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান সম্পর্কে যতগুলি কাহিনি ও অনুমান প্রচলিত আছে, তার সবকটিকেই সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার সামনে উপস্থাপিত করেছেন মাত্র। তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত থাকবে দ্বিতীয় খণ্ডে।[৪৮] ইতিমধ্যে জয়দেববাবু প্রয়াত হয়েছেন, দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয়নি। পাঠকের অবগতির জন্য জানাই যে, লেখক যদি প্রাপ্ত তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন, তা হলে সারস্বত সমাজে সেই গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' এবং 'শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য' গ্রন্থ দুটি এই পর্যায়ভুক্ত।

এ তো গেল বিরুদ্ধবাদীদের কথা। এবারে আলোচনা করব সেই সব গবেষকের কথা যাঁরা চৈতন্যদেবকে হত্যার গল্পটি স্বীকার করেননি। বিশিষ্ট বৈষ্ণব গবেষক ড. বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, 'শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যু যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ গদাধরের নিকট টোটা গোপীনাথে তিনি শেষ সময়ে ছিলেন, ইহাই অধিকতর সম্ভব।'[৪৯] এক্ষেত্রে ড. মজুমদারের বক্তব্যটি কোনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে না। আবার ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, চৈতন্যদেবকে হত্যা করার গল্প

৪৭. মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধান রহস্য, বিশ্ববাণী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ।

৪৮. সাহিত্য সঞ্চয়ন পত্রিকায় প্রকাশিত সুরেশ ভকত লিখিত প্রবন্ধ 'ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য লিখিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধান রহস্য সম্পর্কে দুটি কথা', ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯০, পৃ. ৬-৯

৪৯. শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—বিমানবিহারী মজুমদার, পৃ. ২৭১

উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত এবং লোমহর্ষক ডিটেকটিভ গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।[৫০] এই একই অভিমত পোষণ করেছেন ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য। তিনি লিখেছেন, 'উৎকলাধীন প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভুর একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। পুরীতে বহু উৎকলীয় ভক্ত শ্রীচৈতন্যকে ঘিরে থাকতেন। স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ পণ্ডিত, গদাধর, রামানন্দ রায়, গোবিন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সকল সময়েই মহাপ্রভুর কাছে কাছে থাকতেন। এমতাবস্থায় তাঁকে অচেতন বা অর্ধচেতন অবস্থায় খুন করে শব গোপন করে ফেলা সহজসাধ্য মনে হয় না।'[৫১] আবার অবন্তীকুমার সান্যাল বলেছেন, 'কেউ কেউ অনুমান করেছেন, গুণ্ডিচাবাড়িতে আশ্রয় নিলে জগন্নাথের ঈর্ষাতুর অথবা রাজনীতিগতভাবে ক্রুদ্ধ পাণ্ডারা অসুস্থ চৈতন্যকে হত্যা করে সেখানেই সমাধিস্থ করে এবং জগন্নাথে লীন হওয়ার কাহিনিকে রটনা করে। কিন্তু এ অনুমান একেবারেই ভিত্তিহীন।'[৫২] ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা নানা কারণে চৈতন্যদেবকে হত্যার ঘটনাটি স্বীকার করেননি।[৫৩] আরেক গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি মনে করেন, 'অনুমান ব্যতীত এমন কোনও ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি যদ্বারা তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করা যায়।'[৫৪]

পর্যালোচনা—

(১) এতক্ষণ আলোচনায় দেখা গেল যে, একদল বরিষ্ঠ গবেষক চৈতন্যদেবকে হত্যার গল্পটি স্বীকার করেননি। আমরাও মনে করি তাঁকে হত্যা করার অনুমান সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কল্পনাপ্রসূত। সদাসর্বদা ভক্ত ও পরিকর-পরিবৃত মহাপ্রভুকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা সহজ ছিল না।

(২) চৈতন্যদেবকে হত্যা করা হলে অসংখ্য চরিতকারদের রচনায় কোথাও না কোথাও তার ইঙ্গিত পাওয়া যেত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়নি।

৫০. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২০

৫১. যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, পৃ. ৩২৪

৫২. অবন্তীকুমার সান্যাল রচিত 'চৈতন্য জীবন কথা' প্রবন্ধটি 'চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান' গ্রন্থে মুদ্রিত, পৃ. ১৪৮

৫৩. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ১৬৮

৫৪. যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্য, পৃ. ৮০

(৩) কেউ-কেউ মনে করেন, রাজনৈতিক কারণে নাকি তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। বিশেষ করে ক্ষমতালোভী গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই নাকি ষড়যন্ত্র করে এ কাজ করিয়েছিলেন। এ ধরনের অনুমান বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কারণ এ ধারণা যদি সত্যি হত তা হলে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটে যেত। আমরা গোবিন্দ বিদ্যাধরকে সিংহাসনে আসীন দেখতে পেতাম। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রভুর মৃত্যুর পর আরও সাত বছর উৎকলের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রদেব। এক্ষেত্রে আরও একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শ্রীচৈতন্য কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। সুতরাং ওড়িশার শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল—এ ধারণা ভিত্তিহীন। সুতরাং যাঁরা প্রভুকে হত্যার দায় ক্ষমতালোভীদের ঘাড়ে চাপাতে চান, তাঁদের যুক্তি ধোপে টেকে না।

(৪) সত্যিই যদি চৈতন্যদেবকে হত্যা করা হত তা হলে প্রভাবশালী রাজা প্রতাপরুদ্রদেব হত্যাকারীকে ছেড়ে দিতেন না। অবশ্যই দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেন।

(৫) হত্যার ঘটনাটি সত্যি হলে রায় রামানন্দ, জগন্নাথদাস এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের মতো প্রভাবশালী উৎকলীয় ভক্তরা নীরব থাকবেন, তা স্বীকার করা যায় না।

(৬) সে যুগের গৌড়ীয় ভক্তরা অন্য রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন। সুতরাং ঘটনাটি যদি সত্যি হত তা হলে তাঁরা চুপচাপ বসে থাকতেন না। অন্তত প্রতিবাদে মুখর হতেন এবং বৈষ্ণবসাহিত্যে তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হত।

উপসংহার

চৈতন্যদেব ছিলেন মানব-মুক্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ। প্রেমের বন্ধনে সকলকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন তিনি। 'জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী'—তিনি সমগ্র মানব জাতির মুক্তি কামনায় ছিলেন উদ্‌গ্রীব। তাঁর মতো উদার, মানবিক প্রেমে সিক্ত এক মহান আদর্শবাদীর মৃত্যু নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কৌতূহল তো থাকবেই। আর তা নিরসনের জন্য ইতিহাসবেত্তাদের আরও সতর্ক হতে হবে,

তথ্যনির্ভর হতে হবে। এতক্ষণ আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা গেল যে, চৈতন্য চরিতকারদের রচনায় তাঁর মৃত্যু নিয়ে কোনও সংশয় প্রকাশ করা হয়নি। কোনও কোনও জীবনীকার চৈতন্যদেবের মৃতদেহটি গোপন করার কথা বললেও তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এমন কথা বলেননি। অথচ বিংশ শতাব্দীর কল্পনাবিলাসী কয়েকজন গবেষক শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে চৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়েছিল বলে যুক্তিজাল বিস্তার করে চলেছেন। আজ আমরা একটা কঠিন সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি, আমাদের সমাজ ও সংহতি আজ বিপন্ন। আজকে সমাজবিরোধীরা, মৌলবাদীরা, সন্ত্রাসবাদীরা ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠছে এবং দেশের সংহতিকে বিপন্ন করে তুলতে চাইছে। এই অবস্থায় ইতিহাসবেত্তারা তাঁদের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। চৈতন্যদেবের মৃত্যু বিষয়ে যাঁরা চর্চা করছেন তাঁদের আলোচনা তথ্যভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। তথ্যকে গুরুত্ব না দিয়ে অনুমান বা কল্পনাকে আশ্রয় করে এমন কিছু বলা উচিত হবে না যা প্রতিবেশী দুটি রাজ্যের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণকে বিনষ্ট করতে পারে। এক্ষেত্রে ড. শুকদেব সিংহের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'দেশের ও দশের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না হলে কেবলমাত্র ঐতিহাসিকতার নামেও কোনও গবেষণা স্বীকার করে নেওয়া যায়, কিন্তু যেখানে শতাংশেই ক্ষতি বা বিপদের সম্ভাবনা, সেখানে তেমন গবেষণা বা আবিষ্কারের প্রয়োজন কী? আজ দেশের জাতীয় সংহতি যেখানে নানাভাবে নির্জিত, সেখানে এমন হানিকর তথ্যানুসন্ধান বন্ধ হোক।'[৫৫] ড. সিংহের অভিমতটিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্যের একমাত্র উপাদান চরিতকারদের রচনাই আমাদের সঠিক পথ দেখাতে পারে। তাঁদের রচনায় যখন এমন কোনও ইঙ্গিত নেই যে, যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় তিনি খুন হয়েছিলেন তা হলে কেন কল্পনাবিলাসী গবেষকেরা শুধুমাত্র অনুমানকে ভিত্তি করে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু নিয়ে পাঠককে বিভ্রান্ত করে চলেছেন?

পরিশেষে আমরা মনে করি যে, স্বাভাবিক কারণেই চৈতন্যদেবের মৃত্যু ঘটেছিল। হয়তো বাম পায়ে আঘাত লাগার কারণে ধনুষ্টঙ্কার রোগে তাঁর মৃত্যু হওয়া সম্ভব। পরে ঈশ্বরত্ব আরোপের জন্য তাঁর অনুগত কয়েকজন ভক্ত তাঁর পার্থিব শবদেহ গোপনে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করেছিল এবং ভক্তদের কাছে প্রচার করেছিল যে প্রভু জগন্নাথে লীন হয়ে গেছেন।

৫৫. গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ও চৈতন্যদেব—ড. সনাতন গোস্বামী সম্পাদিত, পৃ. ৮৫-৮৬
শ্রীচৈতন্য প্রদক্ষিণ—ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, পৃ. ২১৫

মাধব পট্টনায়ক জানিয়েছেন যে, প্রভুর দেহ কোইলী বৈকুণ্ঠে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। অপরদিকে ঈশ্বর দাসও পার্থিব শরীর সমাধিস্থ করার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে যে, বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে মৃতদেহ সমাধিস্থ করাই নিয়ম। পুরীতে যবন হরিদাসের প্রয়াণের পর চৈতন্যদেব স্বহস্তে তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করেছিলেন। বর্তমানেও ওই একইভাবে বৈষ্ণব সমাজে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথা প্রচলিত আছে। সুতরাং চৈতন্যদেবের প্রয়াণের পর তাঁর অনুগত ভক্তরা যে তাঁর নির্দেশিত পথেই তাঁকে সমাধিস্থ করেছিল তা বলাই বাহুল্য। এখানে আমরা অনায়াসে মাধব পট্টনায়কের মত স্বীকার করে নিয়ে বলতে পারি যে, চৈতন্যদেবকে পুরীর মন্দিরাভ্যন্তরে কোইলী বৈকুণ্ঠ সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

গৌড়ীয় জীবনীকারেরা স্বীকার করেছেন যে, চৈতন্যদেবের মৃত্যু ঘটেছিল আষাঢ় মাসের রথযাত্রার সময়। কিন্তু অধিকাংশ ওড়িয়া জীবনীকার জানিয়েছেন যে, বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রার সময়ে তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন। মাধবের মতে চৈতন্যদেবের মৃত্যু ঘটেছিল ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে রবিবার অক্ষয় তৃতীয়ার চন্দনযাত্রার দিন। বিশিষ্ট গবেষক এল.ডি.এস. পিল্লাই জানিয়েছেন যে, ওই বছরে অক্ষয় তৃতীয়া ছিল ২৭ এপ্রিল।[৫৬] মাধব চৈতন্যদেবের পূর্ণাঙ্গ জীবনীকাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন সমসাময়িক কবি এবং চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। তাই তাঁর মতটির গুরুত্ব অপরিসীম। অপর দিকে গৌড়ীয় জীবনীকারেরা ছিলেন পরবর্তীকালের। তাঁরা ভক্তদের মুখ থেকে শুনে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাই তাঁদের গ্রন্থে কিছুটা অসঙ্গতি থাকা স্বাভাবিক।

৫৬. অ্যান ইন্ডিয়ান এফিমারিজ—এল.ডি.এস. পিল্লাই সম্পাদিত, ৫ম খণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯২২, পৃ. ২৬৮

শ্রীচৈতন্য প্রদক্ষিণ, পৃ. ২০৬
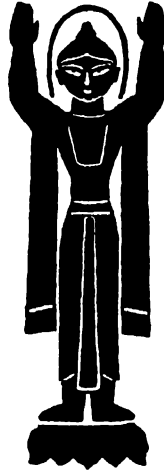
একালে চৈতন্যচর্চার প্রাসঙ্গিকতা

চৈতন্যদেবের মতো এত বড় মাপের সমাজ-সংস্কারক ভারতবর্ষের মাটিতে আর দ্বিতীয়টি জন্মগ্রহণ করেনি। সমাজকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলেন, মাটিতে কান পেতে শুনেছিলেন মানবাত্মার ক্রন্দন, মানুষের হৃদয়দেবতার লাঞ্ছনা দেখে কেঁদে উঠেছিল তাঁর অন্তর। শুধু নিজের মুক্তির জন্য চৈতন্যদেব উদ্‌গ্রীব ছিলেন না, তিনি সমগ্র মানবজাতির মুক্তি চেয়েছিলেন, 'জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী'। ব্যষ্টি নয়, সমষ্টির মুক্তি কামনায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। বিশ্বের অন্য সাধকদের সঙ্গে তাঁর আদর্শগত পার্থক্য এখানেই। তাইতো আজও বিশ্বের তাবড়-তাবড় পণ্ডিত ছুটে আসছেন চৈতন্যদেবের জীবনদর্শনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তাঁর প্রকৃত মানবিক সত্তাকে উদ্ভাসিত করার অভীপ্সায়।

মুসলমান শাসনে বাঙালি উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল। বিদেশি শাসনে ন্যুব্জ বাঙালি জাতি জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করছিল। তার উপর স্বধর্মের শিষ্টবর্গীয়দের উপেক্ষা তো ছিলই। ষোড়শ

শতাব্দীতে বাঙালির পাশে এসে দাঁড়ালেন চৈতন্যদেব। তিনি বাঙালি জাতিকে সংহত করে নতুন শক্তিতে বলীয়ান করে তুললেন। তাঁর মতো বলিষ্ঠ চরিত্রের সংস্পর্শে এসে বাঙালির ভীরুতা, কাপুরুষতার মতো অপবাদ ঘুচে গিয়েছিল। সেদিন নবদ্বীপের মাটিতে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি স্বগর্বে প্রতিবাদ জানিয়েছিল মুসলমান কাজির অনৈতিক নির্দেশনামার বিরুদ্ধে। বিশ্বের মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছিল শাসকশ্রেণির দুর্বিনীত আচরণের বিরুদ্ধে অহিংস গণতান্ত্রিক উপায়ে কীভাবে তার প্রতিকার করতে হয়। ভারতবর্ষের মাটিতে এটাই ছিল প্রথম জনজাগরণ, এটাই ছিল প্রথম অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলন। স্বয়ং চৈতন্যদেব ছিলেন এই আন্দোলনের স্রষ্টা। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা সে যুগের বাঙালিকে নতুন করে বাঁচার মন্ত্র শিখিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।' ইসলামের শাসনে ইসলামের বিরুদ্ধে এত বড় কথা বলার মতো মানসিক শক্তি একমাত্র চৈতন্যদেবের মধ্যেই বর্তমান ছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে বাঙালি তাঁর এই বলিষ্ঠ চরিত্রের কথা মনে রাখেনি। তাই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে বাঙালি জাতি দুর্বল হয়ে গেছে বলে কেউ-কেউ অভিযোগ করেছেন। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের অভিযোগেও সেই একই সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তিনি বলেছেন, 'চারশো বছর ধরে রাধাপ্রেমের পিছনে দৌড়ে বাঙালি তার সমস্ত পৌরুষ হারিয়েছে। লোকে পারে শুধু কাঁদতে; ওইটিই হয়েছে আমাদের জাতীয় চরিত্র। জাতির চিন্তাভাবনার পরিচয় যেখানে, সেই সাহিত্যে দেখ এই চারশো বছর ধরে খালি বিলাপ আর কান্না। প্রকৃত বীররসের কাব্য কোথায়?'[১]

সমাজ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের এ অনুধ্যান একেবারে অমূলক নয়। তবে এ জন্য চৈতন্যদেবকে কোনওভাবেই অভিযুক্ত করা যাবে না। চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদ হয়ে থাকতেন,—এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও তিনি ছিলেন দৃঢ়সংকল্প। চৈতন্যোত্তর কালে তাঁর আদর্শে দীক্ষিত ভক্তরা এবং বৈষ্ণবানুসারী কবিসমাজ তাঁর দাস্য ও মধুর ভাবকে যতটা মর্যাদা দিয়েছেন, ততটাই অবহেলা দেখিয়েছেন তাঁর মানবতাবাদী চরিত্রের পৌরুষদীপ্ত সংবেদনশীল দৃঢ়তাকে। তাঁর চরিত্রের যে দিকটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা লাভ করেছে কাব্যে ও সাহিত্যে, সত্যি হলেও তা আংশিক সত্যি। তাঁর চরিত্রের রোচিষ্ণু অধ্যায়টি উত্তরসূরিদের হাতে অনেকটাই প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

মধ্যযুগে নবদ্বীপের মাটিতে দাঁড়িয়ে মেরুদণ্ডহীন বাঙালি জাতির মনে পৌরুষেয় ভাবের উদয় ঘটিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। সেদিন প্রতিবাদী চিন্তা-চেতনায়

১. Complete works of Swami Vivekananda—Centenary Volume, Vol. VI, P-320

দীক্ষিত করেছিলেন মানুষকে। তুর্কি শাসনে হতাশাগ্রস্ত, অবসাদের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত, আদর্শহীন, দিশাহীন বাঙালি জাতিকে সংহতির মন্ত্র শিখিয়েছিলেন তিনি। চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে সেদিন যে জনজাগরণ ঘটেছিল নবদ্বীপে, সেখানে সমাজের সব সম্প্রদায়ের মানুষ শামিল হয়েছিলেন। সুতরাং সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করতে এবং জাতীয় চরিত্রকে দৃপ্ত ও ভাস্বর করে তুলতে চৈতন্যদেবের অবদানকে স্বীকার না করে উপায় নেই। জয়কৃষ্ণদাসের 'মদনমোহন বন্দনা' পুথি থেকে জানা যায় যে,[২] অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্গি আক্রমণের সময় এদেশের রাজা-জমিদারেরা যখন দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিলেন তখন বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব প্রজারা একজোট হয়ে তা প্রতিহত করেছিলেন।[৩] ফলে বিষ্ণুপুরে বর্গি অত্যাচার দানা বাঁধতে পারেনি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংহতির ফলেই এই প্রতিরোধ সম্ভবপর হয়েছিল। এ জয়কে যদি বাঙালির বীর্যবত্তার দিগদর্শন হিসেবে চিহ্নিত না করি, এ জয়কে যদি বীররসের ফল্গুধারারূপে স্বীকার না করি, তা হলে তা হবে প্রকৃত সত্যের অপলাপ মাত্র।

ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপের সমাজ ছিল আত্মকেন্দ্রিক, আচার-বিচার সর্বস্ব এবং রক্ষণশীল। নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি সীমাহীন আসক্তি মানুষকে করে তুলেছিল অমানুষ। সমাজের একশ্রেণির মানুষের হাতে অগাধ অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল, ধনের গর্বে তারা মত্ত থাকত, মদ্যমাংস সহযোগে শক্তিপূজার আয়োজন করে দম্ভের প্রকাশ ঘটাত, পরনিন্দা পরচর্চা ছিল তাদের প্রাত্যহিক কর্ম, তন্ত্র-মন্ত্র কবচ-তাবিজের সংস্কারে সমাজের মানুষ এতটাই মগ্ন ছিল যে, তা থেকে উদ্ধারের কোনও পথ ছিল না। চৈতন্যদেব সমাজের অনড় জাড্যতাকে ভেঙে প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এ জন্য সর্বাগ্রে যে কাজটি করা দরকার সেটি হচ্ছে মানব-চরিত্রের সার্বিক উন্নয়ন। তিনি তাঁর পরিকরদের চরিত্র গঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন। সামান্যতম বিচ্যুতিকেও তিনি প্রশ্রয় দেননি। শুদ্ধতা, নৈতিকতা, মানবিকতা ও

২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুথি সংখ্যা ১২৬৯, ১৫৫১
বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য—বাসন্তী চৌধুরি, পৃ. ৫-৮

৩. Alibardi and his times—K. K. Dutta, P-57

সংযম, মানব-চরিত্রের এই গুণগুলিকে অপরিহার্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ভক্তিমতী বৈষ্ণবী মাধবীর প্রতি দুর্বলতার কারণে ছোট হরিদাসকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন। পরিকরদের আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও তিনি আর ছোট হরিদাসের মুখ দর্শন করেননি। অপরাধের ক্ষমা না পেয়ে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হরিদাস প্রয়াগে আত্মহত্যা করেছিলেন। এ খবর শুনে চৈতন্যদেব বলেছিলেন যে, মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে।[৪] যে-কোনও মূল্যে বৈষ্ণবীয় আদর্শকে নির্মল রাখার জন্যে চৈতন্যদেবের প্রয়াস ছিল সীমাহীন। নারীর প্রতি দুর্বলতা হেতু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণসঙ্গী কালাকৃষ্ণদাসকেও তিনি প্রশ্রয় দেননি। চৈতন্যদেব বুঝেছিলেন, নারী সংসর্গ ভ্রষ্টাচারের পথ প্রশস্ত করতে পারে। সাধনমার্গের উপাসকেরা সমাজের চোখে আদর্শস্থানীয়, তাঁদের চরিত্র হতে হবে নির্মল, নিষ্কলঙ্ক। আর বিচ্যুতি ঘটলেই তাঁদের ধর্মীয় আদর্শ সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে, একটি আদর্শ ধর্মমত স্থাপনের লক্ষ্যে, সারা জীবন কৃচ্ছ্রসাধন করে কাটালেন চৈতন্যদেব। ভোগবিলাসকে তিনি সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তা সত্ত্বেও আহার্যের ব্যাপারে রামচন্দ্রপুরী কটাক্ষ করায় চৈতন্যদেব ভোজনের পরিমাণ এতটাই কমিয়ে দিলেন যে, কার্যত তিনি প্রায় উপোস করেই থাকতেন। জগদানন্দের সুগন্ধী তৈল তিনি সরোষে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, শুধু তা-ই নয় তুলোর বালিশ, বিছানা দেখেও ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। কলার শরলা পেতে শয়ন করতেন, জীবনধারণের জন্য যৎসামান্য ভোজন করতেন। সনাতনের গায়ে দামি ভোট কম্বল দেখে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। আসলে চৈতন্যদেব এক আদর্শ জীবনাচরণ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যার মুখ্য উপজীব্য ছিল নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, কৃচ্ছ্রতা ও মানবিকতা। ভক্ত রঘুনাথদাসকে উপদেশ প্রদানকালে চৈতন্যদেব বললেন—

'গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।'[৫]

এ উপদেশ তো সমাজের সব মানুষের কাছে গ্রহণীয়। চৈতন্যদেবের মতে, পরনিন্দা পরচর্চা সর্বদা বর্জনীয়, এতে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন হয়ে উঠবে সর্বাঙ্গসুন্দর। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্যে যা একান্ত কাম্য। চৈতন্যদেব আজীবন

৪. চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, পৃ. ৬৯০-৯৩

৫. তদেব, ৩/৬, পৃ. ৫৩৪

ছিলেন মানবতার প্রতি ঐকান্তিক, আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আদর্শ যে মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে পারে, আর তার বিচ্যুতিতে মানুষ হয়ে ওঠে পশুর সমান, চৈতন্যদেবের জীবনাচরণ অনুধাবন করলেই তা মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, কঠোর অথচ সঠিক সিদ্ধান্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা শুধু বৈষ্ণব সমাজে নয়, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজও সমানভাবে প্রযোজ্য।

তিন

পুরুষশাসিত হিন্দু সমাজে নারীর অধিকার ছিল দ্বিতীয় মেরুতে। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান ঘটে সুঙ্গ-আমলে। ব্রাহ্মণ পুষ্যামিত্রের (১৮৫ খ্রিস্টপূর্ব) সময়ে নতুন করে আরম্ভ হয় স্মৃতিগ্রন্থের সংকলন।[৬] মনু সমস্ত অধিকার হরণ করে নারীজাতিকে চিরদিনের জন্য পরমুখাপেক্ষী করে দিয়ে বললেন, নারীকে বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীনে থাকতে হবে।[৭] তবে মনু নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি। তিনি নারী জাতিকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেও পরবর্তী স্মৃতিকারগণ নারীর মানবিক অধিকার স্বীকার করেননি।[৮] 'জীমূতবাহন স্ত্রীলোকদের সম্পত্তি বিক্রয়ের কিংবা বন্ধক রাখার অধিকার মানেননি। অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে স্ত্রীলোকরা সম্পত্তির অধিকার পেতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সম্পত্তি নিছক উপহাররূপে গণ্য হত। রঘুনন্দন অবশ্য সতীদাহ প্রথার সমর্থক ছিলেন না। স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র পাঠের অধিকারও ছিল না। অথচ বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের পরিত্যাগ করা যেত। পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষের সার্বভৌমত্ব সূচক পারিবারিক সংগঠনে পতিব্রত্যই ছিল বিবাহিতা স্ত্রীর ধর্ম।'[৯] হিন্দু সমাজে নারীরা দাসী হিসেবে গণ্য হত। পতিব্রতার অর্থ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, স্বামীকে দেবতার আসনে বসিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য উপচার সহযোগে আরাধনা করে স্ত্রীকে পাদোদক পর্যন্ত পান করতে হত।[১০] স্বামী মারা গেলে নারীকে আজীবন পুরশ্চরণ করে কাটাতে হত, একাদশী ব্রত ছিল অবশ্য

৬. সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার, ৩য় সং, পৃ. ১৩৮

৭. মনুসংহিতা, ৫/১৪৭-৪৮, ৯/৩

৮. প্রাচীন ভারতে বিবাহ—কালিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৭৩

৯. বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম—রমাকান্ত চক্রবর্তী, পৃ. ২৩-২৪

১০. বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য—আবদুস সামাদ, পৃ. ১৩৩-৩৪

পালনীয়। পুরুষরা বহু বিবাহ করতে পারত, অথচ নারীদের এ অধিকার ছিল না। সমাজ পুরুষশাসিত ছিল বলেই নারীর প্রতি এ বৈষম্য কার্যকর করা সহজ হয়েছিল। সাধক সচ্চিদানন্দ লিখেছেন যে, নারীরা যদি শাস্ত্রকর্তা হত, তা হলে পুরুষদের বৈধব্য পালন করতে হত, স্ত্রীর সঙ্গে সহমরণে যেতে হত।[১১] ইসলামের প্রসারের কালে হিন্দু পুরনারীরা পরদানশিন ও অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে পড়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসারণের পর নারী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীসমাজ স্মার্ত শাসনের কঠোরতার নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করে।

বৈষ্ণবধর্মে নারীরা ব্রাত্য ছিল না। চৈতন্যদেবের ৪৯০ জন পরিকরের মধ্যে ১৬ জন ছিল স্ত্রীলোক। 'শ্রীশ্রীবৃহৎ ভক্তিতত্ত্বসার' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

'শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী।।' [১২]

নিত্যানন্দ নারীসমাজকে এতটাই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, কুলের বউ-ঝিরাও সংকীর্তনের মাঝে নাচানাচি করত। বলরামদাস লিখেছেন—

'হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সংকীর্তনের মাঝে নাচে কুলের বৌহারী।।' [১৩]

এতদিনে পুরুষশাসিত সমাজে বন্দি নারীরা মুক্তির স্বাদ পেল। বন্দিশালার বাইরে এসে মুক্ত বিহঙ্গের মতো তারা উড়ে বেড়াতে লাগল। বৈষ্ণব ধর্মের ছত্রছায়ায় নারীরা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তর কালে অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী, নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা, কন্যা গঙ্গাদেবী এবং শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতা ঠাকুরানি গুরুর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহস্রনাম সমাজে প্রচারিত হয়েছিল।

নারী শিক্ষা প্রসারে বৈষ্ণবীয় অবদান সর্বজনস্বীকৃত। 'নিম্নবর্ণে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে 'মা গোঁসাই'-দের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাঁরা লেখাপড়া জানতেন এবং যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্না ছিলেন। তাঁদেরও অপবাদ সহ্য করতে হয়।'[১৪] ব্যভিচার বৈষ্ণব সমাজের একাংশকে গ্রাস করেছিল, তবে সমগ্র সমাজকে তা স্পর্শ করতে

১১. বস্তুবাদী বাউল—শক্তিনাথ ঝা, পৃ. ৪৫৫
১২. বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, পৃ. ১৩১
১৩. গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃ. ২৬, পদ ৩৬
১৪. বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, পৃ. ১৪০

পারেনি। সমাজের সর্বস্তরে নারী শিক্ষার প্রসারণে বৈষ্ণবীদের সপ্রশংস উল্লেখ করে উইলিয়াম হান্টার সাহেব লিখেছেন, 'For long they were the only teachers admitted into the zananas of good families in Bengal. Sixty years ago they had already effected a change for the better in the state of female education.'[১৫] শুধু নারী শিক্ষা নয়, গণসাক্ষরতা প্রসারণে বৈষ্ণব-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। চৈতন্যোত্তর কালে বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে জোয়ার দেখা গিয়েছিল, তার মূলে ছিল সাক্ষরতার প্রসারণ। শিক্ষা সকলের জন্যেই আবশ্যিক। শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীর শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি-অবনতির উপর সমাজের সামগ্রিক চলমানতা নির্ভর করে না। চৈতন্যদেব এ কথা বুঝেছিলেন বলেই প্রচলনির্ভর বিধিব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতির লক্ষ্যে শিক্ষাকে সর্বজনীন করেছিলেন। আজ শিক্ষার প্রসার ঘটেছে ঠিকই, তবে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সেভাবে সফলতা আসেনি। ভারতবর্ষের নারীদের শতকরা ৭৫ ভাগ আজও নিরক্ষর, আর আর্থিক দিক থেকে পরাধীন শতকরা ৭৮ ভাগ। রাষ্ট্রসংঘের দুটি সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বিশ্বের মোট আয়ের মাত্র দশ শতাংশ আসে নারীদের হাতে, মোট সম্পদের মাত্র এক শতাংশ আছে নারীর অধিকারে।[১৬] এর থেকেই বোঝা যায় নারী এখনও পরাধীন এবং পুরুষের হাতের ক্রীড়নক। এর থেকে উত্তরণের জন্য আজও চৈতন্যদেবকেই পাথেয় করতে হবে।

চার

মধ্যযুগে বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল নবদ্বীপ। আর তার প্রাণপুরুষ ছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। প্রচলনির্ভর সমাজব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে জাতপাতহীন সমাজগঠনে চৈতন্যদেব যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সমাজে তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ব্রাত্যজনেরাও যে ঈশ্বরের সন্তান, তারাও যে মানুষ, ভেদবুদ্ধি যে স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষের সৃষ্টি, চৈতন্যদেব তা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। জাতিভেদ প্রথা যে সমাজকে দুর্বল করে দিচ্ছে, নিঃস্ব করে দিচ্ছে, অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করছে, এ বোধ তাঁকে পীড়িত করেছিল। স্মার্ত

১৫. বাঙালী মনীষায় শ্রীচৈতন্য—নির্মলনারায়ণ গুপ্ত সম্পাদিত, পৃ. ৩

১৬. The Statesman, 15 August 1987, 7 March 1993.

বিধানে অব্রাহ্মণ্য সমাজের সকলেই শূদ্র, অস্পৃশ্য। তাদের শাস্ত্রপাঠের অধিকার ছিল না, সামাজিক মর্যাদা ছিল না, ব্রাহ্মণের সেবা করাই ছিল তাদের একমাত্র ধর্মীয় কৃত্য। শিষ্টবর্ণের কাছে ঘৃণা, অবজ্ঞা, নির্যাতন সহ্য করে শূদ্ররা জীবন্মৃত অবস্থায় জীবনধারণ করত। ফলে শূদ্র সমাজের একাংশ ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। শিষ্টসমাজের কর্তাব্যক্তিরাই প্রকারান্তরে নিম্নস্তরে বর্ণান্তরের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

চৈতন্যদেব জাতপাতের গণ্ডি লঙঘন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।' বৈষ্ণব ধর্মের এই মানবিক আবেদন ব্রাহ্মণেতর সমাজের মানুষকে বাঁচার রসদ জুগিয়েছিল। তারা দলে-দলে ভক্তি-আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। যবন হরিদাসকে বৈষ্ণবগোষ্ঠীতে যথাযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করে পাঁচশো বছর আগে তিনি যে সম্প্রীতির বীজ রোপণ করেছিলেন, আজও আমরা তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারিনি। আচার-বিচারসর্বস্ব কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন আধুনিক মনের মানুষ, সংস্কারমুক্ত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মানবতাবাদী। তাঁর মানবপ্রেম সমাজকে নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছিল।

মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন চৈতন্যদেব। ব্রাত্য মানুষকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি সামাজিক অচলায়তনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। নগর সংকীর্তনে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে অংশগ্রহণের অধিকার দিয়ে রক্ষণশীল সমাজের কূপমণ্ডুকতায় আঘাত হেনেছিলেন তিনি। প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষজনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সম্পর্ক ছিল হার্দিক। নবদ্বীপের স্মার্ত বিধান অমান্য করে তিনি শূদ্র পল্লিতে তাঁতি, গোয়ালা, মালাকার, তাম্বুলি, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক সম্প্রদায়ের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে তাদের সুখ-দুঃখের খোঁজ নিতেন, তাদের হাতে জল গ্রহণ করতেন। জাতপাতহীন সমাজ গঠনে চৈতন্যদেবের অসামান্য অবদানকে সমাজ-বিজ্ঞানীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। একদিকে যেমন তিনি যবন হরিদাসকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, অপরদিকে শূদ্র রঘুনাথদাসকে ছয় গোস্বামীর অন্তর্ভুক্ত করে জাতপাতের সীমারেখাকে উল্লঙঘন করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। স্মৃতিবিধি লঙঘন করে শূদ্র রঘুনাথদাসকে স্বপূজিত গোবর্ধন শিলা এবং স্বকণ্ঠের গুঞ্জামালা প্রদান করেছিলেন তিনি। শাসনী ব্রাহ্মণ জগন্নাথদাস পুরীতে চৈতন্যদেবের নির্দেশে শূদ্র বলরাম দাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। যা ছিল সেকালে ওড়িশার সামাজিক রীতিনীতির পরিপন্থী। পতিত সুবুদ্ধি রায়ের মুক্তির জন্য কাশীর পণ্ডিতরা যখন তপ্ত ঘৃত পানে প্রাণত্যাগের বিধান দিচ্ছেন তখন মানবতাবাদী চৈতন্যদেব কাশীর

স্মার্ত পণ্ডিতদের অমানবিক বিধানকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র নামগান ও বৈষ্ণবসেবা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেকালে পণ্ডিতদের দুর্লঙ্ঘ বিধানকে অমান্য করা সহজ ছিল না, চৈতন্যদেব সেই অসাধ্যসাধন করে দেখালেন যে, মৃত্যু নয়, জীবনই তাঁর কাম্য। পুরীতে তাঁর একান্ত সেবক ছিল শূদ্র গোবিন্দ, বাসুদেব সার্বভৌমের নিষেধ অমান্য করে তিনি তাকে কোল দিয়েছিলেন। 'ছুঁৎমার্গের তিনি বিরোধী ছিলেন। সে কারণেই আদ্বিজচণ্ডালে প্রেমের আদর্শ প্রচার করে শ্রেণি, গণ ও বর্ণনির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে তিনি সমমর্যাদার অধিকার দেন। আবার ধর্মান্তরিত মুসলমানকেও স্বধর্মে ফিরিয়ে আনেন।'[১৭] আসলে চৈতন্যদেবের প্রখর দূরদৃষ্টি, স্বচ্ছ জীবনবোধ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা এনে দিয়েছিল। জীবন সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অনুধ্যানের ফলে সমাজে শুরু হয়েছিল জনজাগরণ, যাকে চৈতন্য-রেনেসাঁ নামে অভিহিত করা হয়।

চৈতন্যদেব 'ঈশ্বর' ছিলেন কি না, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু মানুষ চৈতন্যদেব যে ঈশ্বরের গুণে গুণান্বিত হয়ে মহামানবের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর সমাজ-ভাবনা, জীবন-দর্শন এবং মানবিক বোধে সঞ্জাত মানব-কল্যাণের নানা দিক নিয়ে আজও চলছে বিরামহীন গবেষণা, তবু আমরা তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। আজও আমাদের সমাজে চলছে ধর্ম নিয়ে হানাহানি, রক্তারক্তি, জাতিবিরোধ, যা চৈতন্য-আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বর্ণভেদ বিরোধী চৈতন্য-নির্দেশিত মত আজও আমাদের পথ দেখাতে পারে।

পাঁচ

মধ্যযুগে সমগ্র মানব-সমাজকে উদ্ধারের স্বপ্ন নিয়ে পথে নেমেছিলেন চৈতন্যদেব, বলেছিলেন, 'উদ্ধারিব সকল ভুবন।' এ কথা বলা সহজ নয়। মানব প্রেমিক চৈতন্যদেব অতি সহজেই মানবাত্মার বাণী শুনিয়েছিলেন আমাদের। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক সুতোয় বাঁধতে চেয়েছিলেন তিনি, বলেছিলেন, 'অখণ্ড ভারত জুড়ির প্রেম নামে'। এ কথা যিনি বলতে পারেন তিনি তো সাধারণ লোক নন, তিনি মহামানব, জগতের ত্রাণকর্তা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের উদ্‌গাতা। আজও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সক্রিয়, আমাদের জন্মভূমিকে খণ্ড-খণ্ড করে দিতে তারা

১৭. *দিবারাত্রির কাব্য*, ৩০.৬.৯৮, পৃ. ২০২

বদ্ধপরিকর। এখানেই চৈতন্যদেব আজও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক।

চৈতন্যদেবের সমাজভাবনা ছিল প্রগতিশীল। তিনি ক্রিয়াকাণ্ডসর্বস্ব সনাতন হিন্দু ধর্মের বিধিবিধানকে স্বীকার করেননি। ধর্মেকর্মে ব্রাহ্মণের একাধিপত্যকে তিনি উৎখাত করেছিলেন। সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সোচ্চার চৈতন্যদেব পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, মৃতদেহ সৎকার, বিবাহের রীতিনীতির নতুন নিয়ম প্রচলন করে সমাজকে সনাতন হিন্দু ধর্মের গণ্ডির বাইরে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তিনি সফলতা অর্জন করেননি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বাইরে সুবৃহৎ হিন্দু সমাজ চৈতন্যদেবের মতকে মান্যতা দেয়নি। অর্থনৈতিক বৈষম্যের যুগে, দরিদ্র সমাজকে ধর্মের নামে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চৈতন্যদেব আজও প্রাসঙ্গিক।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজ আজও সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত হতে পারেনি। গ্রামীণ সমাজ এখনও জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী। ঝাড়ফুঁক-তুকতাক-কবচ-তাবিজের দাপট আজও সমাজকে বিপথে চালিত করে চলেছে। 'জাতের নামে বজ্জাতি' আজও সমাজ থেকে নির্মূল হয়ে যায়নি। মৌলবাদীরা এ যুগেও প্রবলভাবে সক্রিয়। ভাবতে অবাক লাগে আজও হাজার-হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। মানুষের নীতিহীনতা সমাজের অধোগতিকে ত্বরান্বিত করে দিচ্ছে। আগাপাশতলা সর্বত্রই বাসা বেঁধেছে দুর্নীতি। নারীপ্রগতি স্লোগানের পাশাপাশি নারী-নির্যাতন এখনও অব্যাহত। বধূহত্যার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা সমাজজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। প্রতিটি মানুষ এখন আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর এবং ভোগবাদে নিমজ্জিত। আধুনিক সমাজজীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে মনে হতে পারে যে, আমরা এখনও মধ্যযুগেই অনড় রয়েছি। এই জাড্যতা এবং অবক্ষয়কে অতিক্রমণ করতে হলে একালেও চৈতন্যচর্চা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। 'যতদিন মনুষ্যত্বের সংকট থাকবে, ততদিন তাঁর ভাবাদর্শ আমাদের সামনে সামনেই থাকবে। শ্রীচৈতন্যের অবস্থান বাঙালি মনীষার সেই অন্তরতম লোকে—অবিচ্ছেদ্য, গতিময় ও চিরন্তন।'[১৮]

---

১৮. বাঙালী মনীষায় শ্রীচৈতন্য, পৃ. ১৬২
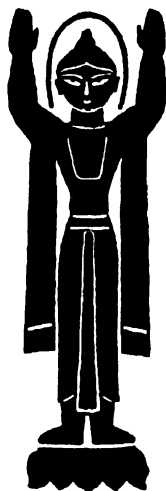
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও চৈতন্যদেব

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই সমাজ-শৃঙ্খলার অজুহাতে সমাজচ্যুত করার প্রবণতা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। সামাজিক নিয়ম অনুসারে একবার পতিত শ্রেণিভুক্ত হলে হিন্দু সমাজ আর তাকে গ্রহণ করত না। অনুদার স্মার্ত পণ্ডিতরা শৃঙ্খলার নামে সমাজের পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, যা সেকালের সমাজকে অন্ধকারের আবর্তে ঠেলে দিয়েছিল। অসংখ্য সমাজচ্যুত মানুষ, অন্ত্যজ উপেক্ষিত মানুষ ইসলামের উদার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিল। 'তখন স্মার্ত পণ্ডিতরা হিন্দুধর্মকে গণতান্ত্রিক না করে আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করলেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য রচিত হল 'নব্যস্মৃতি'। নিম্নবর্গের কথা স্মার্ত পণ্ডিতরা ভাবলেন না। এর ফলে অন্ত্যজ হিন্দুরা অনিবার্যভাবেই ইসলামের উদার ভাবধারায় লালিত হলেন। ফলে হিন্দু ধর্মের ভারসাম্য অনেকটাই শিথিল হয়ে গেল।'[১] হিন্দু সমাজ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল, শক্তিহীন হয়ে পড়ল। সংস্কারাচ্ছন্ন

স্মৃতিকারেরা ছিলেন নির্বিকার, এই সংকট নিরসনের জন্য তাঁরা কোনও নতুন আদর্শ স্থাপন করতে পারেননি। আসলে আত্ম অহংকারে তাঁরা এতটাই মগ্ন ছিলেন যে, প্রকৃত সমস্যার ব্যাপ্তি যে কতটা গভীর তা তাঁরা অনুভব করতেই পারেননি। আজ আর বলতে দ্বিধা নেই যে, তাঁরা ছিলেন কূপমণ্ডুক এবং প্রচলনির্ভর ধারার রক্ষণশীল গোষ্ঠী। নতুন অরুণালোকের উদ্ভাসে সমাজকে উজ্জীবিত করার মতো দূরদর্শিতা তাঁদের ছিল না। সেই বিচারে, চৈতন্যদেব ছিলেন আধুনিক চেতনায় ঋদ্ধ মুক্ত মনের মানুষ। তিনি প্রচলিত সমাজ-শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করে, বেদ-বিধিকে উল্লঙ্ঘন করে মূল সমস্যার শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছিলেন। জাতিভেদ নামক সামাজিক ব্যাধিটিকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য তিনি বলেছিলেন, 'মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাই।' তিনি নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নিজের ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করে সব জাতির মানুষকে এক সরলরেখায় এনে দাঁড় করালেন। সে যুগের প্রেক্ষিতে এ পদক্ষেপ ছিল বৈপ্লবিক।

চৈতন্যদেব যে কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন তা আমরা অনুধাবন করতে পারিনি; তিনি যে কত বড় সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তার প্রকৃত মূল্যায়ন আমরা করিনি; চরণে ফুল-বেলপাতা অর্পণ করে দেবতার আসনে বসিয়ে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করেই আমরা দায়িত্বমুক্ত হতে চেয়েছি। আজকে আমাদের সমাজে একদল মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যে লড়াই করছেন, সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মিটিং-মিছিলে যে সব বক্তৃতা প্রদান করছেন, অধিকার আদায়ের জন্য যে অহিংস মহামিছিল করছেন,—পাঁচশো বছর আগে চৈতন্যদেব সমাজের এইসব সমস্যাকে নির্দিষ্ট করে তা সমাধানের সহজ পথ বাতলে দিয়ে গেছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে তিনি আমাদের মনে ও মননে, শয়নে ও স্বপনে, জীবনে ও মরণে এতটাই স্থান দখল করে আছেন যে, তাঁকে অস্বীকার করি এমন স্পর্ধা আমাদের নেই।

হিন্দু ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সমাজকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে চৈতন্যদেব যে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তা ছিল বাস্তবোচিত। যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-উপাসনাকে উপেক্ষা করে তিনি শুধুমাত্র নামগানের মাধ্যমে জীবের মুক্তির পথ নির্দিষ্ট করে দিলেন। ভক্তিবাদে নামগান অমৃত-সমান। কৃষ্ণনাম গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতবিচারকে অস্বীকার করে চৈতন্যদেব সমাজের সামনে অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এমনকী বিধর্মীদের জন্যও দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। তিনি বললেন, 'চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।' মানবতার আদর্শে দীক্ষিত চৈতন্যদেব মানুষে-মানুষে ভেদরেখার মতো অমানবিক রীতিকে উৎখাত করে সমন্বয়ী

ভাবধারায় গঠিত এমন একটি সংস্কারমুক্ত সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন যার মূল ভিত্তি ছিল মানবপ্রেম। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান—এ তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন বলেই, সব মানুষকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।'—তাঁর এই কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সাম্যবাদের মূলমন্ত্র। তাঁর সমাজভাবনায় মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেখানে কোনও জাত নেই, জাতিভেদ নেই, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির ঘৃণা নেই, উপেক্ষা নেই, ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার নেই, আচার-সর্বস্বতার মতো কুসংস্কারের প্রতিরোধ নেই; শুধু আছে অফুরন্ত প্রেম, মানবপ্রেম। মোটকথা, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' এই একই উচ্চারণের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই জনৈক পাঞ্জাবি সুফি কবির কাব্য-কল্পনায়। তিনি লিখেছেন—

'মসজিদ ঢা দে
মন্দির ঢা দে
ঢা দে যো কুছ ঢেন্দা।
ইক্ কীসে দিল না ঢাভেন্
রব দিলোঁ বীচ রহন্দা।' [২]

অনুঃ মসজিদ ভেঙে দাও, মন্দির ভেঙে দাও। যা কিছু আছে সব ভেঙে দাও। কিন্তু কখনও মানুষের হৃদয় ভেঙে দিও না। ওখানেই তো থাকেন ঈশ্বর।

চৈতন্যদেবের জীবন এবং তাঁর সমাজভাবনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে আমরা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে মানবতাবাদের উজ্জ্বল আদর্শটিকে খুঁজে পাই। এই মানবিক সত্তার পূর্ণ বিকাশের ফলেই মানুষ চৈতন্যদেব দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে আছেন।

দুই

ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষরাও যে ঈশ্বরের সন্তান—এ বিশ্বাসে অটল ছিলেন চৈতন্যদেব। বিধর্মীর স্পর্শজনিত দোষে জাত পাতের অনুশাসনকে তিনি স্বীকার

২. 'সরদারজি'—তরুণকুমার ভাদুড়ী, দেশ, শারদীয়া ১৪০৪, পৃ. ৩০২
বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি—রমাকান্ত চক্রবর্তী, পৃ. ২৬

করেননি। যবন হরিদাসকে বৈষ্ণব সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করে সেকালের আচার-বিচারসর্বস্ব সমাজপতিদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। যে দুজন শ্রেষ্ঠ পরিকরকে নগরে নাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একজন ছিলেন হরিদাস। কাজিদলনের দিন চৈতন্যদেব নগর সংকীর্তনের দলকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন। সর্বাগ্রে গমনরত প্রথম বিভাগটির দায়িত্ব দিয়েছিলেন হরিদাসকে (চৈ.চ.)। নীলাচলে হরিদাসের মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ কোলে নিয়ে চৈতন্যদেব নৃত্য করেছিলেন এবং মৃতদেহ সমাহিত করে ফিরে এসে ভিক্ষালব্ধ অন্নে মহোৎসব করেছিলেন। সে যুগের প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ ছিল উদার ও সাম্যবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানেই তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রোচিষ্ণু অধ্যায়টি সে কালের রক্ষণশীল সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর হৃদয়বত্তা, দূরদর্শিতা, মানবিকতা এবং জীবনবোধ সমাজকে নতুন আদর্শে দীক্ষিত করেছিল। জীবনকে তিনি ভালবেসেছিলেন বলেই পতিত সুবুদ্ধি রায়কে মৃত্যুর পরিবর্তে জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। যবন-সংস্পর্শে জাতিনাশের বিধান যে অবান্তর, চৈতন্যদেব তা প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং মানবিক জীবনবোধের প্রতি সীমাহীন আস্থার স্পষ্ট ছবিটি আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

সংস্কারকে তিনি স্বীকার করেননি। ছোটবেলা থেকেই বন্ধনকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের অসপত্ন অধিকারকে তিনি মান্যতা দেননি। আর তা দেননি বলেই পুজা-উপচারের আড়ম্বর থেকে ভক্তদের মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। বৈষ্ণব-ঐতিহ্য অনুসারে ভক্তরা নিজেরাই কৃষ্ণের আরাধনা করার অধিকারী— এ জন্য ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বীকৃত হয়নি। এখানেই ফুটে উঠেছে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এবং অনিঃশেষ প্রত্যয়ে পূর্ণ এক অনির্বাণ চরিত্র—যা কুসংস্কারকে ভেঙে খণ্ড-খণ্ড করে দিতে পারে, গড়ে তুলতে পারে নতুন সমাজ। এখানেই শেষ নয়, জাতপাতের পরিচয়জ্ঞাপক পদবির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে সকল মানুষকে ঈশ্বরের দাস হিসেবে প্রতিপন্ন করার অভিধায় 'দাস' পদবি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। এর ফলে সমাজে বর্ণভেদ প্রথা কিছুটা হলেও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। আসলে চৈতন্যদেব এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে মানুষে-মানুষে কোনও ভেদ থাকবে না, জাতের নামে কোনও বজ্জাতি থাকবে না, ধর্মের নামে কোনও শোষণ থাকবে না। সমাজে প্রতিটি মানুষের অধিকার থাকবে সমান, মর্যাদা থাকবে সমান। মানবাত্মার অপমানের ফলে এতদিন যে অবক্ষয় সমাজকে গ্রাস করছিল, তা থেকে মুক্তির স্বাদ এনে দেবে এই সমাজ।

চৈতন্যদেবের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি ঠিকই, তবে সেদিন তিনি যে আঘাত হেনেছিলেন, তা সমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর কঠিন হৃদয়ে কম্পন তুলেছিল। আজকের সমাজে উদারতার যেটুকু আভাস পাওয়া যায়, তার সবটুকুই যে চৈতন্য-আন্দোলনের অবদান, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বলেছেন, '...There rose the greatest reformer that Bengal or India, has ever produced, the prophet of Love (Bhakti), Lord Chaitanya, who would have no distinction between man and man, or between man and woman, who treated the Brahmin, the Chandal and the Moslem alike, and enfranchised our women from the bonds of enforced widowhood.'[৩]

নবদ্বীপ লীলায় চৈতন্যদেব সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রান্তিক শ্রমজীবী সমাজের অন্ত্যজ মানুষজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। সে যুগের সামাজিক প্রেক্ষিতে এ কাজ ছিল গর্হিত। বৈষ্ণবীয় আদর্শে দীক্ষিত হওয়ার আগেই একদিন টোলের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে 'শূদ্র' শ্রেণিভুক্ত মানুষজনের বাড়িতে গিয়ে তাদের মান্যতা দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। অচলায়তনকে ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। উপেক্ষিত-লাঞ্ছিত-ব্রাত্য জনগণ চৈতন্যদেবের মতো শিষ্টবর্গীয় সমাজের একজন প্রতিনিধিকে লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করে তথাকথিত অশুচি ভূমিতে পদার্পণ করতে দেখে উল্লসিত হয়েছিল। তাঁতি-গোয়ালা-মালাকার-তাম্বুলি-গন্ধবণিক-শঙ্খবণিকের ঘরে সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবেশ করেছিল এক অনাস্বাদিত জীবনবোধ, যা ছিল আত্মিক চেতনার রসে সমৃদ্ধ। জনসংযোগের এই অধ্যায়টি আন্তরিকতার রসে পূর্ণ ছিল বলেই গোপেরা চৈতন্যদেবকে বলতে পেরেছিল, 'চল মামা ভাত খাই'। শিষ্টবর্গীয় সমাজের একজন প্রতিনিধিকে শূদ্র-বাড়িতে অন্নগ্রহণের আহ্বান জানানোর মধ্যে রয়েছে হার্দিক সম্পর্কের সুবর্ণ অধ্যায়, যা পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের প্রতিস্পর্ধী ধর্মীয় আন্দোলনকে পূর্ণতা দিয়েছিল। খোলাবেচা শ্রীধরদাস শূদ্র ছিলেন। কাজিদলনের দিন শ্রীধরের গৃহে জল পান করে তিনি সনাতন হিন্দু ধর্মের অসারতার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। চৈতন্যদেবের এই নতুন আদর্শ ব্রাত্য সমাজ-জীবনে অমৃতের স্বাদ এনে দিল। 'তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ যে অনাস্বাদিত এক মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কেন না মহাপ্রভু তাঁদের দিলেন কঠোর ও অবোধ্য শাস্ত্রাচারের দাসত্বের পরিবর্তে সহজ, স্বাধীন ও আনন্দময়

৩. A Nation in Making—Surendranath Banerjee, P-101

ধর্মজীবন। জাতিভেদজনিত হীনমন্যতা বর্জন করে সমাজে মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাত্রার সুযোগ পেলেন তাঁরা।'[৪]

অদ্বৈত আচার্য নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন ঠিকই, তবুও তাঁর হৃদয়ে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল মানবতাবাদের আদর্শ। আর তা ছিল বলেই হরিদাসের মতো বিধর্মীকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা প্রদান করে এক যুগান্তকারী আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। শান্তিপুরে আয়োজিত অন্নকূট উৎসবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে ভোজন করে চৈতন্যদেব সামাজিক জাড্যতাকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন।[৫] তিনি তা পেরেছিলেন বলেই কবি বলেছেন, 'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।' চৈতন্য-পরিকর নিত্যানন্দের জাত্যভিমান ছিল না, তিনি উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। পানিহাটিতে চিঁড়ামহোৎসবে সব বর্ণের মানুষকে এক পঙ্ক্তিতে ভোজন করিয়ে তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মপ্রচারের কালে নিত্যানন্দ শূদ্র-বাড়িতে থাকতেন, তাদের হাতে অন্নগ্রহণ করতেন। এইভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিবাদী চরিত্রটি শক্ত ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তিন

চৈতন্যদেব ছিলেন প্রতিবাদী ভাবনার মূর্ত প্রতীক। সনাতন হিন্দু ধর্মের আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, জাতপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রূপ-সনাতনের মতো পতিত ব্রাহ্মণকে তিনি কৃপা করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, বৃন্দাবনে অবস্থান কালে তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং ষড়গোস্বামীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে কালীগঞ্জের নবাবের পোষ্যপুত্র[৬] বিজুলি খাঁ এবং তাঁর সঙ্গী একজন পিরকে উদ্ধার করেছিলেন চৈতন্যদেব। পরবর্তীকালে পির রামদাস নামে খ্যাত হয়েছিলেন আর বিজুলি খাঁ কালীগঞ্জের নবাব পদে আসীন হওয়ার পরেও পরম ভাগবত হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন, এ ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য।[৭]

৪. বাঙালি মনীষায় শ্রীচৈতন্য—নির্মলনারায়ণ গুপ্ত সম্পাদিত, পৃ. ১৫২
৫. অদ্বৈত মঙ্গল—ঈশান নাগর, পৃ. ৩২-৬৭
৬. Elliot's History of India, Vol. I, P-333
৭. প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৮

নীলাচলে অবস্থানকালে চৈতন্যদেবের সংস্কার আন্দোলন সমগ্র ওড়িশাতে প্রসার লাভ করেছিল। জগন্নাথক্ষেত্রের শাসনী ব্রাহ্মণ জগন্নাথদাস চৈতন্যদেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে, তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন এবং শূদ্র বলরামদাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাটি ঘটল, সেটি হল, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল যে দার্শনিক তত্ত্ব, যাকে আমরা সাধ্য-সাধন তত্ত্ব বলে জানি, এর বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন শূদ্র রায় রামানন্দের মুখ দিয়ে। এর মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, চৈতন্যদেব প্রতি পদক্ষেপে বন্ধনকে খণ্ডন করার জন্যে দুর্বার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী ছিলেন শূদ্র, ধনী জমিদার-পুত্র। অর্থ, প্রতিপত্তি এবং সুন্দরী স্ত্রীর আকর্ষণ ত্যাগ করে চৈতন্যচরণে ভক্তিমান হয়েছিলেন। স্মৃতিবিধি লঙঘন করে চৈতন্যদেব স্বপূজিত গোবর্ধন শিলা এবং স্বকণ্ঠের গুঞ্জামালা উপহার দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, শূদ্র রঘুনাথদাসকে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্তর্ভুক্ত করে তিনি বর্ণভেদের সীমারেখাকে ভেঙে দিয়েছিলেন। যতদিন তিনি প্রকট ছিলেন ততদিন তাঁর এই সংস্কার প্রথা অব্যাহত ছিল। ভক্তিহীন আচার-বিচারসর্বস্ব সমাজকে ভেঙে তিনি এক মুক্ত সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন।

চার

প্রাচীন ভারতে বর্ণভেদ প্রথার অস্তিত্ব ছিল না। বেদ নামক প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে বর্ণভেদ নামক কুপ্রথার কোনও উল্লেখ নেই বলেই ধরা হয়। তবে ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে বর্ণভেদের যে ইঙ্গিত আছে পণ্ডিতরা তাকে প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করেন। ঋক ও সামবেদে তিনটি বর্ণের অস্তিত্ব উপলব্ধ হলেও 'শূদ্র' বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় যজুর্বেদে। 'শূদ্র' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। গোপাল হালদার মনে করেছেন যে, বিজিত অনার্য জনেরাই আর্য সাহিত্যে 'শূদ্র' অভিধায় ভূষিত হয়েছিল।[৭ক] পরবর্তীকালে মনু বললেন, 'একজন শূদ্র ক্রীত হোক বা অক্রীত হোক তাকে হীন কাজ করার জন্য বাধ্য করা যেতে পারে, কারণ ব্রাহ্মণের দাসত্ব করবার জন্যই স্বয়ম্ভু কর্তৃক সে সৃষ্ট হয়েছিল।' একজন বিশিষ্ট গবেষক মনু সংহিতাকে ব্রাহ্মণ্যশক্তির হিটলারি দাপট বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'ব্লাড থিওরি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর শাসক-শ্রেণির যাবতীয় উৎকট অধিকারের দাবি এবং শূদ্রের

৭ক. সংস্কৃতি রূপান্তর—গোপাল হালদার, ৩য় সং, পৃ. ১৫৬

বিরুদ্ধে জেহাদ, ঘৃণা, অবজ্ঞা—মনু মহারাজের পাতায়। ইহাই First code of Law of Fascism.'[৭খ] সামন্ততন্ত্রে এই শূদ্ররাই ছিল প্রান্তিক শ্রমজীবী শ্রেণির উৎপাদক। ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে, রাষ্ট্রীয় বিধানের নামে অমানবিক উৎপীড়ন চালিয়ে উৎপাদক জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াস শুরু হয়েছিল সেদিন। এখান থেকেই সমাজে ভেদরেখা প্রবল হয়ে উঠল। ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ মনুর বিধানে উচ্চ-নীচ অভিধায় বিভাজিত হয়ে গেল। সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট হল, মানবতার আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হল। স্মার্ত জীমূতবাহন আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে অব্রাহ্মণ সমাজের সকলকেই শূদ্র রূপে চিহ্নিত করলেন। ব্রাহ্মণেরা সমাজে মর্যাদার আসনে সমাসীন হলেন। আর শূদ্র সমাজ ঘৃণিত জাতি হিসেবে সমাজের এক কোনায় পড়ে রইল। মুখ বুজে শিষ্টবর্গের সেবা করাই তাদের কর্তব্যকর্ম হিসেবে নির্দিষ্ট হল। বেদ পাঠে তাদের কোনও অধিকার রইল না। শিক্ষাদীক্ষার প্রাঙ্গণ থেকে ক্রমশ তারা দূরে সরে গেল। এইভাবে সমাজের এক বৃহত্তর অংশকে দূরে সরিয়ে রেখে উচ্চবর্ণের একদল মানুষ সমাজের সাবলীল অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এই সামাজিক সমস্যাকে আবিষ্কার করেই চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। আর তা হয়েছিলেন বলেই পরবর্তীকালে এই ধারাটিকে অব্যাহত দেখতে পাই উত্তরসূরিদের কর্মধারায়।

এখানে একটি কথা স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, চৈতন্য মতানুসারী হওয়া সত্ত্বেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের স্মৃতিকার গোপালভট্ট গোস্বামী রক্ষণশীল ছিলেন। চৈতন্যদেব যেখানে ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, গোপালভট্ট সেখানে ব্রাহ্মণকে শূদ্রান্ন গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। চণ্ডালদর্শনজাত পাপ স্খালন করতে শিষ্টবর্গীয়দের সূর্য দর্শন করতে হবে বলে জানিয়েছেন।[৮] নতুন করে বর্ণভেদের বিড়ম্বনা বৈষ্ণব-সমাজকেও উদ্বিগ্ন করে তোলে। বৈষ্ণব ধর্মে আবার ব্রাহ্মণ্যবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। লোকধর্মের উদ্ভব হয় এইভাবেই। আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি সহজিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে বৈষ্ণব ধর্মের ছাদনাতলায়। 'বৃন্দাবনের দক্ষিণপন্থী গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, অন্যদিকে কিন্তু আন্দোলন ক্রমশই তার

৭খ. তদেব, ১৫৮

৮. শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস—গোপালভট্ট গোস্বামী, পৃ. ১৩৮৭

বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম—রমাকান্ত চক্রবর্তী, পৃ. ৭২

সামাজিক ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। আর পূর্ব ভারতে বামপন্থী বৈষ্ণব পদাতিকেরা ক্রমশই সহজিয়াতে, আউলে-বাউলে, বৈরাগী-বোষ্টমে, নেড়া-নেড়িতে পরিণত হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ।'[৮ক] বাউল সম্প্রদায়ের স্রষ্টা লালন বর্ণভেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বলেন—

'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে?
লালন বলে জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।
কেউ মালা কেউ তসবি গলে
তাই তো রে জাত ভিন্ন বলে;
যাওয়া কিংবা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কারে?
সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কী হয় বিধান?
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ
বামনি চিনি কী প্রকারে?'

বাউলরা চৈতন্যদেবকেই গুরু হিসেবে মান্যতা দেয়। কিন্তু তোতা রামদাস বাবাজি আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, ভেকধারী জাত বোষ্টম সম্প্রদায়ের তেরোটি গোষ্ঠীকে বৈষ্ণব হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। কেউ-কেউ বলেন এরা বৌদ্ধ ধর্মের নেড়ানেড়ি সম্প্রদায়ের ভ্রষ্টাচারী গোষ্ঠীর অবশিষ্টাংশ। এ মত নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কারণ, বাউল বলতে যে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে বোঝায় তা কিন্তু নয়, বহু মুসলমানকেও আমরা বাউল-ফকির হিসেবে দেখতে পাই। এখানে একটা কথা প্রণিধানযোগ্য যে, বীরচন্দ্র প্রভু যে সকল নেড়ানেড়িকে বৈষ্ণব ধর্মে স্থান করে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ ফকির ছিল না। ফকিরেরা কোরান-বিরোধী, ইসলাম ঐতিহ্যের প্রতিবাদী ধারা।

বৈষ্ণবেরা জাতিভেদ স্বীকার করে না। ছত্রিশ জাতের সঙ্গে একাসনে বসে অন্নগ্রহণ করে। এতে উচ্চবর্ণের সমাজপতিরা যে কতটা ক্ষুব্ধ ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজসভায় রচিত শাক্ত-কবি রামপ্রসাদ সেনের কবিতায় তা ধরা পড়েছে, তিনি লিখেছেন—

৮ক. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান—অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ২৭৩

'বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়।।
কেমন কলির ধর্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝি।।'

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেও বৈষ্ণব সমাজে বর্ণভেদ প্রথা স্বীকৃত ছিল না। অর্থাৎ গোপালভট্ট গোস্বামী রচিত 'হরিভক্তিবিলাস'-এর নির্দেশ তথাকথিত বৈষ্ণব সমাজে মান্যতা পায়নি। সমাজের সহজ-সরল অন্ত্যজ জনেরা চৈতন্যদেবের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রেমের সমুদ্রে অবগাহন করেছিল, তারা খোলা মনে বন্ধনহীন কীর্তনের আসরে যোগ দিয়েছিল, সাধনভজন বলতে তারা নামগানকেই পবিত্র মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে সায়ংপ্রাতে তা উচ্চারণ করেছিল, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দার্শনিক আদর্শের জ্ঞানগর্ভ বিচার-বিশ্লেষণ নিয়ে তারা কোনওদিন চর্চা করেনি, আর তা করা তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তাই নিম্নবর্ণের ভক্তমণ্ডলীর কাছে সংস্কৃতে রচিত স্মৃতিগ্রন্থ কোনওদিনই সমাদর লাভ করেনি। উচ্চবর্ণের ভক্তদের কাছেও যে সবক্ষেত্রে তা গৃহীত হয়েছিল, এমন কথা বলা যাবে না। তা যদি হত তা হলে খেতুরির রাজপুত্র কায়স্থ নরোত্তম দত্ত এবং মেদিনীপুরের ধারেন্দা-বাহাদুরপুরের সদগোপ শ্যামানন্দ 'ব্রাহ্মণ' রূপে পরিচিত হতে পারতেন না। শ্যামানন্দ উপবীত ধারণ করতেন, তাঁর অনেক মুসলমান ও ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। পাঠান শাসক শের খাঁ তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন।[১] তবে একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবেরা 'হরিভক্তিবিলাস'-কে যথেষ্ট মান্যতা দিতেন। আর সে জন্যেই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, অথচ বৈষ্ণব-চণ্ডালের সঙ্গে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্কের একটি প্রমাণও আমাদের হাতে নেই। এখানেই চৈতন্যদেবের উদার মানবিকতার ঐকান্তিক প্রয়াসের পথ অনিবার্যভাবে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

চৈতন্যদেবের সংস্কার উদ্যোগ সমাজকে যেভাবে উদ্বেলিত করেছিল, বৈষ্ণব ধর্মে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে তা আবার কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল, একে চৈতন্যাবদানের গোধূলি পর্যায় বলে চিহ্নিত করা যায়। 'মূল চৈতন্য আন্দোলনের প্রস্তাবনা কিন্তু এতটা ব্রাহ্মণ-সংকুল হওয়ার কথা ছিল না। চণ্ডালকেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ উচ্চারণের যে বলিষ্ঠতা এ আন্দোলনকে মানবিক বিপ্লবের উচ্চতল স্পর্শ করার অঙ্গীকার

১. তদেব, ১০৪-০৫

করেছিল তা পরে ভ্রষ্ট হয়। বৈষ্ণবরা হয়ে পড়েন নৈষ্ঠিক উপবীতধারী। কালক্রমে বৈষ্ণবদের অবহেলিত ও নিম্নবর্গীয় অংশের নাম হয় 'জাত বৈষ্ণব'।'[৯ক] এতদ্‌সত্ত্বেও চৈতন্যদেবের সমন্বয়বাদী মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে বাঘনাপাড়ার বিগ্রহকে বছরে একটি দিন ইসলামি পোশাকে সজ্জিত করা হয়।[১০] এইভাবেই বৈষ্ণবধর্মের লোকায়ত চরিত্রটি জনসমাজে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মানবিক আবেদন এতটাই গভীর ছিল যে, মুসলমান সমাজেও তা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে মাহেশের শ্রীপাটকে ১১৬৫ বিঘা জমি দান করেন ঢাকার নবাব ওয়ালিস খাঁ।[১১] ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর শিষ্য গোপালদাসকে ২০০ বিঘা জমি দান করেন সম্রাট আকবর।[১২] এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান ভূস্বামীগণও বৈষ্ণব ধর্মের উদারতার আহ্বানে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শুধু ভূমি দান করেই তাঁরা ক্ষান্ত ছিলেন না, সম্রাট আকবর তো গৌরাঙ্গ বিষয়ক একটি সংগীত রচনা করে বৈষ্ণবীয় ভাবধারাকে মনেপ্রাণে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী।।' গানটি গৌরপদতরঙ্গিণীতে ধৃত আছে। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি আলি রাজা লিখেছেন—

বৈষ্ণব সবের বন্ধু
সাবানের প্রেমসিন্ধু
ফকির আনন্দ সরোবর।।' [১৩]

জাতিতত্ত্বের ঊর্ধ্বে বৈষ্ণব ধর্মের সার্বিক আবেদনের মনোহর রূপটি আলি রাজার গানে স্পষ্টীকৃত হয়েছে। 'কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।'— চৈতন্যদেবের এ মত এখানে যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করে সমগ্র মানবজাতির কোমল হৃদয়কে রসসিক্ত করে তুলেছে। এক ফকিরের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে সেই সমন্বয়ের সুর—

৯ক. 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও উপ-সম্প্রদায়'—সুধীর চক্রবর্তী, প্রবন্ধ-চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ২২৩

১০. বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবসাহিত্য—ড. কাননবিহারী গোস্বামী, পৃ. ৫৯

১১. বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, পৃ. ১০২

১২. নিজপ্রিয়স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৮০-৮১
বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, পৃ. ৭৩

১৩. জ্ঞানসাগর—আলি রাজা, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত, পৃ. ২৯

'ফকির বলেন তেরা জাতি নাহি যাবে।
রাম রহিম এ সংসারে একই জানিবে।।
ফকির বলেন তুমি মুদ দুটি চোখ।
রাধাকৃষ্ণ দুই রূপ দেখিবে প্রত্যক্ষ।।' [১৪]

বাংলায় ১০২ জন মুসলমান কবি বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় পদ রচনা করে চৈতন্যদেবের সমন্বয়ী-স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তুলেছেন।[১৫] বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন চৈতন্যদেব, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। পরিশেষে একটি কথা বলা যায় যে, চৈতন্যদেবের আদর্শ আজও আমাদের পথ দেখাতে পারে। মানুষকে ছোট ভাবা, হীন ভাবা, নীচ ভাবা যে অপরাধ চৈতন্যদেব বারবার একথা বলেছেন, কারণ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। তাঁর রচিত একটি শ্লোক এ ব্যাপারে আমাদের পথ নির্দেশ দিতে পারে—

'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপিবৈশ্যো ন শূদ্রো,
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রদ্যোন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্জে—
গোপীভুর্তঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।।' [১৬]

অনুবাদ—আমি ব্রাহ্মণ নই, নরপতি নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী নই। কিন্তু সমুচ্ছলিত পরমানন্দের প্রকাশমান নিখিলে অমৃতসমুদ্র স্বরূপ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসগণের দাসানুদাস।

মনুষ্যনির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে চৈতন্যদেব নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাননি। মুক্ত বিহঙ্গের মতো মানবাত্মার স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। জাতিবর্ণনির্বিশেষে নিখিল বিশ্বের সব মানুষের মধ্যে যে সেতু তিনি নির্মাণ করেছিলেন, তার ভিত্তি ছিল মানবতাবাদের উদাত্ত বাণী, যা আমাদের সমাজকে নতুন আদর্শে দীক্ষিত করেছিল।

১৪. রামেশ্বর রচনাবলী—পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ. ৪৩
১৫. বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।
১৬. পদ্যাবল্যাম্—শ্রীরূপগোস্বামী, নং ৭৪

পরিশিষ্ট
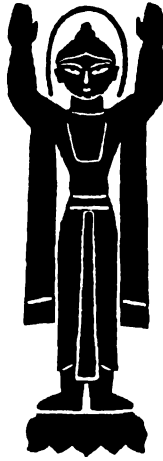
বৈষ্ণবধর্মের আদিপর্ব

প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্য-ঋষিদের মধ্যে যে জ্ঞান ও মনীষার উন্মেষ ঘটেছিল, যে দার্শনিক চেতনার সার্বিক বিকাশ ঘটেছিল, যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিস্ময়কর উদ্ভাস ঘটেছিল, সত্যিই তা ছিল অভাবনীয়। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ঋষিদের কল্যাণকর অবদানের কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আর্য-ঋষিদের কাছে প্রাপ্ত বৈদিক-সাহিত্য আমাদের পরম প্রাপ্তি। 'বেদ' সে যুগের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির রূপরেখা সংবলিত এক বিস্ময়কর গ্রন্থ। ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতাদের সঙ্গে ইরানীয় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার অদ্ভুত সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের ধারণা, প্রাচীন ইরানীয় ধর্ম এবং ভারতের বৈদিক ধর্মের মধ্যে সার্বিক ঐক্য ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে জরথুস্ট্র ইরানে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ঋগ্বেদের বরুণ (অহুর-মজদা) ইরানীয় ধর্মে দেবরাজ অভিধায় সম্মানিত। মিত্র অর্থে সূর্যদেব, ইনি বরুণের চক্ষুরূপে কল্পিত, ইরানীয় আবেস্তায় এঁকে বলা হয়েছে মিথ্র। জলের দেবতা আপঃ, স্পষ্টভাবেই আবেস্তায় আপো নামে বর্ণিত হয়েছে। অগ্নির পরেই যে দেবতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি হচ্ছেন সোম,

ইনি মদ্য উৎপাদনের দেবতা। ইরানীয় আবেস্তায় এই দেবতাটি 'হত্তম' নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে বৈদিক যুগের বিন্যাসের অবশ্যই পার্থক্য ছিল। সেযুগে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান বা পারস্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের নৈকট্য ছিল নিবিড়।[১] ইরানীয় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং বেদের দেবদেবী কল্পনা, সামাজিক রীতিনীতির প্রয়োগ এবং পরিভাষা ব্যবহারে সীমাহীন সামঞ্জস্য এ ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করে। আবেস্তা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের রচনা মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী আর্যদের প্রশংসনীয় অবদান হিসেবে স্বীকার করা যেতে পারে। ভাষার নৈকট্য এ ধারণাকে স্পষ্টীকৃত করে যে, সে যুগে মধ্যপ্রাচ্যে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার প্রচলন ছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইরানীয় সংস্কৃতির আদানপ্রদান ছিল অব্যাহত। জান্দ-এ-শাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের শূন্যবাদ, একেশ্বরবাদ, সংখ্যাতত্ত্ব, ঈশাইতত্ত্ব, গ্রিক-রোমান দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।[২] সৃষ্টিতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের পাশাপাশি ধ্রুপদ সংগীতধারার জন্ম যেমন হয়েছিল ইরানে-ইরাকে-ইয়েমেনে[৩] তেমনি কান্তা প্রেমেরও উদ্ভব হয়েছিল এই অঞ্চলেই,[৪] আর্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে। ভারতীয় আর্যগণ ও প্রাচীন ইরানীয়দের পূর্বপুরুষ যে একই জনগোষ্ঠীর দুটি শাখা, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের সাদৃশ্য থেকে ইতিহাসবেত্তারা তা স্বীকার করেছেন।[৫]

কৃষ্ণ জন্মেছিলেন বৃন্দাবনে, যদুবংশে। ইনি বসুদেব ও দেবকীনন্দন, পাষণ্ডী সংহারক, ধর্ম সংস্থাপক এবং গোপীজনবল্লভ। যদুবংশের উৎপত্তির ইতিহাস আভীর জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভারতকোষকারের মতে,

১. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ. ৮০

২. সুফি মতের উৎস সন্ধানে—পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩১
নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত—মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯

৩. The Eighteenth Century in India—Suniti Kumar Chatterjee in Muhammad Shahidullah Felicilation Volume, ed, Muhammad Eumul Hag. Dacca, P-135.
জরথুষ্টধর্ম—যোগীরাজ বসু, পৃ. ৬,

৪. জরথুষ্টধর্ম, পৃ. ১

৫. Islamic Mysticism in Iran and India—Suniti Kumar Chatterjee, সুফি মতের উৎস সন্ধানে—পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, পৃ. ১৮

আভীর জাতি মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে প্রবেশ করে প্রথমে পাঞ্জাব, রাজপুতনা ও সিন্ধু উপত্যকার নিম্নাঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে।[৬] খ্রিস্ট-জন্মের পূর্বেই পশ্চিম ভারতে আভীর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রিকদেশীয় ভূগোলবিদ টলেমি এবং পেরিপ্লাসের বিবরণীতে আভীর জাতির বাসভূমিকে আবেরিয়া বলা হয়েছে।[৭] এই আবেরিয়ার অবস্থান যে সৌরাষ্ট্রের উত্তরে সিন্ধু উপত্যকার দ্বীপাঞ্চল, উক্ত বিবরণী থেকে তা স্পষ্টীকৃত হয়েছে।[৮] Robert Shafer বলেছেন যে, মহাভারতে যদুবংশের উত্তরপুরুষরা ছিলেন ইরানীয়।[৯] রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথাতেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'The Abhirs appear to have been a foreign people, who entered India shortly before or along with the sakas from some part of eastern Iran.'[১০]

আভীররা একটি যাযাবর গোপজাতি, গোচারণ ছিল এদের পেশা। গরুর খাবারের খোঁজে এরা স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াত। রামায়ণে এদের উগ্রদর্শন দস্যু বলা হয়েছে।[১১] মহাভারতে এই জাতিকে ম্লেচ্ছ, লুব্ধচিত্ত, দস্যু এবং পাপকর্মা বলা হয়েছে।[১২] মহাভারত, রামায়ণ, হরিবংশ, ভাগবতপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা, পাতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে আভীর জাতির উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। মহাভারতের মতে, আভীরগণ ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু আচারাদি সঠিকভাবে পালন না করায় শূদ্র পদবাচ্য হয়। পাতঞ্জলির মহাভাষ্যে এদের শূদ্র বলা হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ আভীরদের ম্লেচ্ছ অভিধায় বিশেষিত করেছেন। যাযাবর আভীরজনেরা ক্রমশ তাপ্তী নদীর মোহনা এবং কঙ্কণ উপকূলে বিস্তার লাভ করে মধ্য ভারত, দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতেও তারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ড. সতী ঘোষ লিখেছেন যে,

৬. ভারতকোষ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০৯

৭. ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী—ড. সতী ঘোষ, পৃ. ১৪৮-৪৯

৮. The Abhiras : their History and Culture—Suryavanshi Bhagwan Singh, Baroda, M. S. University, 1962.

৯. Ethnography of Ancient India—Robert Shafer, Wiesbaden, 1954.

১০. The Age of Imperial Unity—R. C. Majumdar, Bombay, 1951.

১১. 'উগ্রদর্শন কর্ম্মণো বহব স্তত্রে দস্যবঃ
আভীরপ্রমুখাঃ পাপাঃ পিবন্তি সলিলং মম।' রামায়ণ

১২. মহাভারত, মৌসল পর্ব, ৮ম অধ্যায়

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এমনকী বাংলাদেশেও যে সমস্ত আভীর জনগোষ্ঠীর উত্তরসূরিদের দেখা যায়, তাদের বিশ্বাস মথুরাই ছিল তাদের আদি বাসস্থান।[১৩]

আভীরগণ ক্রমশ যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ভারতীয় জাতিসমূহের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠলেও আভীরগণ নিজস্ব সংস্কৃতি ও সংস্কার রক্ষায় সচেষ্ট ছিল। এদের উন্নত সাংগীতিক ধারা 'আহিরী' ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'মনে হয়, ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতগুলি রাখালিয়া-গান রূপে ছড়াইয়া ছিল। চপল আভীর বধূগণ এবং নবযৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর গোপ যুবক কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা জোগাইয়াছিল। গান-ছড়ার মাধ্যমেই হয়তো এগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচার লাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা আস্তে-আস্তে পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়া কবি কল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।'[১৪]

কৃষ্ণলীলা ছিল আভীর জাতির নিজস্ব সম্পদ। ভাগবতপুরাণ রচনার পর ক্রমশ তা সর্বসাধারণের বস্তুতে পরিণত হল। কৃষ্ণের প্রেমসংগীতের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি ঈশ্বর সাধনার মন্ত্র হয়ে উঠল। কৃষ্ণ হলেন এই ধর্মের প্রধান দেবতা। পর পৃষ্ঠায় কৃষ্ণের একটি বংশতালিকা দেওয়া হল।

বৈষ্ণব ধর্মের সার্বিক প্রসারণ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দীতে। নাসিকের প্রস্তরলিপি (২৫০ খ্রি.) থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে সামন্ত রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে, এই সুযোগে আভীর দলপতি ঈশ্বরসেন সেখানে রাজত্ব স্থাপন করেন।[১৫] খ্রিস্ট-জন্মের অনেক আগে থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষে কৃষ্ণের উপাসনা সূচিত হয়েছিল। গ্রিক লেখক মেগাস্থিনিস খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভাগবত ধর্মের প্রচলন দেখেছিলেন এদেশে। মথুরা ও বৃন্দাবন (কৃষ্ণপুর) যে এই ধর্মের উদ্ভবক্ষেত্র তা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, দক্ষিণ

১৩. ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ১৪৪

১৪. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ. ১২০

১৫. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা—সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৯
ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃ. ২৩২

ভাগবতের নবম স্কন্ধ অনুসরণে কৃষ্ণের একটি বংশতালিকা প্রস্তুত করা হল—
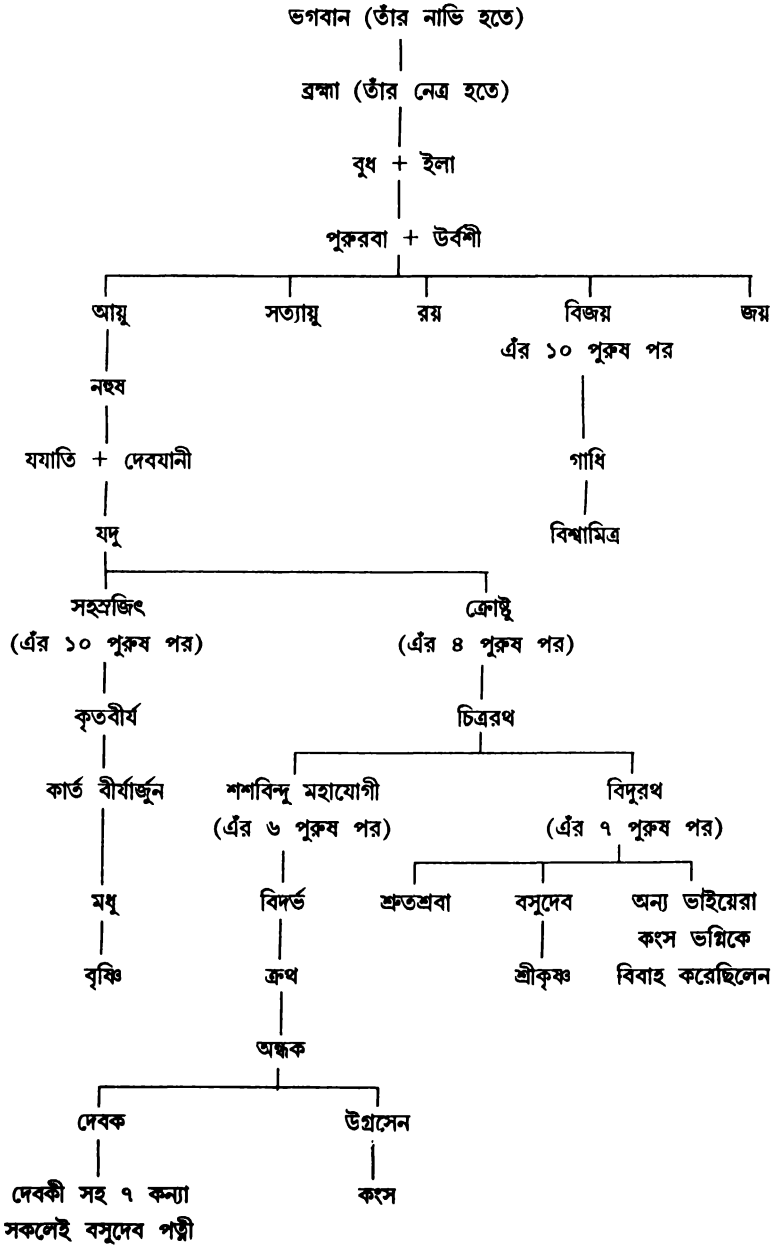
ভারতের পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানীর নামও মথুরা, যা স্থানীয় উচ্চারণে মাদুরা নামে পরিচিতি লাভ করেছে।[১৬] খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হেলিওডোরাস নামে একজন গ্রিক রাষ্ট্রদূত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।[১৭] ভগবান বাসুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বেসনগরে একটি গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠা করেন। বেসনগর স্তম্ভলিপিটি বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৈষ্ণব নিদর্শনের মধ্যে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এই লিপিটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

বিষ্ণু বৈদিক দেবতা। ঋগ্বেদে বিষ্ণু সম্পর্কে অনেক মন্ত্র আছে। সূর্যদেবের সঙ্গে বিষ্ণুকে অভিন্ন কল্পনা করা হয়েছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, এক কথায় এই মহাবিশ্বের সর্বত্রই বিষ্ণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন বৈদিক ঋষিরা। বিষ্ণুর এই ব্যাপমানতা জগতে ব্যক্তীকৃত সকল বস্তুতে প্রসার্যমান। বিষ্ণুর উপাসকেরা বৈষ্ণব। 'বৈষ্ণব' শব্দটি সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয় মহাভারতে। বিষ্ণুর আধিপত্য যখন সর্বব্যাপী তখন অবৈদিক দেবতা নারায়ণের সন্ধান মেলে 'শতপথ ব্রাহ্মণে'। এই গ্রন্থের চতুর্দশ কাণ্ডের একটি উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবগণ সঙঘবদ্ধ হয়ে কৌশলে বিষ্ণুকে হত্যা করে তৎস্থানে নারায়ণকে স্থাপন করেন। 'হত্যা' শব্দটি এখানে ইঙ্গিতমূলক, সম্ভবত বিষ্ণুকে এই সময়ে উৎখাত করা হয়েছিল। বিষ্ণু ও নারায়ণ যে এক ও অভিন্ন শতপথ ব্রাহ্মণে তা স্বীকার করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, নারায়ণ ছিলেন পঞ্চরাত্রের উপাসক। নারায়ণ-বিষ্ণুর সঙ্গে বাসুদেব কৃষ্ণের সাঙ্গীকরণ ঘটেছিল শুঙ্গ যুগে। কৃষ্ণ যে বিষ্ণুর অবতার বৈদিক সম্প্রদায় তা স্বীকার করে নিলেন, রচিত হল শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম সাধনার মূল তত্ত্ব বিধৃত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার মূল গ্রন্থ এই ভাগবত, তাই এই ধর্মকে বলা হয় ভাগবত ধর্ম।

ভাগবত ধর্মের মূল উপজীব্য হচ্ছে ভক্তি। উপনিষদে ভক্তির ইঙ্গিত থাকলেও পূর্ণবিকাশ দেখা যায় শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়, আর শ্রীমদ্ভাগবত তো ভক্তিবাদের আকর-গ্রন্থ। ভক্তিধর্মের পরম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ, একাধারে তিনিই

১৬. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃ. ২৪১

১৭. নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯১
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভূমিকা, পৃ. ১৩
বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—সুবীরা জয়সওয়াল, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত, পৃ. ৩০

বাসুদেব, নারায়ণ, বিষ্ণু, হরি এবং স্বয়ং ভগবান। স্যার আর. জি. ভান্ডারকরের মতে, বাসুদেব এবং কৃষ্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পরবর্তীকালে এঁদের দুজনকে এক ও অভিন্ন কল্পনা করা হয়েছে। মহাভারতের কৃষ্ণ একজন সত্যপরায়ণ ঋষি, অপর দিকে বাসুদেব যাদব বংশোদ্ভুত ক্ষত্রিয়।[১৮] ডা. কিথ অবশ্য এঁদের দুজনকে অভিন্ন মনে করাই উচিত মনে করেছেন।[১৯] কৃষ্ণ যে তিনটি ধারার সমন্বয়ে উদ্ভুত একটি বেগবান পৌরুষেয় সত্তা, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আভীর ট্রাইবের উপাস্য পশুপালক কৃষ্ণ, যাদব ট্রাইবের বাসুদেব কৃষ্ণ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের দেবকীনন্দন কৃষ্ণের মিলিত সত্তা নারায়ণ ও বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে।[২০]

উত্তর ভারত বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তিস্থল হলেও, দক্ষিণ ভারতে আলোয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে এর বিকাশ লক্ষ করা যায়। আলোয়ারগণ নিজেকে নায়িকাজ্ঞানে কৃষ্ণের উপাসনা করতেন। বোধহয় আলোয়ারগণই ভারতবর্ষে আদি কৃষ্ণভক্ত। গোপীভাবে ভাবিত আলোয়ারগণ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে আঞ্চলিক ভাষায় যে গান রচনা করেছিলেন তা 'দিব্য প্রবন্ধম্' বা 'নালিয়ার প্রবন্ধম্' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে মহাকবি হাল আলোয়ারদের গানগুলি সংগ্রহ করে 'গাথা সপ্তশতী' বা 'গাথা সত্তসঈ' নামে সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন। এই সংকলনে প্রায় সাতশত সংগীত সংগৃহীত হয়েছে। অনেকের মতে এগুলির রচনাকাল খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে।[২০ক]

ভক্তিবাদের দার্শনিক মতবাদ বিধৃত হয়েছে 'শাণ্ডিল্য সূত্র ও নারদ সূত্র'-তে। সূত্র অনুযায়ী ভক্তিবাদের মূল কথা ঈশ্বরের প্রতি প্রেমরূপ ঐকান্তিক অনুরাগ। মানুষ যখন জ্ঞানের পথে পরমপুরুষের উপাসনায় ক্লান্ত, কঠোর তপশ্চারণায় অবসন্ন, সন্ন্যাস জীবনের নীরসতায় বিষণ্ণ, তখন ভক্তিধর্ম প্রেম-রসের বন্যায় ভক্তের হৃদয়কে প্লাবিত করে, আপ্লুত করে। হৃদয়ে ভক্তি থাকলেই ভক্ত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম।

১৮. Indian Antiquiry 1912, P-13
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভূমিকা, পৃ. ১৬

১৯. J. R. A. S. 1915, P-840

২০. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃ. ২৩২

২০ক. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ. ১২৪

বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের কালে ভক্তিবাদের প্রসারণ বন্ধ হয়ে যায়। সম্রাট অশোক এবং কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। শক-কুশান আমলে ভাগবত ধর্ম ছিল মথুরাকেন্দ্রিক। গুপ্ত সম্রাটগণ ছিলেন পরম ভাগবত। গুপ্ত আমলে এই ধর্ম ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে মালয়, কম্বোডিয়া, ইন্দোচিন ও ইন্দোনেশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছিল।[২১] দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্মের সার্বিক প্রসার ঘটে সাতবাহন আমলে। ভক্তিবাদের দক্ষিণ বিজয় সম্পর্কে পদ্মপুরাণে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে—

'উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহংবৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
স্থিত্বা কিঞ্চিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা।।'

অর্থাৎ আমার জন্ম দ্রাবিড়ে, বৃদ্ধি কর্ণাটকে, স্থিতি মহারাষ্ট্রে এবং জীর্ণতা গুজরাটে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অবশ্য নির্দ্বিধায় এ মত স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাঁর মতে, দক্ষিণ ভারতে যেমন, উত্তর ভারতেও তেমনিভাবে ভক্তিধর্মের প্রসার ঘটেছিল।[২২]

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেই তামিল জনগোষ্ঠীর মধ্যে আলোয়ারগণের উদ্ভব ঘটেছিল। এই সম্প্রদায়ের ভক্তগণ স্ত্রী-পুরুষে ভেদ স্বীকার করতেন না, বর্ণভেদ প্রথাকে প্রশ্রয় দিতেন না, ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুকী প্রেম থাকলেই এই সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা যেত। 'আলোয়ার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদ। দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং গোপী ভাবনায় ভাবিত ভক্তদের প্রধান উপাস্য ছিল রাধাকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের অমর প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে আলোয়ারগণ তামিল ভাষায় রচনা করেছিলেন আদিরসাত্মক সংগীত ও পদাবলি, যার প্রধান উপজীব্য ছিল আবেগ, অনুরাগ, শুদ্ধাভক্তি ও ঈশ্বর-প্রীতি। এই আলোয়ার গীতিতেই প্রথম পাওয়া যায় রাধার উল্লেখ—

'মুহমারুএন তং কণহ গোরঅং রাহিআএঁ অবণেন্তো।
এতাণঁ বল্লবীণং অন্নাণঁ বি গোরঅং হরসি।।'

অর্থাৎ, 'হে কৃষ্ণ (কণহ), মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার (রাহিআএঁ) আয়তনেত্রে ফুৎকার দিয়ে যে গৌরব বৃদ্ধি করলে, তাতে অন্যান্য বল্লবীগণের

২১. বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃ. ২৪৫, ২৪৭
ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃ. ২৩২

২২. ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ২৩

অম্লান গৌরব ম্লান করলে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, রাধার উৎপত্তি সাহিত্য অবলম্বনে, পুরাণগুলিতে রাধার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা অর্বাচীনকালের।[২৩]

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় রাজ্যে বারোজন আড়বার আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ভক্তিবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের অভূতপূর্ব সংক্রাম ঘটেছিল আড়বারগণের মধ্যে। অণ্ডাল ছিলেন মহিলা ভক্ত, গোপীভাবে ভাবিত। দ্বাদশ আড়বার ছিলেন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক জনগোষ্ঠীর মানুষ। এঁদের মধ্যে যেমন রাজা ছিলেন, জমিদার ছিলেন, তেমনি আবার দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষও ছিলেন। নম্মাড়বার ছিলেন বেড়্‌ড়ার গোষ্ঠীর মানুষ, কুলশেখর ছিলেন রাজা, আবার তিরুমঙ্গই ছিলেন ডাকাত পরিবারের লোক, এঁরা সবাই কৃষ্ণভক্ত হয়েছিলেন। আড়বারগণ ছিলেন নৈষ্ঠিক সাধক; ঐকান্তিকতা ছিল এঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর আরাধনায় সংকীর্তন এঁদের ভজন প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। এককভাবে ঈশ্বর উপাসনার ক্ষেত্রে কীর্তন সংগীতের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

অদ্বৈতবাদী শঙ্কর (৭৮৮-৮২০ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন অষ্টম শতাব্দীতে। তিনি ছিলেন জ্ঞানবাদী, একেশ্বরবাদী এবং মায়াবাদী। তাঁর মতে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। আচার্য শঙ্করের যুক্তিতর্কের প্রাবল্যে তৎকালীন অন্য ধর্মীয় মতাদর্শগুলি পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর এই মায়াবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতের উর্বর মাটিতে ভক্তিবাদের অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটলেও দশম শতাব্দী পর্যন্ত তা দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এই অভাব পূরণ করার জন্য এগিয়ে এলেন রামানুজ। দক্ষিণ ভারতকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব ধর্মের যে তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে ওঠে তার প্রথম আচার্য ছিলেন রামানুজ (১০১৬-১১৩৭ খ্রি.)। দ্বৈতবাদী রামানুজ প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপন করেন নাথমুনি বা রঙ্গনাথাচার্য এবং এঁর পৌত্র যমুনাচার্য। রামানুজ শঙ্করাচার্যের মতকে খণ্ডন করে জীবজগৎকেও চিদ্বস্তু রূপে স্বীকার করে নিলেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর আলোকস্তম্ভ হলে জীব হচ্ছে স্ফুলিঙ্গ, একই সঙ্গে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে অভেদ ও প্রভেদ বর্তমান। এঁর পর যিনি দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হন তিনি সগুণ ব্রহ্মবাদী নিম্বার্কাচার্য (দ্বাদশ শতাব্দী)। ইনি জীব ও জড় জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের অভিন্নতায় বিশ্বাসী। এঁর মতে, জীব পরমপুরুষ ঈশ্বরের অংশস্বরূপ। আচার্য নিম্বার্কের মতবাদ 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' নামে খ্যাত,

২৩. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ. ১০৩

এই মতের উপাসকেরা সনক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতকে ঘিরে ভক্তিবাদের প্রবাহ যখন প্রসার্যমান, তখন মহীশূরের কুল্লিয়ানপুরে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মধ্বাচার্য। অনেকে এই সম্প্রদায়কে মাধ্ব বা সদ্বৈষ্ণব নামেও অভিহিত করে থাকেন। ইনি জীব ও জড়ের সঙ্গে ঈশ্বরের পাঁচ প্রকার প্রভেদ স্বীকার করতেন। তাঁর মতে বিষ্ণু সগুণ, নিত্য এবং লক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত।[২৪] ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে ভক্তিবাদের পীঠস্থান দক্ষিণ ভারতের কণকবর অঞ্চলে আবির্ভূত হন বল্লভাচার্য। এঁর সম্প্রদায় রুদ্র নামে পরিচিত। ইনি ঈশ্বরের সঙ্গে জীবজগতের অভেদ কল্পনায় বিশ্বাসী ছিলেন।

দক্ষিণ ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে নিম্বার্ক অধিকাংশ সময় কাটাতেন বৃন্দাবনে। এঁরা কণ্ঠিমালা ও রসকলি ধারণ করতেন এবং রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করতেন। বল্লভাচার্য ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। এঁর সম্প্রদায় গোপীভাবে পরমপুরুষের আরাধনা করতেন, মেয়েদের মতো শাড়ি গহনা পরতেন। এঁদের মতে, এই বিশ্বসংসারে সর্বশক্তিমান কৃষ্ণই হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ আর সকলেই নারী। রসকলি ধারণ এঁদের অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় কৃত্য। বিষ্ণুর অবতারের প্রতীক স্বরূপ দ্বাদশটি গোপিচন্দন চিহ্ন এঁরা শরীরে ধারণ করতেন।[২৪ক] বল্লভাচার্য বর্ণভেদকে স্বীকার করেননি। রামানুজ ছিলেন স্মার্ত ব্রাহ্মণ, অথচ শূদ্র গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির অসংখ্য মানুষকে তিনি শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন।[২৫]

উত্তর ভারতকে কেন্দ্র করে ভক্তিবাদের প্রসার ঘটিয়েছিলেন রামানন্দ। তারাচাঁদের মতে, উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের ভক্তিবাদকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন রামানন্দ (চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী)।[২৬] ইনি ছিলেন শ্রী সম্প্রদায়ভুক্ত, রামের উপাসক। তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধান আখড়া ছিল বারাণসী। জাতপাতের সীমাকে উল্লঙঘন করে আপামর জনকে তিনি ভক্তিধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে স্ত্রীজাতির যেমন স্থান ছিল, তেমনি মুসলমান, চামার, তাঁতি, নাপিত, চাষি, রাজপুত প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষও ছিলেন। চিতোরের রানি ঝালি এবং মেবারের রাজবধূ মীরাবাঈ এঁর শিষ্যা ছিলেন।

২৪. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃ. ৪৫০
২৪ক. যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৭৭
২৫. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃ. ২৪৮
২৬. বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি—রমাকান্ত চক্রবর্তী, পৃ. ২১

কবীর (আ. ১৪৪০-১৫১৮ খ্রি.), নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রি.), তুলসীদাস (১৫৩২-১৬২৩ খ্রি.) প্রভৃতি বৈষ্ণব সন্তগণ উত্তর ভারতে ভক্তিবাদের দীপশিখাটিকে প্রজ্বলিত রেখেছিলেন। কবীর ক্রিয়াকাণ্ডকে অতিক্রম করে, জাতপাতকে অস্বীকার করে নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসনায় বিশ্বাসী ছিলেন। নানক সংস্কারমুক্ত হয়ে পরমপুরুষের পদতলে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিয়েছেন। তুলসীদাস কিছুটা রক্ষণশীল হলেও তিনি ছিলেন প্রেম ও ভক্তির তন্নিষ্ঠ উপাসক। ওদিকে মহারাষ্ট্রের নামদেব ও তুকারাম বর্ণভেদ ও ক্রিয়াকাণ্ডকে উপেক্ষা করেছেন এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। মেবারের রাজবধূ মীরাবাঈ (১৪৯৮-১৫৪৬ খ্রি.) নন্দলালার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। রাজপুতানার হিন্দু সন্ত দাদূ (১৫৪৪-১৬৩৩ খ্রি.) সর্বধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে এক পরমব্রহ্মের সন্ধান দিয়েছেন, যা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। উত্তর ভারতকে যাঁরা ভক্তিবাদের ধারায় প্লাবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবীর তাঁতির, রবিদাস মুচির, দাদূ ধুনকরের, নামদেব দর্জির এবং নানক ছিলেন রঙরেজের সন্তান।

বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম

মহাভারতের যুগে বঙ্গের জনগণ কৃষ্ণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন। সার্বভৌম নৃপতিগণ কৃষ্ণের দেবত্ব স্বীকার করেননি। বাংলার নৃপতি পৌণ্ড্র বাসুদেব, সমুদ্রসেন ও চিত্রসেন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।[২৭] বঙ্গে ব্রাহ্মণ আধিপত্য এবং ভাগবত ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল গুপ্ত আমলে। ৩০০ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিটি বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের প্রাচীনতম নিদর্শন। লিপিটির স্রষ্টা ছিলেন পুষ্করণাধিপ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মা। লিপি অনুযায়ী মহারাজ চন্দ্রবর্মাকে প্রভু চক্রস্বামীর (বিষ্ণুর) দাস রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, রাঢ় জনপদ সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক বিজিত হওয়ার পূর্বে চন্দ্রবর্মা ছিলেন রাঢ়ের অধিপতি।[২৮] তাঁর আমলেই বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটেছিল।

২৭. নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯

২৮. History of Bengal—Ramesh Chandra Majumdar, Vol. I.

বাংলার পূর্বভাগেও বৈষ্ণব ধর্মের পদচারণা শুরু হয়েছিল খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। ৪৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে কুমারগুপ্ত প্রকাশিত ধনাইদহ (রাজশাহি) তাম্রলিপিতে গ্রামের বরিষ্ঠজনদের নামোল্লেখ আছে। নামগুলিতে (বিষ্ণু, বিষ্ণুভদ্র, রামক, গোপাল, শ্রীভদ্র) বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রভাব থাকায় সহজেই অনুমিত হয় যে, সেকালে এতদঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছিল। এই লিপি থেকে আরও জানা যায় যে, এমন একজন ব্যক্তি বরাহস্বামীকে (বিষ্ণু) জমি দান করেছিলেন যার নামের শেষে বিষ্ণু শব্দটির উল্লেখ ছিল।[২৯] বুদ্ধগুপ্তের আমলে প্রচারিত দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর তাম্রশাসন অনুসারে শ্বেতবরাহস্বামী এবং কোকমুখস্বামী নামক দুই দেবতার মন্দির নির্মাণকল্পে ভূমি ক্রয় করেছেন জনৈক ঋভু পাল।[৩০] তাম্রশাসনে উল্লিখিত কোকমুখস্বামী যে বিষ্ণুর অপর নাম, নীহাররঞ্জন রায়[৩১], সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়[৩২] নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করেছেন। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসনকর্তা চিরাতদত্ত কর্তৃক ৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রচারিত তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, গোবিন্দস্বামীর মন্দির নির্মাণকল্পে বাংলাদেশের বৈগ্রাম নিবাসী ভাস্কর ও ভোয়িল নামক ব্রাহ্মণদ্বয়কে জমি দান করা হয়েছিল।[৩৩]

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে মহারাজ বিজয় সেন সম্পাদিত (ইনি সেন-বংশীয় নন) মল্লাসারুল তাম্রশাসনের উপরিভাগে লাঞ্ছিত মূর্তিটি বিষ্ণুমূর্তি বলে অনুমান করেছেন যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি।[৩৪] উক্ত তাম্রলেখের সূচনায় উল্লিখিত 'শ্রীলোকনাথ' শব্দটি কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কোনও কোনও ইতিহাসবেত্তা লোকনাথ অর্থে ভগবান বুদ্ধকে বোঝাতে চেয়েছেন। অপরদিকে আভিধানিক অর্থে লোকনাথ শব্দে বিষ্ণু ও কৃষ্ণকেও বোঝানো হয়েছে।[৩৫] সমগ্র তাম্রশাসনের বক্তব্য ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির অনুকূলে থাকায় এবং বিজয়সেন বৌদ্ধ

২৯. বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃ. ২৮৮

৩০. তদেব, ২২৮

৩১. বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়

৩২. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩৫

৩৩. Corpus of Bengal Inscriptions—Mukharjee & Maity, P-50
বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃ. ২২২

৩৪. প্রাক্ চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবধর্ম—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ পত্রিকা, ২০০৩, পৃ. ৫

৩৫. বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭২

ধর্মাবলম্বী না হওয়ায় 'লোকনাথ' শব্দটিকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন রূপে প্রতীয়মান করার চেষ্টা অসমীচীন বলেই মনে হয়। ৮১২ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত মহারাজাধিরাজ ধর্মপালের খালিমপুর (মালদহ) তাম্রশাসন অনুসারে নারায়ণ বর্মা ভগবান নন্নারায়ণদেবের একটি মন্দির নির্মাণ করেন এবং মন্দিরের দেবসেবা পরিচালনার জন্য ধর্মপাল চারখানি গ্রাম দান করেন।[৩৬] এক্ষেত্রে একটি বিষয় অবগত হওয়া যাচ্ছে যে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আনুগত্য থাকলেও ধর্মপাল বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী ছিলেন না। রাজশাহি জেলার দেওপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত মহারাজ বিজয়সেনের একটি প্রস্তরফলক (১০০০ খ্রি.) অনুযায়ী জানা যায় যে, রাজা স্বয়ং প্রদ্যুম্নেশ্বরের একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।[৩৭]

বর্ধমান জেলার চৈতন্যপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে কালো বেসাল্ট পাথরে তৈরি স্থানক বিষ্ণুমূর্তি।[৩৮] এই জেলারই মৌড়াঙা গ্রামে পাওয়া গেছে স্থানক বিষ্ণুমূর্তির খণ্ডিত অংশ, পাঁচরা গ্রামে পাওয়া গেছে একটি লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি। দ্বিতীয় মূর্তিটি সংরক্ষিত আছে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদে আর তৃতীয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায়। এই জেলার রাইগ্রামে পাওয়া গেছে একটি বরাহমূর্তি। এরকম অসংখ্য উদাহরণ উপস্থাপন করা যায় এখানে। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে বিষ্ণুর দশ অবতারের অসংখ্য নিদর্শন, তেমনি বিষ্ণুর স্থানক মূর্তির নানা অবয়ব। ভিন্ন ভিন্ন নামে বিষ্ণুর উল্লেখ এবং মূর্তি আবিষ্কার থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, গুপ্ত আমল থেকে সেন আমল পর্যন্ত প্রায় নশো বছর বিষ্ণুর নিরবচ্ছিন্ন আরাধনা চলেছিল বঙ্গদেশে। গুপ্তরাজেরা ছিলেন পরম ভাগবত, বিষ্ণুর উপাসক; ব্রাহ্মণদেরও তাঁরা যথাযোগ্য সম্মান দিতেন। বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি তন্ত্রের ব্যাপক প্রসার সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভাগবত উপাসকেরা বিষ্ণুর পাশাপাশি কৃষ্ণেরও উপাসনা করতেন। সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই বাংলার জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। গুপ্ত রাজত্বকালেই বগুড়া জেলার পাহাড়পুরে নির্মিত হয়েছিল কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গিরি-ভাস্কর্য, যা বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য পাল আমলেও

৩৬. গৌড় লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্র, পৃ. ১৬

৩৭. গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ. ১৫৩-৫৭

৩৮. Archaeological Survey of India, Annoual Report—1925-26, P-153.

বৈষ্ণব ধর্মের অগ্রগমন ছিল অব্যাহত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতো রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক গ্রন্থ লেখা হয়েছিল এই সময়ে।

W. Richardson মনে করেন পাল রাজগণ ছিলেন আভীর গোষ্ঠীভুক্ত। তিনি লিখেছেন, 'The Pal or Shepherd dynasty ruled in Bengal from the 9th to the later part of the 11th century and if we place trust in the monumental inscriptions, the Abhirs were of sometimes the universal monarchs of India.'[৩৯] Sir Henry M. Eliot[৪০], ড. সতী ঘোষ[৪১] প্রমুখ ইতিহাসবেত্তা Richardson-এর মতকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। ড. সতী ঘোষ বলেছেন যে, পাল রাজত্বকালেই আভীর সংস্কৃতির রাসনৃত্য এবং বিরহ্-সংগীতগুলি বাঙালির জনজীবনে প্রসার লাভ করেছিল। প্রাগুক্ত মতগুলিকে অস্বীকার না করেও একটি কথা স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, পাল রাজেরা বৌদ্ধ ছিলেন, আভীর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যদি তাঁদের বিন্দুমাত্র সংস্রব থাকত তা হলে তাঁরা ভাগবত ধর্মাশ্রয়ী হতেন, রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রচারে মনোনিবেশ করতেন, বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটেনি। পাল সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে গড়ে উঠেছিল স্তূপ, সঙঘারাম, বিহার ইত্যাদি বৌদ্ধ সংস্কৃতির নানা নিদর্শন। তবে পাল-রাজেরা পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন, বৈষ্ণব দেবদেবীর সেবার নিমিত্ত তাঁরা অসংখ্য ভূমি দান করেছিলেন। আসলে ধর্মীয় সমন্বয়বাদের একটি ঐতিহ্য ফল্গুধারার ন্যায় বাঙালির সমাজ জীবনে প্রবাহিত ছিল। পঞ্চোপাসনার দেবতারা যেমন বাঙালির সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি করেছিল বৌদ্ধ ধর্মাচরণও। পাল বংশের প্রথম রাজা ছিলেন গোপাল (৭৫০-৭৭৫ খ্রি.)। কৃষ্ণের অজস্র নামের মধ্যে একটি নাম ছিল গোপাল, পাল বংশের সঙ্গে আভীর জাতির এই একটি মাত্র সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, যদি গোপালের গো অর্থে গরু আর পাল অর্থে দল ধরে রাজা গোপাল-কে গোপালক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ধরা হয়, তা হলে তা হবে অসমীচীন।

প্রায় পাঁচশো বছর যাবৎ বাংলার জনজীবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা যে বিশেষভাবে আলোড়ন তুলেছিল তার পূর্ণ প্রতিফলন দেখতে পাই জয়দেবের

৩৯. Asiatic Researches—W. Richardson, Vol. IX, Page-438

৪০. Memoirs on the History, Folklore and Distribution of the races of the North Western Provinces of India—Sir Henry M. Eliot.

৪১. ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ১৪৫

গীতগোবিন্দম্ কাব্যে। এতদিন রাধা-রূপ যে কুসুমকলিটি ফুটি ফুটি করেও পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারেনি, জয়দেব সেই অপ্রকাশিত প্রেমলীলার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটিয়ে দেখালেন যে, ভাগবত ধর্মে রাধা চরিত্রকে অস্বীকার করার উপায় নেই। রাধা ব্যতিরেকে বৃন্দাবন লীলার মাধুর্য কল্পনার বিলাস মাত্র। রাধাভাবে ভাবিত হতে না পারলে পরমপুরুষ কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ প্রায় অসম্ভব। রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেব গাইতেন আর পদ্মাবতী নৃত্য করতেন। সেকালের সমাজ যে আদিরসাত্মক চর্চায় নিমগ্ন ছিল, ইতিহাসে সে সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[৪২] জয়দেবের গীতগোবিন্দ একটি অসাধারণ গ্রন্থ। সমগ্র ভারতবর্ষে এটি দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছিল। পুরীর জগন্নাথ মন্দির গাত্রের একটি শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, জগন্নাথ মন্দিরে একমাত্র গীতগোবিন্দের পদ-ই গীত হত। এই গ্রন্থখানিতে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গীতগোবিন্দের প্রস্তাবনার শ্লোকগুলির সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রচনাকাল অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী।[৪৩]

'সেন বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম কিছুটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যে রামানুজ সৃষ্ট 'শ্রী' সম্প্রদায় এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তার পূর্বেই যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সেন রাজারা কানাড়া থেকে বঙ্গে এসেছিলেন। এমনও হতে পারে যে, তাঁরাই দাক্ষিণাত্য থেকে নূতন বৈষ্ণব মতাদর্শ বঙ্গে নিয়ে আসেন। 'ভাগবতপুরাণ' তাঁদের রাজত্বকালেই বঙ্গে প্রচলিত হয়। এই পুরাণ বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে দাক্ষিণাত্যে রচিত হয়েছিল। অবশ্য রাঢ়বঙ্গে রামানুজের অথবা তাঁর মতাবলম্বী আচার্যদের চিন্তাধারার প্রচলনের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস নেই।'[৪৩ক] প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, 'ভাগবততত্ত্বমঞ্জরী' নামক বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ রচনা করেন বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবি হলায়ুধ রচনা করেন 'বৈষ্ণবসর্বস্ব'। সেন-আমলে রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে বৈষ্ণব ধর্ম সমাজে আদৃত হয়েছিল।

তুর্কি আমলের সূচনায় বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডল ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। সেকালে সমাজজীবনে নেমে এসেছিল এক

৪২. 'সেন আমলে নবদ্বীপ'—মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, গাণ্ডীব, বইমেলা সংখ্যা ২০০৪

৪৩. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩৯

৪৩ক. বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, পৃ. ১২

ভয়ংকর দোদুল্যমানতা। এতকালের অর্জিত বিশ্বাস, ধর্মীয় ঐতিহ্য, সামাজিক বন্ধনের পরম্পরা লহমায় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, তুর্কি প্রভাবে। ধাতস্থ হতে সময় লেগেছিল। যেন অতর্কিত একটি ঘূর্ণিঝড় সংস্কারের পলকা ঐতিহ্যকে ভেঙে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। প্রায় দুশো বছর অতিক্রান্তের পর ভক্তিবাদী সন্তদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, বৈষ্ণব-সাহিত্যের কল্যাণে।

মধ্যযুগে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের স্ফুরণ ঘটেছিল চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে। প্রাক্ চৈতন্যযুগে যে সকল মনীষী ভক্তিবাদকে বিকশিত করেছিলেন তাঁরা হলেন—কৃত্তিবাস ওঝা, মালাধর বসু, চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, শ্রীধরস্বামী, লক্ষ্মীধর, কেশব ভারতী, অদ্বৈত আচার্য এবং অবশ্যই বিদ্যাপতি। কৃত্তিবাস ওঝা (১৩৯৮-১৪৭৮ খ্রি.) বাংলায় রামায়ণ পাঁচালি রচনা করে গৌড়ীয় ভক্তিপ্রবাহে গতি সঞ্চার করেছিলেন। মালাধর বসু (জন্ম আ. ১৪২০-২২ খ্রি.) ছিলেন কুলীনগ্রাম নিবাসী, গুনরাজ খাঁ উপাধিধারী এবং 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থের প্রণেতা। ভাগবতপুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুসরণে গ্রন্থটি রচিত। এই গ্রন্থটির প্রতি চৈতন্যদেবের প্রীতি ছিল সীমাহীন। বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের সন্ধান পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস রজকিণীর যে চণ্ডীদাস তিনিই আদি। ইনি ছিলেন পদকর্তা, সহজিয়া সাধক ও পরকীয়া সাধন তত্ত্বের মরমিয়া উপাসক। মধুর রসসিক্ত চণ্ডীদাসের পদ চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আর একজন চণ্ডীদাস, ইনি বড়ু চণ্ডীদাস নামে পরিচিত ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' গ্রন্থটি এঁর রচিত।

বাঙালি সমাজে ভক্তিধর্ম অপরিচিত ছিল না। কৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে ভক্তি-ভাবনার বীজ নিহিত ছিল। সেন-আমলে তা ব্যাপকতা লাভ করে। গীতগোবিন্দের উৎকর্ষ, সুললিত পদ-মাধুর্যের প্লাবিতা ভক্তের হৃদয়-সাম্রাজ্যকে প্রেমের বন্যায় উদ্বেল করেছিল। প্রাক্ চৈতন্য-যুগে বঙ্গদেশে প্রেমের অমৃতবাণী প্রচার করেছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী। রামচন্দ্র পুরী, অদ্বৈত আচার্য, মাধব মিশ্র, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রমুখ সাধক মাধবেন্দ্রকে গুরুপদে বরণ করেছিলেন। ভাগবতপুরাণ গ্রন্থের টীকা রচনা করে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন শ্রীধরস্বামী। চৈতন্যদেব এঁর গ্রন্থকে অতিশয় মান্যতা দিতেন। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জনের কাছে তাঁর মধুর পদাবলি সমাদৃত হয়েছিল।

প্রাক্ চৈতন্য-আমলেই গৌড়বঙ্গে একটি বৈষ্ণবগোষ্ঠী ভক্তিবাদকে আশ্রয় করে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছিল। এই গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই ছিলেন শিষ্টবর্গের মানুষ, একমাত্র মালাধর বসু ছিলেন কায়স্থ। শাস্ত্রমতে কায়স্থরা

ছিলেন শূদ্র। অদ্বৈত আচার্য ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, জাতপাতের কঠোরতার বিরুদ্ধে তাঁর পদক্ষেপ সে যুগের সামাজিক জাড্যতাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। যবন হরিদাসকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে অদ্বৈত প্রভু স্মার্ত-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জোরদার সংক্ষোভ তুলেছিলেন। ঐতিহ্যকে স্বীকার করে চৈতন্যদেবও ৬৮ জন শূদ্রকে স্বগোষ্ঠীতে স্থান দিয়েছিলেন, এঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন মুসলমান। নবদ্বীপের তরুণ পণ্ডিত নিমাইকে মহামানব রূপে প্রতিভাত করার ক্ষেত্রে অদ্বৈত আচার্য ছিলেন প্রধান যাজ্ঞিক। প্রকৃত অর্থে নদের নিমাই ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ, তাঁকে ঈশ্বরত্বে বরণ করে নেওয়ার মূলে ছিল অদ্বৈতের হৃদয়জ গোপন স্বপ্ন।

উপসংহার

বিষ্ণু হতে কৃষ্ণ পর্যন্ত সংখ্যাতীত দেবতা ভক্তিবাদীদের দ্বারা স্বীকৃত। এ যুগে বিষ্ণু অপেক্ষা নারায়ণের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। শুধু ভক্তিবাদীরা নয়, শক্তিবাদীরাও নারায়ণকে পুজো করেন। নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের উদ্‌গাতা। নারদীয় মতে ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করে সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্য পালনে ভক্তের দায়বদ্ধতা স্বীকার করা হয়েছে। ভক্তিতত্ত্বের মূল উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ ভারত। ভাগবতপুরাণকে বলা হয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় গ্রন্থ।[৪৪] সেন রাজারা ছিলেন কর্ণাট দেশবাসী। অনেকের মতে ভক্তিবাদের পূর্বদেশ-বিজয় এঁদের হাতেই বাস্তবায়িত হয়েছিল। সেন-রাজসভার অন্যতম রত্ন জয়দেব ছিলেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের তাল রক্ষক। নাভাজির মতে, তিনি এই মন্দিরের দেবদাসী পদ্মাবতীকে বিবাহ করেছিলেন। সুতরাং গীতগোবিন্দ কাব্যের নির্মল রসধারায় দক্ষিণী প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

এই ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে ড. কুরেশি অনুমান করেছেন যে, ভাগবতপুরাণের কৃষ্ণ হচ্ছেন দ্রাবিড় বংশজাত।[৪৫] তামিল 'বৈষ্ণব-সাহিত্যের সঙ্গে ভাগবত রচয়িতার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা স্বীকার করেছেন

৪৪. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৪০, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, পৃ. ১২

৪৫. Muslim Community in Indo-Pakistan Sub-Continental—I. H. Qureshi, The Hague 1962, PP—20-24.

চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ১১৩

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।[৪৬] প্রসঙ্গত শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক এখানে প্রণিধানযোগ্য—

'কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রাবিড়েষু চ ভূরিকাঃ।
তাম্রপূর্ণা নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী
*কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।।'*১১/৫/৩৮-৪০

দ্রাবিড় জাতিগোষ্ঠীর রক্তকণিকায় সুপ্তাকারে আত্মগোপন করেছিল ভক্তিবাদের ঐতিহাসিক বীজ, যার উদ্ভাস ঘটেছিল আলোয়ারদের উপাসনায়, ঈশ্বর ভাবনায় এবং সার্বিক উৎসর্জনায়। মেগাস্থিনিসের বিবরণী অনুসারে জানা যায় যে, দক্ষিণী রাজ্য পাণ্ড্য দেশের রানি ছিলেন হেরাক্লেসের (কৃষ্ণের) কন্যা।[৪৭] এই রাজ্যেরও রাজধানী ছিল মথুরা, যা অধুনা মাদুরা নামে পরিচিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনেও দক্ষিণী প্রভাব স্বীকার না করে উপায় নেই।[৪৮] বৈষ্ণবীয় স্মৃতিগ্রন্থ রচয়িতা গোপাল ভট্ট এবং অপর দুই গোস্বামী রূপ-সনাতন ছিলেন দক্ষিণ দেশীয়।[৪৯] এঁরা বৃন্দাবনের যমুনাকূলে বসে কঠোর পুরশ্চারণায় জীবন অতিবাহিত করেছেন আর রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে আদিরসের সংক্রমণ ঘটিয়েছেন। রাগানুগা ভক্তিমার্গের নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তি, তা তো রামানন্দ পরিবেশিত। সখ্য, দাস্য ও বাৎসল্য রসের সম্যক আলোচনার পরেও যখন চৈতন্যদেবের অন্তরে সংরাগ জাগাতে ব্যর্থ হলেন, তখন রায় রামানন্দ মধুর রসের গোপ্যতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের হৃদয়ে রাধাভাবের প্লাবন ঘটালেন। তাই নীলাচল লীলায় আমরা চৈতন্যদেবকে পাই মধুর রসের উপাসক রূপে।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালেই চৈতন্যদেব যে রাধাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন, শশিভূষণ দাশগুপ্তের বক্তব্যে তা পরিস্ফুট হয়েছে।[৫০] শুধু তা-ই নয়, মধুর রসতত্ত্বসমৃদ্ধ 'ব্রহ্মসংহিতা' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ দুটি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালেই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। নবদ্বীপ লীলায় তিনি ছিলেন দাস্য ভাবের উপাসক, নীলাচলে তাঁর অন্তর প্লাবিত হল মধুর রসে। নীলাচলে

৪৬. ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, পৃ. ৫১
৪৭. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃ. ২৪১
৪৮. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, ভূমিকা, পৃ. ৩৬
৪৯. বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম—রমাকান্ত চক্রবর্তী, পৃ. ৫২-৫৩
৫০. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ. ১৯৭

ভক্তিধারার সঙ্গে ভাবাবেগের মিশ্রণে এক অদ্ভুত উপলব্ধির উদ্ভাস ঘটেছিল, যা চৈতন্যদেবকে ভাবে বিভোর রেখেছিল। রমাকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন, 'রাগানুগা ভক্তিতে ভক্তের ঈশ্বরানুরাগ অসহনীয়ভাবে তীব্র হয়ে ওঠে। অনুরাগের অভিঘাতে ভক্ত ঈশ্বরেই ডুবে যান। কিন্তু সেই অবস্থাতেও ভক্তের ব্যক্তিস্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে। ভক্ত 'তটস্থ' হন। ঈশ্বর যেন সীমাহীন মহাসাগর, ভক্ত রাগানুগা ভক্তিতে তাঁর 'তটস্থ'।...রাগানুগা ভক্তি যাঁর থাকে তিনি পাগলের মতো হয়ে যান।'[৫১] চৈতন্যদেবেরও এই দশা হয়েছিল। চৈতন্যদেবের গুরুদেব ঈশ্বরপুরী ও কেশব ভারতী, এঁরা দুজনেই দক্ষিণী ধারার উপাসক ছিলেন। তখনও পূর্ব ভারতে কোনও দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ঐতিহ্য অনুসারে পুরীর জগন্নাথদেব বৌদ্ধ প্রভাবিত।[৫২] নীলাচলে চৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ্ণব ভক্তেরাও শূন্যবাদী ছিলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁদের আস্থা ছিল না। পঞ্চসখার ঈশ্বরদাস তাঁর রচিত 'চৈতন্যভাগবত'-এ চৈতন্যদেবকে বুদ্ধের অবতার রূপে চিহ্নিত করেছেন। অপরদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন।[৫৩] ওড়িয়া ভক্তদের বৌদ্ধবাদ তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। এর ফলে গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে অতিবড়ি বৈষ্ণবগোষ্ঠীর বিরোধ উপস্থিত হয়। ছোট হরিদাসের প্রতি চৈতন্যদেবের কঠোর মনোভাবে গৌড়ীয় ভক্তরা ক্ষুণ্ণ হন এবং চৈতন্যদেবকে ত্যাগ করে দেশে ফিরে আসেন। এই ঘটনায় চৈতন্যদেব গভীর মনোবেদনা অনুভব করেছিলেন। ওড়িশায় একদিকে যেমন ছিল বৌদ্ধ-প্রভাব, তেমনি ছিল সহজিয়া সাধনতত্ত্বের প্রাচীন ধারা। রায় রামানন্দের সাধনতত্ত্বে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৫৪] ওড়িশা যে সহজিয়া সাধনার পীঠস্থান ছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মন্দিরগাত্রে খোদিত মিথুন ভাস্কর্য।

ভারতবর্ষে স্মার্ত-পণ্ডিতদের সমাজ-সম্পর্কহীন নীরস ক্রিয়াকাণ্ডকে উল্লঙ্ঘন করার স্পর্ধা যাঁরা দেখিয়েছিলেন, দক্ষিণ ভারতের সেইসব স্রষ্টা ছিলেন শিষ্টবর্গীয়। অপরদিকে ভক্তিবাদের বন্যায় উত্তর ভারতকে যাঁরা প্লাবিত করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন শূদ্র সমাজের নিপীড়িত, উপেক্ষিত, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। এঁরা জাতপাতের সীমা লঙঘন করে, প্রচলনির্ভর

৫১. বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, পৃ. ৫৮-৫৯

৫২. বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃ. ২৩৮

৫৩. চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস, সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১/৮

৫৪. চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, পৃ. ১৪১

সামাজিক পরম্পরাকে অস্বীকার করে, শিষ্টবর্গীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ব্রাত্য আপামর জনকে শিষ্যত্বে বরণ করে এঁরা সামাজিক চলমানতাকে ক্রিয়াশীল রাখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ও ইসলামের বিজয়রথ কিছুটা হলেও স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। পূর্বভারতে ভক্তিবাদের যে উন্মেষ ঘটেছিল তার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.)। সে যুগ ছিল রক্ষণশীলতার যুগ, জাতপাতের বিড়ম্বনার যুগ, স্মার্ত পণ্ডিতদের যুগ, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির যুগ, শিষ্টবর্গীয়দের ভক্তিহীন আচারবিচারের যুগ। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও চৈতন্যদেব জাতপাতের বেড়া ভেঙে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এক ছাতার তলায় এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। ফলে দিশাহীন সমাজে এক ঐক্যের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, যা সমাজকে বেগবান করে তুলেছিল। চৈতন্যদেব পূর্বসূরিদের সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব আত্মসাৎ করে প্রচার করলেন অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের মূল ভিত্তি। এই তত্ত্বের মূল কথা ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে একই সঙ্গে ভেদ এবং অভেদ বর্তমান।
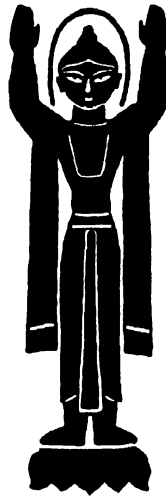
বৈষ্ণবাচার্য নিত্যানন্দ অবধূত

মধ্যযুগে নবদ্বীপ নগরীতে চৈতন্যদেবকে ঘিরে যে নবজাগরণের অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটেছিল, তার প্রভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে শুরু হয়েছিল প্লাবন। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির দাপটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গর্জে উঠেছিলেন তিনি। জাতপাতের অনড় প্রাচীরকে উল্লঙ্ঘন করে তিনি সব ধর্মের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ ছিলেন তাঁর প্রধান সহযোগী। চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল স্রোতধারাকে আরও বেগবান করে তুলেছিলেন নিত্যানন্দ। ধনী বণিক থেকে আরম্ভ করে নির্ধন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষও তাঁর চরণে ভক্তিমান হয়েছিলেন। নিত্যানন্দের কোনও জাত্যভিমান ছিল না, তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত, উপবীত ত্যাগ করে তিনি মানবতার মহান আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। স্বীকার না করে উপায় নেই যে, যাজ্ঞিক অদ্বৈত প্রভু ভক্তিবাদের আলোকে বর্ণভেদের কঠোর সামাজিক শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে যে নবপ্রভাতের সূচনা করেছিলেন, মহামানব চৈতন্যদেবের স্পর্শে যার দীপ্তি শতধারায় বিকশিত হয়েছিল, নিত্যানন্দ প্রভুর জাদুমন্ত্রে সেই আলোকরশ্মি বঙ্গের আপামর মানুষের সামাজিক সংহতি ও জীবনধারাকে পূর্ণতা প্রদান করেছিল। প্রচলনির্ভর সমাজ-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে

নিত্যানন্দ ছিলেন মূর্তিমান বিদ্রোহ। স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য কর্মকাণ্ডের শুষ্ক ধারাকে চৈতন্যদেব যেমন অস্বীকার করেছিলেন, তেমনি নিত্যানন্দ করেছিলেন প্রত্যাখ্যান। সামাজিক অচলায়তনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চলমানতা। যার ফলে ব্রাত্য সমাজ জীবনে দেখা দিয়েছিল জনজাগরণ; যে জাগরণ সমাজকে নতুন দিশা দেখিয়েছিল, সমাজকে করে তুলেছিল সংহত ও শক্তিশালী।

চৈতন্যদেবের প্রধান পরিকর নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম-বৃত্তান্ত ঘন-তমসাচ্ছন্ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ নিত্যানন্দের কোনও প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ রচনা করেননি। বৃন্দাবনের গোস্বামীরাও অদ্ভুতভাবে নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। সূত্রাকারে নিত্যানন্দের নবদ্বীপ লীলার বর্ণনা করেছেন মুরারিগুপ্ত। কবি কর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্' এবং 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক'-এ নিত্যানন্দ সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তা মুরারিগুপ্তকে অতিক্রম করতে পারেনি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ। বৃন্দাবনদাস গ্রন্থ রচনার উপাদান ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন গুরু নিত্যানন্দের কাছে। তাই তাঁর গ্রন্থে চৈতন্যদেবের পাশাপাশি নিত্যানন্দ চরিতও স্বমহিমায় হয়ে উঠেছে ভাস্বর। তবে চৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর নিত্যানন্দের বিবাহ এবং গৌড়বঙ্গে ধর্মপ্রচারের যে রোচিষ্ণু অধ্যায়, তা এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। এই অংশের জন্য নির্ভর করতে হবে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর উপর। জয়ানন্দ ছিলেন চারণকবি, আসরে-আসরে চৈতন্য-চরিত গেয়ে বেড়াতেন। তাই তাঁর গ্রন্থে আসরে পরিবেশন করার উপযুক্ত করেই চৈতন্যচরিত রচিত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই সবক্ষেত্রে চৈতন্যলীলার কালক্রম রক্ষিত হয়নি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল মূল্যবান গ্রন্থ হলেও, বৈষ্ণব ঐতিহ্য-বিরোধী বহু অপ্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে এ গ্রন্থে। সেক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ না করে জয়ানন্দের পরিবেশিত তথ্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা উচিত হবে না। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ নিত্যানন্দ-লীলা কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ঠিকই, তবে এই গ্রন্থেও নতুন কোনও তথ্যের সংবাদ মেলে না। বৃন্দাবনদাস এবং স্বরূপ দামোদরের গ্রন্থ অবলম্বনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করলেও, তিনি নিত্যানন্দ সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থটিতে পরিবেশিত নিত্যানন্দ সম্পর্কীয় তথ্যগুলি গতানুগতিক হলেও, নরহরি তাঁর নিজস্ব ঢঙে কিছু অজানা সংবাদ জানিয়েছেন। এক্ষেত্রেও স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, নিত্যানন্দের অপ্রকটের প্রায় দুশো বছর পরে রচিত গ্রন্থের তথ্য কতটা নির্ভরযোগ্য তা যাচাই না করে

নির্বিবাদে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। শ্রীখণ্ডের নিত্যানন্দ দাস তাঁর 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে নিত্যানন্দ সম্পর্কিত এমন কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছেন যা পূর্বসূরিদের রচনায় অনুপস্থিত, কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে বিষয়গুলির গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।

এতদ্ব্যতীত এমন কতকগুলি গ্রন্থে নিত্যানন্দ চরিতের উপাদান পাওয়া যায়, যেগুলির প্রামাণিকতা বিষয়ে ইতিহাসবেত্তারা ঘোরতর সন্দিহান। ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ', বৃন্দাবনদাসের নামে আরোপিত 'নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার', বাসুদেব ঘোষের নামে আরোপিত 'বাসুদেব ঘোষের কড়চা' প্রভৃতি গ্রন্থ অকৃত্রিম নয়। সুতরাং নিত্যানন্দের মতো আলোকোজ্জ্বল প্রতিভার বাস্তব চিত্রায়ণ করতে হলে মূলত নির্ভর করতে হবে বৃন্দাবনদাস, মুরারিগুপ্ত এবং জয়ানন্দের উপর। এ ছাড়াও বিশাল বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যেও ছড়িয়ে আছে এতদ্‌সম্পর্কীয় নানা উপাদান।

গৌড়বঙ্গ ছাড়াও চৈতন্যদেব জীবনের অর্ধেক সময় কাটিয়েছিলেন উৎকলে। সেখানেও শ্রীচৈতন্যের অনুগামী বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। উৎকলরাজ স্বয়ং, রাজগুরু, রাজ-অমাত্যগণ সহ 'পঞ্চসখা'-র অসংখ্য ভক্ত চৈতন্য-চরণে ভক্তিমান হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ওড়িয়া ভাষায় চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থ রচনা করে আঞ্চলিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এই সকল চরিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্তত দুটিতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে নিত্যানন্দের চরিতকথাও আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থদুটি হল, ১) ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবত আর ২) দিবাকরদাসের জগন্নাথচরিতামৃত। ঈশ্বরদাস ছিলেন 'পঞ্চসখা'-র ভক্ত এবং চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। আর দিবাকরদাস ছিলেন চৈতন্য-পরিকর জগন্নাথদাসের অধস্তন তিনপুরুষ পরবর্তীকালের শিষ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইনি বর্তমান ছিলেন।

গয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর চৈতন্যদেব যখন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ, নাম-সংকীর্তনের মধুর ধ্বনিতে নবদ্বীপ যখন মাতোয়ারা, তখন নবদ্বীপে এলেন নিত্যানন্দ। তিনি এসে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবগোষ্ঠীতে যোগ দিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই সকলকে জয় করে নিলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজ তাঁকে পেয়ে এতটাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা তাঁর পাদোদক পান করেছিলেন, কৌপীন মস্তকে ধারণ করেছিলেন, সর্বোপরি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে পুজো করেছিলেন।

এ হেন যে নিত্যানন্দ, তাঁর জীবনের সূচনাপর্ব আমাদের কাছে অনেকটাই অজ্ঞাত। চরিতকারদের রচনায় কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তা মতভেদে এতটাই পরিপূর্ণ যে, নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া সত্যিই দুরূহ। জয়ানন্দের মতে, বীরভূম জেলার একচক্রা বা একচাকা গ্রামের হাড়াই পণ্ডিতের পুত্র ছিলেন তিনি, বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল কুবের।[১] বৃন্দাবনদাসের মতে একচাকা গ্রামটির অবস্থান ছিল মৌড়েশ্বরের কাছে।[১ক] দীন কৃষ্ণদাসের একটি পদেও এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে—

'রাঢ় দেশে নাম, একচক্রা গ্রাম, হারাই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী, জনমিলা হলধর।।' [২]

মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দের আবির্ভাব ঘটল একচক্রা গ্রামে, কিন্তু কত সালে তাঁর জন্ম হয়েছিল—এ সম্পর্কে প্রামাণিক চরিতকারেরা একেবারে নীরব। ঈশান নাগর তাঁর 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থে নিত্যানন্দের জন্মসাল সম্পর্কিত যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা সঠিক নয়। তিনি বলেছেন—

'তেরশত পচানব্বই শকে মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে।।' [৩]

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায় নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মকাল নির্ণয় করেছেন ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি।[৪] সম্ভবত তিনি ঈশান নাগরের তথ্যের উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছিলেন। এক্ষেত্রে একটু ত্রুটি থেকে গেছে। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

'হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে।।
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর।।' [৫]

বৃন্দাবনদাসের তথ্য থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে নিত্যানন্দ যখন নবদ্বীপে এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল বত্রিশ বছর। সুতরাং

১. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ সম্পাদিত, পৃ. ৮-৯
১ক. চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস, সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১/৮
২. গৌরপদতরঙ্গিণী—জগবন্ধু ভদ্র, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ১ম উচ্ছ্বাস, ৫নং পদ
৩. অদ্বৈত প্রকাশ—ঈশান নাগর, ১৪শ অধ্যায়, পৃ. ৫৭
৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম—সুখময় মুখোপাধ্যায়
৫. চৈতন্যভাগবত, ১/৮

তাঁর সঠিক জন্ম সালটি ছিল (১৫০৯-৩২) = ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি। বেলা দাশগুপ্তা ১৩৯৮-৯৯ শকাব্দে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ঘটেছিল বলে অনুমান করেছেন,[৬] যা সঙ্গত বলেই মনে করি। ওড়িয়া কবি ঈশ্বরদাস লিখেছেন, 'নিত্যানন্দের নয় বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যের জন্ম।'[৭] যা আমাদের সিদ্ধান্তকেই পুষ্ট করে। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মত স্বীকার করে নিলে নবদ্বীপ আগমনকালে নিত্যানন্দের বয়স দাঁড়ায় ১৫০৯-১৪৭৩ = ৩৬ বৎসর, যা বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার পরিপন্থী। এক্ষেত্রে সুখময়বাবুর উল্লিখিত সালটি সঠিক নয়।

কৈশোর বয়সেই জনৈক সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন নিত্যানন্দ। প্রেমবিলাসের মতে, এই সন্ন্যাসীর নাম বলা হয়েছে ঈশ্বরপুরী।[৮] জয়ানন্দের মতে, তিনি প্রয়াগে ঈশ্বরপুরীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিত্যানন্দ নাম ধারণ করেন।[৯] শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর 'বৈষ্ণববন্দনা' গ্রন্থে সংকর্ষণপুরীকে নিত্যানন্দের গুরুরূপে বর্ণনা করেছেন, ইনি ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় জানা যায় যে, নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র পুরীকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন।[১০] ভক্তমাল গ্রন্থে এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তী বৃন্দাবনদাসের মতকে স্বীকার করে নিলেও, তিনি কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, মাধবেন্দ্র পুরীকে গুরু হিসেবে মান্যতা দিলেও নিত্যানন্দের প্রকৃত গুরু ছিলেন লক্ষ্মীপতি।[১১] নরহরি চক্রবর্তীর তথ্য স্বীকার করে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লক্ষ্মীপতিকেই নিত্যানন্দের গুরু নির্ধারণ করেছেন।[১২] আসলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ নরহরি চক্রবর্তীর ইতিহাসমনস্কতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, অথচ তাঁর ইতিহাস সম্পর্কিত অতিশয়োক্তি কোথাও-কোথাও যে ইতিহাস-বিকৃতির নামান্তরে পর্যবসিত হয়েছে, আধুনিক ইতিহাসবেত্তারা নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া নিত্যানন্দের অপ্রকটের প্রায় দুশো বছর পরে তাঁর গুরু সম্পর্কে নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন নরহরি, অথচ এই তথ্যের উল্লেখ সমকালীন কোনও চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আমরা বৃন্দাবনদাসের

৬. শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম—ডা. বেলা দাশগুপ্তা, পৃ. ৭২

৭. তদেব, পৃ. ৬৬

৮. প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস, রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত, পৃ. ২৪৩

৯. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, পৃ. ১১, ৫৪

১০. চৈতন্যভাগবত, ১/৮

১১. ভক্তিরত্নাকর—নরহরি চক্রবর্তী, নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত, ৫/২২৬৩-২৩৫৮

১২. গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা—ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৯

মতকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। কারণ, বৃন্দাবনদাস ছিলেন নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য। আসলে নিত্যানন্দের গুরু কে ছিলেন, এ সম্পর্কে চরিতকারদের রচনায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবে তিনি যে মধ্ব-সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন, তা স্বীকার করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই।

এদিকে 'চৈতন্য পরিকর' গ্রন্থের লেখক রবীন্দ্রনাথ মাইতি বৃন্দাবনদাসের মতকে অস্বীকার করে বলেছেন যে, নিত্যানন্দের সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ-ই ঘটেনি।[১৩] রবীন্দ্রবাবুর এ সিদ্ধান্ত অনেকটাই হাস্যকর, কারণ প্রেমবিলাসে (পৃ. ২৪৩), ভক্তিরত্নাকরে (৫/২২৬৩-২৩৫৮) এবং চৈতন্য ভাগবতে (১/৮) স্বীকার করা হয়েছে যে, নিত্যানন্দ ও মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ ঘটেছিল বৃন্দাবনে। বিশিষ্ট বৈষ্ণব গবেষক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নির্দ্বিধায় এ মত স্বীকার করে নিয়েছেন।[১৪] রবীন্দ্রবাবু তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যদি এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটত তা হলে পুরী যাত্রাকালে রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথের উপাখ্যান মহাপ্রভুর পরিবর্তে নিত্যানন্দই পরিবেশন করতেন। রবীন্দ্রনাথবাবু হয়তো লক্ষ করেননি যে, রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথের ঘটনাটি ঘটেছিল মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তথ্য অনুযায়ী মাধবেন্দ্র পুরী তাঁর আরাধ্য গোপালের জন্য চন্দন সংগ্রহ করে আর বৃন্দাবনে ফিরে যেতে পারেননি, সেখানেই তাঁর প্রয়াণ ঘটেছিল।[১৫] সুতরাং রেমুণার ঘটনার পর নিত্যানন্দের সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ হওয়ার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। চৈতন্যদেব এই কাহিনিটি ঈশ্বরপুরীর কাছে শুনেছিলেন, তাই সমবেত পরিকরদের সম্মুখে মহাপ্রভুই উপাখ্যানটি ব্যক্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রে নিত্যানন্দের নীরবতার অর্থ এই নয় যে, তাঁর সঙ্গে মাধবেন্দ্রের কোনওদিন যোগাযোগই হয়নি। বৃন্দাবনদাস অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন—

'নিত্যানন্দ কহে যত তীর্থ করিলাম।
সম্যক তাহার ফল আজি পাইলাম।।
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য আমার জীবন।।' [১৬]

১৩. চৈতন্য পরিকর—রবীন্দ্রনাথ মাইতি, পৃ. ৫৬

১৪. গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, পৃ. ৩০

১৫. ভারতবর্ষ, ১৩৩০

১৬. চৈতন্যভাগবত, ১/৮

নিত্যানন্দের জীবনের তৃতীয় সমস্যাটি হচ্ছে তাঁর জাতিসত্তা। তাঁর পিতামাতাকে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বলে উল্লেখ করলেও বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন যে, হাড়াই পণ্ডিত কৃষিকার্যও করতেন—

'কিবা কৃষি কর্মে কিবা যজমান ঘরে।
কিবা হাটে কিবা ঘাটে যত কর্ম করে।।' [১৭]

বৈষ্ণব গবেষক হরিদাস দাস বলেছেন যে, তাঁর উপাধি ছিল বাডুরী।[১৮] এই বাডুরী বা বাডুই একটি শূদ্র জাতির পদবি। অপরদিকে হাড়াই শব্দটি যে শিষ্টসমাজের কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির নাম, এ কথা ভাবতেও অবাক লাগে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে এবং রাঢ় অঞ্চলে নিম্নবর্ণের কোমদের মধ্যে দেবদেবীর আরাধনায় ব্রাহ্মণের পরিবর্তে যজন-যাজনে অংশগ্রহণ করে একশ্রেণির নিম্নবর্ণের পুরোহিত, তাদের বলা হয় 'দেয়াসিন'। এখানে হাড়ি-সম্প্রদায়ের পুরোহিত হিসেবে হাড়াই শব্দটি এসেছে কি না, সে সম্পর্কে কেউ-কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনাতেও বারবার নিত্যানন্দের জাতিকুল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অদ্বৈত আচার্য; তিনি বলেছেন—

'পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছ ভাত।
কুল জন্ম জাতি কেহ না জানে কোথাত।।
পিতা মাতা গুরু নাহি না জানি কিরূপ।
খায় পরে সকল বোলায়ে অবধূত।।' [১৯]

কিংবা,

'জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি হৈল মদ্যপের সঙ্গ।।
গুরু নাহি বোলয়ে সন্ন্যাসী করি নাম। .
জন্ম না জানিয়ে নিশ্চয় কোন গ্রাম।।
কেহো ত না চিনে না জানি কোন জাতি।' [২০]

১৭. তদেব, ২/৩
১৮. গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—হরিদাসদাস
১৯. চৈতন্যভাগবত, ২/১৩
২০. তদেব, ২/১৯

অদ্বৈত আচার্য ছিলেন নৈষ্ঠিক, সদাচারী এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রতি অনেকটাই আস্থাশীল। যদিও তিনি ছিলেন বর্ণভেদবিরোধী, ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর বাধাকে অতিক্রম করে যবন হরিদাসকে ভক্তিধর্মের স্রোতধারায় যুক্ত করেছিলেন। তবুও মনে হয় আজন্ম সংস্কারে লালিত জাতি-অহংকারের একটা ক্ষীণ প্রস্রবণ অন্তর্লীন প্রবাহের মতো অদ্বৈতের অন্তরের গভীরে হয়তো অবশিষ্ট ছিল। তা না হলে অদ্বৈত প্রভুই বা বারংবার নিত্যানন্দের জাতিধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন কেন? অপরদিকে নিত্যানন্দ অবধূত নবদ্বীপে এসে পূর্ব পরিচয় গোপন রাখলেন। সন্ন্যাসীরা না হয় পূর্বাশ্রমের কথা স্মরণ করতে চান না, কিন্তু তিনি গুরুর নাম পর্যন্ত গোপন রাখলেন কেন? এখানে একটা সন্দেহ থেকেই যায় যে, চৈতন্যদেবের সমকালে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে যাঁর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি, সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে যিনি বৈষ্ণব ধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় এনে দাঁড় করিয়েছিলেন, তাঁর পূর্ব-পরিচয় আমাদের কাছে অনেকটাই অজ্ঞাত থেকে গেল।

তবে চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যাচ্ছে, 'লোকে বলে হাড়া ওঝা হইল পাগল।' 'ওঝা' পদবির সংস্কৃত রূপ হচ্ছে উপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'ওঝা' রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের কৌলীন্যসূচক উপাধি। এই সূত্রে নিত্যানন্দ ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় পদবিযুক্ত কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারেও তিনি ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ।[২১] প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাসের উপাধি ছিল 'ওঝা'। ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশজাত। চণ্ডীমঙ্গলের একটি উক্তি থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওঝা কুলে জন্মগ্রহণ করলে 'বাঁড়ুরি' পদবি হয়—'কুলে ওঝা, বাঁড়ুরি পদবী রত্নাকর।'[২২] এখানে শিষ্টসমাজের পদবি হিসেবে বাড়ুরি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং নিত্যানন্দের পিতা বাড়ুরি উপাধিকারী হলেও তিনি ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ বংশজাত। বৃন্দাবনদাসও বলেছেন—

'পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি।।' [২৩]

সুতরাং নিত্যানন্দ যে ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন তা স্বীকার করার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল না।

২১. গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান

২২. কবিকঙ্কণ চণ্ডী—বঙ্গবাসী সং, পৃ. ২১৬

২৩. চৈতন্যভাগবত, ২/৩

তবে পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানাই যে, নিত্যানন্দের বংশ ছিল সমাজচ্যুত এবং জলঅচল। এঁর পূর্বপুরুষ মিহিরের কন্যা অসবর্ণে বিবাহ করায় এই বংশকুলভ্রষ্ট কুলীন বা বংশজরূপে পরিগণিত হয়। নিত্যানন্দদাস তাঁর প্রেমবিলাস গ্রন্থে লিখেছেন—

'মিহিরের কন্যা বিয়া করিলা বংশজের।।
কুল গেল হৈলা সমাজে অচল।
মিহিরের পুত্র ভাস্কর পণ্ডিত প্রবল।
বংশজ বলিয়া তাঁরে সকলে বোলয়।
তাঁর সাথে ভোজ নাদি কেহ না করয়।। প্রেম[২৪]

দুই

নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত। বৃন্দাবনে মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর হৃদয় ভক্তিরসের রসায়নে সিক্ত হয়। নবদ্বীপে এসে নিত্যানন্দ ভক্তিমার্গের নির্মল স্রোতধারায় নিজেকে শামিল করে দণ্ড-কমণ্ডলু ত্যাগ করেন। অন্যধারার এক সাধককে নির্দ্বিধায় ভক্তি-আন্দোলনে যুক্ত করে নিলেন চৈতন্যদেব। তা নিলেও, বাম হাতে কমণ্ডলু, বাম কানে কুণ্ডল, কাঁধে মহাদণ্ডধারী, নীলবস্ত্র পরিহিত এক অবধূতকে নবদ্বীপের সব বৈষ্ণব সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাই তাঁর আচার-আচরণ নিয়ে, তাঁর জাতিকুল নিয়ে, সর্বোপরি নিয়মনিষ্ঠার প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে।

নিত্যানন্দের জীবনাচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, নবদ্বীপ লীলার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন বাল্যভাবে বিভোর। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে শিষ্টতার সীমা লঙঘন করেছিল। নবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীর স্তন্যপান করতেন নিত্যানন্দ, কখনও বা দিগম্বর হয়ে নৃত্য করতেন, কখনও অন্ন-ব্যঞ্জন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছত্রাকার করে দিতেন। এ সব লীলার সময় তাঁর বয়স ছিল বত্রিশ বছর। এই বয়সে ভাবে বিভোর হয়ে দিগম্বর হওয়া কিংবা গৃহস্বামীর স্ত্রীর স্তন্যপান করা যে সমাজবিগর্হিত কাজ, বৈষ্ণবভক্ত চৈতন্য পরিকরেরাও তা বুঝতেন। অদ্বৈত আচার্যের মতো স্থিতধী মানুষের চোখেও নিত্যানন্দের আচরণ অশিষ্ট বলেই মনে হয়েছিল। তাই অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে মাঝে মাঝেই তাঁর কোন্দল বেধে যেত। অদ্বৈত আচার্য তাঁকে শুধু 'মাতাল'

২৪. প্রেমবিলাস গ্রন্থ-নিত্যানন্দদাস

বা 'মদ্যপ' বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাঁকে মাছ-মাংস ভক্ষণকারী বলেও দোষারোপ করেছেন—

'মৎস্য খাও মাংস খাও কেমন সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাম আমি এই দিগবাসী।।...
তারে বলে সন্ন্যাসী যে কিছু নাহি চাহে।
বোলায়ে সন্ন্যাসী দিনে তিনবার খায়ে।।' [২৫]

স্বাভাবিক কারণেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তা হলে কি নিত্যানন্দ তন্ত্রাচারী ছিলেন—মাছ-মাংস খেতেন, মদ্যপান করতেন? এক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, তা যদি হত, তা হলে নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলীতে তিনি স্থান পেতেন না, চৈতন্যদেবের মতো আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্ব নিত্যানন্দকে প্রধান পরিকরের আসনে বসাতেন না, সর্বোপরি বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করতেন না। বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহ্যের পরিপন্থী একটি বিষয় বৃন্দাবন দাসের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি যখন সহজভাবে পরিবেশন করেছেন, তখন বুঝে নিতে হবে যে, এর কোনও গূঢ় অর্থ আছে, আক্ষরিক অর্থ ধরে এর বিচার করলে তা হবে প্রকৃত অর্থের পরিপন্থী। বিষয়টি মীমাংসার আগে আমরা জেনে নিই অবধূত কাকে বলে। ভারতকোষকার জানিয়েছেন, 'যিনি একই সঙ্গে ত্যাগ ও ভোগের অনুসরণ করেন অথচ কোনওটিতেই আসক্ত হন না তিনি অবধূত।'[২৬] অনেকটা পদ্মপাতার মতো। নোংরা-জঞ্জাল পাতা স্পর্শ করলেও, পাতার নির্মলতা ও পবিত্রতা থাকে অক্ষুণ্ণ। তান্ত্রিক মতে অবধূত চার প্রকার, যথা—ভক্তাবধূত, শৈবাবধূত, ব্রহ্মাবধূত ও হংসাবধূত বা পরমহংস। দণ্ডধারী সন্ন্যাসী বারো বছর সাধনায় রত থেকে সিদ্ধিলাভের পর পরমহংসত্ব অর্জন করেন।[২৭] নিত্যানন্দ ছিলেন পরমহংস অবধূত। তিনি নিজেও তা স্বীকার করেছেন—

'স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী।।' [২৮]

২৫. তদেব, ২/২৪
২৬. ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮০
২৭. নির্বাণ তন্ত্র, চতুর্দশ পটল
শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, পৃ. ১২৯
২৮. চৈতন্যভাগবত, ২/২৪

হঠযোগদীপিকার বিবরণ উল্লেখ করে ড. বেলা দাশগুপ্তা বলেছেন, 'নিত্যানন্দ অবধূত, তিনি মহাযোগেশ্বর, যোগীদের মদ্য, মাংস, মৎস্য অবশ্য সেব্য কিন্তু এ স্থলে মদ্যমাংসাদি যৌগিক পরিভাষারূপেই গ্রহণীয়। তান্ত্রিক বামাচারী সন্ন্যাসী বা বীরাবধূতদের (শৈব) পঞ্চতত্ত্ব সেবন বিধেয় হইলেও অনেক শাস্ত্রেই যৌগিক প্রক্রিয়ায় মদ্য বা সোমরস ও মৎস্য মাংসাদি সেবনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দও যৌগিক প্রক্রিয়াতেই পঞ্চতত্ত্ব সেবনে সক্ষম ছিলেন।'[২৯] দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব-ঐতিহ্য অনুসারে নিত্যানন্দ ছিলেন পৌরাণিক বলরাম। পৌরাণিক বলরামের পান-দোষ ছিল, তিনি আকণ্ঠ মদ্যপান করতেন। সেই পরম্পরাকে স্বীকার করেই নিত্যানন্দকে মদ্যপানাসক্ত বলা হয়েছে। তৃতীয়ত, আমরা যাকে মদ বলি, 'চৈতন্যভাগবত'-এ উল্লিখিত 'মদ' শব্দটি যে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বৃন্দাবনদাস তা নিজেই ব্যক্ত করেছেন। নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমনবার্তা শুনে চৈতন্যদেব যখন হলধর-ভাবে 'মদ আন, মদ আন' বলে গর্জে উঠলেন, তখন শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন—

'যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি।।
তুমি যারে বিলাও সেই সে তাহা পায়।' [৩০]

ভক্তি গাঢ় হলে ভক্তের হৃদয়ে মাতলামো ভাব দেখা যায়।[৩১] নীলাচল লীলায় চৈতন্যদেবের এ দশা হয়েছিল। আসলে ভক্তিভাব থেকে উৎপন্ন মদ, যার প্রভাবে ভক্ত মাতাল হয়ে যায়, অর্থাৎ ভক্তিভাবের তুরীয় অবস্থা। ভক্তদের মতে, নিত্যানন্দের মধ্যে ভক্তিভাবের সেই ধারার বিকাশ ঘটেছিল।

তিন

নিত্যানন্দ ছিলেন বেপরোয়া, নির্ভীক, বলশালী এবং জীবন্ত প্রতিবাদ। জ্ঞানদাস তাঁকে মত্ত সিংহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভয়ডর বলতে কিছুই তাঁর ছিল না। বর্ষার ভরা গঙ্গায় উথালপাথাল ঢেউয়ের মাঝে তিনি সাঁতার কেটে বেড়াতেন, নির্ভয়ে কুমির ধরতে যেতেন, ষাঁড়ের পিঠে উঠে মহেশ সেজে বসতেন। অপরের গরুর দুধ দুয়ে খেয়ে নিতেন, গোয়ালার কাছে ঘি, দই কেড়ে নিয়ে পালিয়ে

২৯. শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, পৃ. ১৩১

৩০. চৈতন্যভাগবত, ২/৩

৩১. দেশ, আগস্ট ২০০১, পৃ. ২৫

যেতেন, কুমারী মেয়েদের বিয়ে করতে চাইতেন। সঙ্গীসাথিরা সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে অবহিত করতে চাইলে নিত্যানন্দ প্রক্ষোভে গালিগালাজ করতেন। একবার এক ঘুষিতে অদ্বৈত আচার্যের প্রাণ সংহার করার হুমকি দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, স্বয়ং চৈতন্যদেবকেও ছেড়ে কথা বলতেন না। বৃন্দাবনের বর্ণনায় পাই, নিত্যানন্দ হরিদাসকে বলছেন—

'কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে।
চৈতন্য বলিস যারে ঠাকুর করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া।।' [৩২]

কুড়ি বছর তীর্থে-তীর্থে ঘুরেছেন নিত্যানন্দ, অবধূত ব্রত পালন করেছেন, অবশেষে নবদ্বীপে এসে দণ্ড-কমণ্ডলু ভেঙে চৈতন্যচরণে ভক্তিমান হয়েছেন। চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা। অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন তাঁকে, শ্রদ্ধাও করেন, তবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। এখানেই নিত্যানন্দ চরিত্রের ব্যঞ্জনাময় বৈশিষ্ট্যটি আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে নিত্যানন্দের অবদান অসামান্য। তিনি ছিলেন চৈতন্যদেবের চিন্তাচেতনার প্রকৃত রূপকার। নবদ্বীপ লীলায় তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ জগাই-মাধাই উদ্ধার। চৈতন্যদেব কীর্তনের নব-রূপায়ণ ঘটিয়ে নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজকে মাতোয়ারা করে তুললেন। যে কীর্তন ছিল ভক্তের নিজস্ব সম্পদ, ঈশ্বর আরাধনার মহামন্ত্র, চৈতন্যদেব তাকে করে তুললেন সর্বজনীন। নগরকীর্তন তো চৈতন্যদেবেরই সৃষ্টি। শুধুমাত্র বৈষ্ণব সমাজকে নয়, তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র মানবসমাজকে কীর্তন-সংগীতের প্লাবনে ভাসিয়ে দিতে। আর সে জন্যেই নবদ্বীপ নগরীর আপামর জনের কাছে নামগান পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করলেন চৈতন্যদেব—দায়িত্ব দিলেন নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে। এখানেও কেমন দূরদর্শিতা তাঁর, এত পরিকর থাকতে তিনি এমন দুজনকে এ কাজের জন্য নির্বাচন করলেন যাঁদের একজন হলেন যবন আর অপরজন হলেন অবধূত। এঁরা দুজনেই বহিরাগত, চৈতন্যভক্ত।

প্রকাশ্য রাস্তায় নামসংকীর্তন করতে দেখে নবদ্বীপের পাষণ্ডীরা, শিষ্টসমাজের স্মার্তরা, অভিচারী তন্ত্র-সাধকেরা খেপে উঠল। এ কাজকে তারা চৈতন্যের 'পাগলামি' বলে অপপ্রচার চালাতে লাগল। আবার যাদের অন্তরে ভক্তিভাবের উল্লাস ঘটেছে, বিশেষ করে রক্ষণশীল শিষ্টসমাজের পেষণে জর্জরিত যে সকল মানুষ জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচেছিল এতদিন, তারা চৈতন্যদেবের সংকীর্তনকে

৩২. চৈতন্যভাগবত, ২/১৩

সাদরে গ্রহণ করল। হাতে তালি দিয়ে নেচে-নেচে তারা গাইতে লাগল—

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।' [৩৩]

এইভাবে সমগ্র নবদ্বীপ নগরীতে সুমধুর কৃষ্ণনাম প্রচার করে চলেছেন হরিদাস ও নিত্যানন্দ। একদিন তাঁরা দুই মদ্যপের সাক্ষাৎ পেলেন। সেদিন মারমুখী জগাই-মাধাই দুই ভক্তকে তাড়া করেছিলেন। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেও নিত্যানন্দ মনে মনে এই দুই পাপীকে উদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। অপর একদিন রাত্রে নিত্যানন্দ তাঁদের কাছে নাম বিতরণ করতে যেতেই মাধাই মুটকি ছুড়ে মারলেন, নিত্যানন্দের কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। আহত নিত্যানন্দ ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে বললেন—

'মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাতে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই।।' [৩৪]

চৈতন্যদেব খবর শুনে দলবল সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুই পাষণ্ডীকে সংহার করতে চাইলে নিত্যানন্দ বাধা দিলেন, বললেন, মাধাই মারলেও জগাই তাঁকে রক্ষা করেছেন, দু-এক ফোঁটা রক্ত পড়েছে ঠিকই তবে তাতে তাঁর দুঃখ নেই। অত্যাচারীর প্রতি এই ঔদার্য, এই মমত্ববোধ নিত্যানন্দকে বৈষ্ণব সমাজের অত্যুচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর এই উদারতা জগাই-মাধাইকেও করেছিল বিচলিত, তাই তাঁরা চৈতন্যচরণে ভক্তিমান হয়েছিলেন। ক্ষতবিক্ষত নিত্যানন্দ যন্ত্রণার কথা ভুলে উচ্চারণ করেছিলেন বৈষ্ণবোচিত নির্বেদ—

'কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিল মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত।।' [৩৫]

এই ঘটনার পর নিত্যানন্দের খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ল। চৈতন্যদেবও বুঝলেন তাঁর স্বপ্ন সফল করার জন্যে নিত্যানন্দই যোগ্য ব্যক্তি। তাই নবদ্বীপ লীলার প্রায় সবক্ষেত্রেই নিত্যানন্দকে দেখি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। সন্ন্যাস গ্রহণেব

৩৩. তদেব, ২/১

৩৪. চৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস, মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, পৃ. ১২২

৩৫. চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ২/১৩

পর চৈতন্যদেব যখন দণ্ড ধারণ করলেন, তখন দণ্ড রক্ষার জন্য একটি হাত সদাসর্বদা আবদ্ধ থাকত। নিত্যানন্দ দণ্ডটিকে ভেঙে শ্রীচৈতন্যের দুটি হাতই উন্মুক্ত করে দিলেন, ভক্তি বিতরণের জন্য, মানবজাতির মুক্তির জন্য। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, মধুর ভাবকে প্রাধান্য দিয়ে রাগানুগা ভক্তিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্য একদিকে যেমন বৃন্দাবনের গোস্বামীদের পরামর্শ দিচ্ছেন চৈতন্যদেব, তেমনি অপরদিকে সংসারধর্ম গ্রহণ করে সমাজের সর্বস্তরে বৈষ্ণব ধর্মের বীজ রোপণ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন নিত্যানন্দকে। চৈতন্যদেব মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিষ্টসমাজের জন্য যেমন পৌরাণিক পরম্পরা প্রয়োজন, বৈষ্ণবীয় স্মৃতির প্রয়োজন, তেমনি ব্রাত্য জনের জন্য প্রয়োজন মানবিক বোধে সঞ্জাত ভক্তিধর্মের নির্মল স্রোতধারা।

চার

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর বাংলায় ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব যাঁদের উপর অর্পিত হল, নিত্যানন্দ ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। দাস্যভাবের উপাসক ছিলেন তিনি। অবশ্য কেউ-কেউ তাঁকে সখ্যভাবের উপাসক রূপে চিহ্নিত করেছেন। 'নীলাচল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি নীল-পীত বহুবিধ পট্টবাসে ও বিবিধ অলংকাবে ব্রজসখার বেশও ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রজপরিকরদের মধ্যে বলরামের ছিল শ্রীকৃষ্ণের· প্রতি সখ্যভাব। নিত্যানন্দেরও ছিল সেইভাব, সেইজন্য তিনি বলরাম বেশেই সজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীচৈতন্যের প্রতিও তাঁহার সখ্যভাব, উভয়কেই নিত্যানন্দ অভীষ্ট দেবতারূপে গণ্য করিতেন।'[৩৬]

নিত্যানন্দকে পেয়ে বঙ্গের বৈষ্ণব সমাজে আবার নতুন করে উন্মাদনা দেখা দিল। চৈতন্যদেবের অভাবে যাঁরা প্রাণহীন হয়ে পড়েছিলেন, মৃতসঞ্জীবনীর স্পর্শে তাঁরা আবার নবজীবন ফিরে পেলেন। ভক্তরা একে একে পানিহাটিতে এসে নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন। এই পানিহাটি থেকেই শুরু হল বঙ্গে ধর্মপ্রচারের নবপর্যায়। চৈতন্যদেব নবদ্বীপে ভক্তিধর্মের যে বীজ রোপণ করেছিলেন, নিত্যানন্দের জলসিঞ্চনে তা মহিরুহে পরিণত হল। খোল-করতাল সহ দলবল নিয়ে নিত্যানন্দ গ্রামে-গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। তিনি ছিলেন অহংকারহীন, জাত্যভিমানহীন, সহজ-সরল প্রকৃতির এমন একজন মানুষ, যাঁকে পেয়ে বঙ্গের অন্ত্যজশ্রেণির আপামব

৩৬. শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, পৃ. ১৫৪

জনেরা নতুন করে বাঁচার মন্ত্র খুঁজে পেল। আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন চৈতন্যদেব, বস্তুত নিত্যানন্দই ছিলেন তার প্রকৃত রূপকার। বর্ণভেদকে তিনি মনে-প্রাণে অস্বীকার করেছিলেন। গ্রামে-গ্রামে ধর্মপ্রচারের কালে তিনি শূদ্র-গৃহে থাকতেন, তাদের হাতে অন্নজল গ্রহণ করতেন। তাঁর জীবনাচরণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। লোচনদাসের একটি পদে পাই—

'চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা।
হরি নাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া।।
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি।।' [৩৭]

সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় যে জন, পতিত যে জন, হিন্দু সমাজ এতদিন যাদের কথা মনে রাখেনি, নিত্যানন্দ তাদের জন্য দু-হাত ভরে প্রেম নিয়ে এলেন। এ প্রেমে কোনও কৃত্রিমতা নেই, কোনও আবিলতা নেই, শুধুমাত্র ভক্তি থাকলেই এই প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করা যায়। পানিহাটি থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত সংখ্যাতীত জনপদের মানুষ নিত্যানন্দের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে, তাঁর চরণে ভক্তিমান হয়েছিলেন। আসলে আপামর জনগণকে আপন করে নেওয়ার কৌশল ছিল তাঁর করতলগত।

বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে নিত্যানন্দকে নির্বাচন করে চৈতন্যদেব যে দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তা স্বীকার না করে উপায় নেই। বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারণ তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হতে পেরেছিল একমাত্র নিত্যানন্দের সার্বিক প্রচেষ্টায়। 'মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাঞি।'—এ কথা বললেও চৈতন্যদেব অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করতে পারেননি। তিনি সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছেন, নানাস্থানে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, কিন্তু শূদ্র-বাড়িতে অন্নগ্রহণ করেছেন—এমন নজির কোথাও নেই। কিন্তু নিত্যানন্দ ছিলেন ব্যতিক্রমী চরিত্রের মানুষ, কথা আর কাজের মধ্যে সীমাহীন সামঞ্জস্য তাঁকে এতটাই জনপ্রিয় করে তুলেছিল যে, আট থেকে আশি সব বয়সের মানুষ তাঁর নগরকীর্তনে অংশগ্রহণ করত। শুধু তাই নয়, কুলের বউ-ঝিরা, যারা এতদিন অন্দরমহলে পরদানশিন ছিল, তারাও কীর্তনের দলে অংশগ্রহণ করত। প্রকৃতপক্ষে নারীর স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং ধর্মাচরণে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিত্যানন্দই ছিলেন প্রথম যাজ্ঞিক। ফলে তাঁর ধর্মান্দোলন সে যুগের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

৩৭. গৌরপদতরঙ্গিণী, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, প্রথম উচ্ছ্বাস, ২৫নং পদ

বল্লালি শাসনে সুবর্ণ বণিকেরা হয়েছিলেন পতিত, জল-অচল, অধিকারহীন। সপ্তগ্রামে পৌঁছে নিত্যানন্দ বণিক সমাজকে উদ্ধার করলেন, বৈষ্ণব সমাজে তাদের স্থান করে দিলেন, কৃষ্ণভজনের অধিকার প্রদান করলেন এবং প্রতি ঘরে-ঘরে কীর্তনের আসর বসালেন। সমাজ-পরিত্যক্ত পতিতশ্রেণিকে উদ্ধার করে তিনি স্মার্ত বিধি-বিধানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। সমাজজীবনে শুরু হয়ে গেল এক জাগরণ, যাকে আমরা জনজাগরণ আখ্যায় ভূষিত করতে পারি।

'নিত্যানন্দ-প্রচারিত ভক্তি-প্রেমের বাণী জাতিধর্ম ও শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে জনগণের মর্মে পৌঁছাইয়াছিল; তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবধারার আদর্শেও গণমানস উদ্বোধিত হইয়াছিল।'[৩৮] সমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে, বিশেষ করে বৈশ্য ও শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্মের প্রভাব এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, বঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার প্রশ্নে নিত্যানন্দের অসামান্য অবদান স্বীকার না করে উপায় নেই। ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'বৈষ্ণবধর্মে ব্রাহ্মণদের কঠোরতা ও ছুঁৎমার্গ নাই। কাজেই ইহার অপেক্ষাকৃত উদার ছায়ায় অনেকেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নিত্যানন্দকে তাঁহার ভক্তগণ পতিতপাবন বলেন। তিনি স্বয়ং জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্রাহ্মণদের বিপক্ষতাচারণ করিয়া সকলকে কোলে নিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু বাংলার প্রথম সমাজ-বৈপ্লবিক ছিলেন।'[৩৯] সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ যতটা দৃপ্ত হতে পেরেছিলেন, চৈতন্যদেবের পরিকরদের মধ্যে আর কেউ ততটা পারেননি। মানবিক বোধে সঞ্জাত ভক্তিবাদের রসসিঞ্চনে তিনি সমাজকে রসসিক্ত করে তুলেছিলেন। ফলে প্রচলনির্ভর সমাজজীবনে আচার-বিচারের কঠোরতা, জাতপাতের বিড়ম্বনা এবং শাস্ত্রাচারের নামে কশাঘাত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমাজজীবনে নেমে এসেছিল মুক্তির স্বাদ, সে মুক্তি সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি, মানবাত্মার মুক্তি।

চৈতন্যদেব যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন নবদ্বীপে, নিত্যানন্দের হাতে পড়ে তা আরও পল্লবিত হয়ে উঠল। চৈতন্যদেব আন্তরিকভাবে কিছু মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ ত্রিভুবন উদ্ধার করলেন। বৃন্দাবনের কথায় শুনি—

৩৮. শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, পৃ. ১৯২

৩৯. বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ২৭

'আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন।।'[৪০]

এখানেই নিত্যানন্দের অবদান স্বীকৃত। নিত্যানন্দ ছিলেন সব বিষয়েই দুর্মর, যে সংকল্প অন্তরে গ্রহণ করতেন তাকে বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হতেন না। ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রেও নিত্যানন্দ-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

পাঁচ

নীচ জাতির সঙ্গে মেলামেশা, দৃষ্টিনন্দন পট্টবাস ও স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হয়ে নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার করার অভিনব প্রথাকে অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি। কেউ-কেউ চৈতন্যদেবের কাছে অভিযোগও করেছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দের প্রতি চৈতন্যদেবের আস্থা এতটাই গভীর ছিল যে, তিনি তাদের আমল দেননি। বলেছিলেন—

'শুন বিপ্র মহা অধিকারী যেবা হয়।
তবে তার দোষ গুণ কিছু নাহি লয়।।
পদ্মপাত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্মল।।'[৪১]

এত বড় ছাড়পত্র তিনি বোধহয় আর কাউকেই দিয়ে যাননি। নিত্যানন্দের সব কাজকেই তিনি নির্বিচারে সমর্থন করেছিলেন। তবু তাঁর প্রকটকালে এবং অপ্রকটের পর তাঁকে ঘিরে যে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' বারবার তার উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক গবেষকদের মধ্যেও কেউ কেউ তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়েছেন, তাঁর দোষত্রুটি নিয়েই মগ্ন থেকেছেন তাঁরা। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই যে, তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং স্বমহিমায় ভাস্বর। তাঁর জীবনাচরণ প্রচলনির্ভরতাকে অতিক্রম করেছিল, সামাজিক নিয়মনীতিকে অস্বীকার করেছিল। এতদ্ব্যতিরেকে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে ভক্তিবাদের সঙ্গে যোগাচার যুক্ত হওয়ায় অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবু মানতেই হবে যে, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে নিত্যানন্দের অসামান্য অবদান তাঁর সমস্ত

৪০. চৈতন্যভাগবত, ৩/৫

৪১. তদেব, ৩/৬

দোষত্রুটিকে ম্লায়মান করে দিয়েছে। এডওয়ার্ড সি. ডিমোকের (Edward C. Dimock) মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরাও স্বীকার করেছেন যে, বৈষ্ণবধর্মে এখনও যেটুকু সাম্যবাদ অবশিষ্ট আছে, তার জন্য সবটুকু কৃতিত্বই নিত্যানন্দের প্রাপ্য।[৪২] এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

চৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর সূর্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করে খড়দহে এসে সংসার পাতলেন নিত্যানন্দ। 'গৌরপদতরঙ্গিণী', 'নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে অবগত হওয়া যায় যে, নিত্যানন্দকে বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব স্বয়ং। 'চৈতন্যভাগবতে' এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে। চৈতন্যদেব বলেছেন—

'বসুধা-জাহ্নবা নামে লক্ষ্মী সরস্বতী।
করিহ দোঁহারে বিভা পূর্বের রেবতী।।' [৪৩]

'অদ্বৈত প্রকাশ' ও 'নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার' গ্রন্থ অনুযায়ী নিত্যানন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে বসুধাকে বিবাহ করেছিলেন আর জাহ্নবাকে পেয়েছিলেন যৌতুকে। উত্তরকালে বসুধার গর্ভে পুত্র বীরভদ্র ও কন্যা গঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। বীরভদ্র প্রভু বৈষ্ণব ধর্মের উদারতাকে আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী বারোশো নেড়া ও তেরোশো নেড়িকে বৈষ্ণব ধর্মে স্থান দিয়ে নজির সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। অবশ্য এর ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রকট হয়ে উঠেছিল ভ্রষ্টাচার। 'জাত বোষ্টম' নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি সহজিয়া গোষ্ঠী ধর্মকে বর্ম করে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে রইল। ব্যাঙ্গাত্মক একটি ছড়া এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—

'মাগুর মাছের ঝোল।
ভর-যুবতীর কোল।।
বোল হরি বোল।।' [৪৪]

চৈতন্যদেবের উচ্চ আদর্শ, নৈষ্ঠিকতা—উত্তরকালের ভক্তদের হাতে অনেকটাই উপেক্ষিত হয়ে রইল। যে চৈতন্যদেব নারীসঙ্গলিপ্সু ছোট হরিদাসকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন, মুখ পর্যন্ত দর্শন করেননি, সেই বৈষ্ণব ধর্মের এই পরিণতি তিনি কি আশা করেছিলেন?

৪২. The place of the Hidden Moon—Edward C. Dimock.

৪৩. চৈতন্যভাগবত, ৩/১৩

৪৪. দেশ, ১৮ আগস্ট, পৃ. ২৮

তবে নিত্যানন্দ ছিলেন উচ্চমার্গের সাধক, প্রকৃত অর্থেই সিদ্ধপুরুষ। তাঁর জীবনাচরণ শুধুমাত্র লোকশিক্ষার নিমিত্ত। সাধারণের চোখে কোনও আচরণ গর্হিত মনে হলেও, তাঁর কাছে ছিল লীলা মাত্র। মানব-সমাজের উদ্ধারকল্পে তিনি ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সংস্কারের বেড়াজালকে ছিন্ন করে আচণ্ডালে প্রেম বিতরণের ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান সেকালের অনড় সমাজজীবনকে এতটাই আলোড়িত করেছিল যে, তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

বঙ্গে নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচারের প্রভাব—

প্রথমত, জাতিভেদের দুরতিক্রম্য বাধাকে তুচ্ছ করে শূদ্র ও বৈশ্য জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন নিত্যানন্দ। ব্রাত্যসমাজে উদার বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে সামাজিক চলমানতা বৃদ্ধি পেল, উপেক্ষিত-নির্যাতিত মানুষ নতুন করে বাঁচার মন্ত্র খুঁজে পেল, ফলে নিম্নস্তরে বর্ণান্তর রোধ সম্ভবপর হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা হচ্ছে ভক্তি, সংসারজীবনে আসক্ত মানুষরাও যে ভক্তিবাদে উপেক্ষিত নন, ব্রাত্য নন—বাস্তব ভিত্তির উপর এ তথ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আজন্মের সংস্কার ত্যাগ করে সংসারধর্ম গ্রহণ করেছিলেন নিত্যানন্দ। মানব-সমাজের মুক্তির জন্য তাঁর এই মহান ত্যাগের কথা বৈষ্ণব-সমাজ মনে রাখেনি।

তৃতীয়ত, পানিহাটিতে রঘুনাথদাসের অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত দণ্ডমহোৎসবের পঙক্তি ভোজনে জাতিভেদকে অস্বীকার করে নজির সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক পঙক্তিতে ভোজন করিয়ে তিনি এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। রমাকান্ত চক্রবর্তীর মতে, এটি ছিল জাতপাত-বিরোধী প্রথম বড় বৈষ্ণব উৎসব।[৪৫] সেকালের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাটি রক্ষণশীল সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

চতুর্থত, সমাজ পরিত্যক্ত, পতিতজনদের নামগানের অধিকার প্রদান করে তিনি 'পতিতপাবন' অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন।

পঞ্চমত, পূজা-পার্বণে ব্রাহ্মণের অসপত্ন অধিকারকে খর্ব করে তিনি স্মার্ত বিধিবিধানকে উল্লঙ্ঘন করার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন। কৃষ্ণ-ভজনে ভক্ত নিজেই উপাসনার অধিকারী, সেখানে ব্রাহ্মণের খবরদারি স্বীকার করা হয়নি। বেদ-বিরোধী এই নির্দেশ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, ফলত নিত্যানন্দকে অনেক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

ষষ্ঠত, নিত্যানন্দ ছিলেন অসীম সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি

---

৪৫. তদেব

বুঝেছিলেন স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতিরোধের মুখে বৈষ্ণব ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন সঙ্ঘশক্তির (Mission)। এই বিচারে বারোজন ভক্তকে 'গোপাল' এবং অপর বারো জনকে 'উপ-গোপাল' আখ্যা দিয়ে বাংলার গ্রামে গঞ্জে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত করে তিনি অভূতপূর্ব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই গোপালদের মধ্যে আবার তিনজন ছিলেন শূদ্র সম্প্রদায়ের।

সপ্তমত, ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি চৈতন্যচরিতকাব্য রচনায় ভক্তদের প্রাণিত করেছিলেন নিত্যানন্দ। চৈতন্য-জীবনী রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য অথবা ঘনিষ্ঠ। চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবনদাস তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন, জয়ানন্দের মাতা রোদনী 'ঋষি নিত্যানন্দের দাসী' ছিলেন, প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দদাস নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজও 'নিত্যানন্দ তত্ত্ব নিরূপণ' অধ্যায়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা স্বীকার করেছেন। বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, বলরামদাস, শশিশেখর, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস প্রমুখ পদকর্তা তাঁর অনুগামী ছিলেন।

অষ্টমত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মের উদারতার প্রশ্নে নিত্যানন্দ বোধহয় চৈতন্যদেবকেও অতিক্রম করেছিলেন। স্ত্রী-জাতিকে ধর্মাচরণের অধিকার প্রদান ছিল তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি। তাঁর ধর্মপ্রচারে উৎসবে অনুষ্ঠানে স্ত্রীজাতির অংশগ্রহণ ছিল অবাধ। 'জাহ্নবীর দুই কূলে যত গ্রাম আছে'—তার প্রতিটি গ্রামে দলবল সহ নিত্যানন্দ যখন কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা, উৎসবে অনুষ্ঠানে মগ্ন, তখন সেই দলে স্ত্রীলোকেরাও অংশগ্রহণ করত। চৈতন্যদেবের এতে আপত্তি ছিল। তিনি জানতেন নারীজাতির সংসর্গ এড়িয়ে না চললে তাঁর আজীবনের স্বপ্ন বৈষ্ণব ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা সমাজে হ্রাস পাবে। বৌদ্ধ ধর্মের করুণ পরিণতির কথা তিনি বিস্মৃত হয়ে যাননি, নারীসঙ্গলিপ্সু ভ্রষ্টাচারী বৌদ্ধদের তিনি দেখেছিলেন। তাই নিত্যানন্দকে বলেছিলেন—

'মহোৎসবে মাগি যায় নাচে সংকীর্তনে।
হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোন জনে।।' [৪৬]

নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর কথা অমান্য করতেন না। ব্যাসপূজার সময় হাতের মালা চৈতন্যদেবের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে নিত্যানন্দ তাঁকে পূজ্যপাদ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি প্রতিবাদ না করে পারেননি। তিনি বলেছিলেন, 'কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে'।

৪৬. চৈতন্যমঙ্গল—জয়ান

চৈতন্যদেবও এ কথার তাৎপর্য অনুধাবন করে আর আপত্তি করেননি। ফলে নিত্যানন্দের ভক্তিধর্মে স্ত্রী-জাতি সসম্মানে গৃহীত হয়েছিল। এখানেই নিত্যানন্দ-চরিত্রের বাস্তবোচিত দিকটি আমাদের সম্মুখে বিকশিত হয়ে ওঠে। উত্তরকালে তাঁর পত্নী জাহ্নবাদেবী, কন্যা গঙ্গাদেবী, অদ্বৈত-পত্নী সীতাঠাকুরানি এবং শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতা বৈষ্ণব গুরু হিসেবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনে এটি ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

নবমত, জাতীয় সংহতি স্থাপনে নিত্যানন্দের অবদান অনস্বীকার্য।

দশমত, মানব-কল্যাণের জন্য নিত্যানন্দ জীবনের সব আদর্শকে তুচ্ছ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। নিত্যানন্দ ছিলেন বিরক্ত সন্ন্যাসী। চৈতন্যদেবের নির্দেশে সন্ন্যাস-আশ্রম হতে বিমুক্ত নিত্যানন্দ সংসার-জীবনে প্রবেশ করে যে অশাস্ত্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মূলে ছিল গৃহস্থাশ্রমের অপার মহিমা কীর্তন করা। এখানেই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তাঁর কল্যাণকামী চেতনার মানবিক দিকটি। যা সচরাচর আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, নিত্যানন্দ ছিলেন স্তম্ভস্বরূপ। বাধা-বিপত্তিকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন, মানব-কল্যাণকেই তিনি জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি 'সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ রায়।'
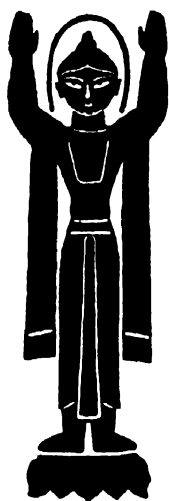
চৈতন্যদেবের জন্মস্থান প্রসঙ্গ

জন্মস্থান বিতর্কের সূচনাপর্ব

মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ছিলেন মহামানব শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর মনীষা ছিল দিগন্তপ্রসারিত। শুধু বাংলায় নয়, ওড়িশায় নয়, বৃন্দাবনে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের এক বৃহত্তর অংশ তাঁর দীপ্তিময় প্রতিভার স্পর্শে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সেদিন। রাজা, রাজ-অমাত্য ও প্রতিভাবান পণ্ডিত ব্যক্তিত্বসহ সংখ্যাতীত আপামর জনগণ ছিলেন চৈতন্যদেবের অনুগামী। সামাজিক অচলায়তনকে ভেঙে তিনি যে নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আজ পাঁচশো বছর পরেও চৈতন্যদেবের সামাজিক অবদান নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে ব্রতী রয়েছেন বিশ্বের তাবড়-তাবড় সমাজবিজ্ঞানী—এ সংবাদ আমাদের কাছে যেমন আনন্দের, তেমনি গর্বের।

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভার অধিকারী শ্রীচৈতন্যদেব। ভাগীরথীর ভাঙনে বারংবার বিধ্বস্ত হয়েছে নবদ্বীপ নগরী। চৈতন্যদেবের জন্মস্থান-সহ প্রাচীন নবদ্বীপ বিলীন হয়ে গেছে

গঙ্গাগর্ভে। ফলে তাঁর জন্মস্থান প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত হয়েছে। প্রধানত চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বিষয়ক তিনটি মতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—

১) বর্তমান ভাগীরথীর পূর্বে, কাজির বাড়ির দক্ষিণে 'বল্লাল ঢিবি' সংলগ্ন 'মায়াপুর' নামক স্থানটিকে চৈতন্যদেবের জন্মস্থানরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁর সম্প্রদায়।

২) বর্তমান নবদ্বীপ নগরীর উত্তরে এবং ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন মায়াপুর নামক স্থানটিকে তাঁর জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ব্রজমোহন দাস বাবাজি ও তাঁর অনুগামীরা।

৩) বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তারা চৈতন্য-জন্মস্থান হিসেবে যে স্থানটিকে চিহ্নিত করতে চাইছেন তার অবস্থান হচ্ছে বর্তমান নবদ্বীপ নগরী ও জাহান্নগরের মাঝ বরাবর দহের উত্তরে অবস্থিত বাবলারি গ্রাম সংলগ্ন অঞ্চল।

আমরা প্রাগুক্ত তিনটি মতকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান নিরূপণে প্রয়াসী হব।

চৈতন্যদেবের জন্মস্থান-বিতর্ক অর্বাচীনকালের। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন নদিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেদারনাথ দত্ত এই বিতর্কের উদ্ভাবক। সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের বহু পূর্বে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নাম হয় আচার্য শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর। বৈষ্ণব সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত মানুষ, ভক্ত মানুষ, 'গৌড়ীয় মিশন' স্থাপন করে বৈষ্ণব ধর্মকে প্রচার করার যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা প্রশংসার যোগ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আজ বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেছে, শুধুমাত্র তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনার কল্যাণে। বিংশ শতকে বৈষ্ণব ধর্মের যে বিপুল প্রসারণ ঘটেছে, তার উৎস যে সঙ্ঘশক্তির অবদান, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রখ্যাত গবেষক ড. রমাকান্ত চক্রবর্তীর একটি বক্তব্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে উদ্ধৃত করা হল—'It is indeed significant that Nabadwipa still provided Vaisnava Leadership, through the neighbouring area of Krishnanagar patronised the saktas and through a rival Vaisnava centre was built up in adjacent Mayapur.'[১]

১. Vaisnavism in Bengal—Dr. Ramakanta Chakrobarty, P-318

আচার্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্মজীবনে ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আজীবন যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তব পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি বহু সমস্যার সমাধান করেছেন। অথচ চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরূপণের ক্ষেত্রে তিনি বস্তুবাদকে প্রত্যাখ্যান করে ভাববাদকে প্রাধান্য দিলেন—যুক্তিবাদীদের কাছে যার কোনও মূল্য নেই। তিনি যে সমস্ত অলৌকিক বিষয়ের উপর আস্থা স্থাপন করে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেগুলি হল—(১) স্বপ্নাদেশ, (২) আলেয়ার আলো, (৩) তুলসীবৃক্ষ ইত্যাদি। বিস্তারিত তথ্য হল, তিনি স্বপ্নাদেশ পান যে, 'মিঞাপুর' (মায়াপুর) নামক স্থানেই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান। এরপর একদিন গভীর রাত্রে মিঞাপুরের অনতিদূরে গাদিগাছায় অবস্থিত তাঁর ভজনস্থলীর ছাদ থেকে প্রাগুক্ত স্থানে আলো জ্বলতে দেখেন এবং সরজমিনে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেখানে অসংখ্য তুলসীগাছ দেখতে পান। এর ফলে তাঁর প্রতীতি জন্মে যে, এখানেই ছিল চৈতন্যদেবের জন্মস্থান, 'মায়াপুর'। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, স্বপ্ন হচ্ছে নিদ্রিত মানুষের অবচেতন মনের অবাস্তব অনুভূতি। বস্তুবাদীদের কাছে স্বপ্ন মূল্যহীন। দ্বিতীয়ত, গ্রামেগঞ্জে যারা বাস করেন তারা জানেন যে, জলাভূমি, কবরস্থান বা অনাবাদি জমিতে কখনও কখনও রাতের অন্ধকারে সঞ্চরণশীল একপ্রকার আগুনের গোলা দৃষ্টিগোচর হয়। এটি আলেয়া নামে পরিচিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, উদ্ভিজ্জ বা মৃত প্রাণীদেহের পচনের ফলে উদ্ভূত মিথেন ও ফস্‌ফিন (PH_3) বা ফস্‌ফরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাসই আলেয়ার উৎপত্তির কারণ।[২] আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ কীভাবে আলেয়ার খপ্পরে পড়ে বাস্তব বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিলেন তা বোধগম্য নয়। তা ছাড়া চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হওয়া উচিত বৈদিক ব্রাহ্মণ পল্লিতে। মিঞাপুরে মুসলমানদের কবরস্থানকে গৌরগৃহ রূপে চিহ্নিত করায় তা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। তৃতীয়ত, সরস মাটিতে তুলসীর বীজ পড়লে তা থেকে গাছ জন্মানোটাই প্রকৃতির নিয়ম; সুতরাং মিঞাপুরের কবরস্থানে তুলসীর বন দেখে সেখানে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান ছিল বলে যে সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন, তা অবাস্তব এবং অনৈতিহাসিক পদক্ষেপ। তা ছাড়া কাজির বাড়ির দক্ষিণে 'মায়াপুর' নামক স্থানে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান ছিল—এ কথা স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে বৈষ্ণব ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা। কাজি দলনের দিন পথ পরিক্রমা বিষয়ে গদাধরের শিষ্য উদ্ধবদাসের একটি পদে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে—

ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮

'কাজীরে দলন করি ভক্ত সঙ্গে গৌরহরি
দক্ষিণেতে করিলা প্রস্থান।।' [৩]

বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে কাজির বাড়ি ছিল সিমলিয়া গ্রামে। এই গ্রামের দক্ষিণে যে ব্রাহ্মণপল্লি ছিল না, ছিল শূদ্রপল্লি, বৃন্দাবনদাস তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, কাজি দলনের পরে চৈতন্যদেব তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে শঙ্খবণিক নগর ও তন্তুবায় নগরে ভ্রমণ করেছিলেন এবং এর পরে গিয়েছিলেন গাদিগাছা গ্রামে শ্রীধরের বাড়ি।[৪] গাদিগাছা গ্রামটি এখনও স্বমহিমায় বিরাজিত। সুতরাং সিমলিয়া ও গাদিগাছার মাঝ বরাবর যে স্থানটিকে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান মায়াপুর রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেকালে সেই স্থানটি যে নবদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল না, এমনকী ব্রাহ্মণপল্লিও নয়—প্রাগুক্ত আলোচনায় তা স্পষ্টীকৃত হয়েছে। অতএব, 'মায়াপুর' প্রকৃত অর্থে মিঞাপুর, এটি কোনওভাবেই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হতে পারে না।

এদিকে নবদ্বীপের মহান্তরা, ভক্তরা এবং ছোট কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা প্রমাদ গুনলেন। তাঁদের রুজি-রোজগার বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। চৈতন্যদেবের জন্মস্থান যে মায়াপুর নয়, নবদ্বীপ—এ কথা প্রমাণ করার জন্য তাঁরাও উঠেপড়ে লাগলেন। ইতিমধ্যে ভক্তপ্রবর ব্রজমোহনদাস বাবাজি নবদ্বীপে এসে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরূপণে আত্মনিয়োগ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পর ইনি বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখান থেকে নবদ্বীপে এসে শ্রীদাস বোরিং যন্ত্রের সাহায্যে কূপ খনন করে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরটির অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি সফলতা অর্জন করতে পারেননি। অবশেষে রামচন্দ্রপুর নামক স্থানে ভগ্ন মন্দিরের একখণ্ড পাথর উদ্ধার করে ওই স্থানটিকে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং স্থানটির নামকরণ করেন 'প্রাচীন মায়াপুর'—যা ইতিহাসসম্মত নয়। এর ফলে প্রকারান্তরে 'মায়াপুর' তত্ত্বটিকে স্বীকার করে নেওয়া হল। অবশ্য ইতিপূর্বে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী 'নবদ্বীপ তত্ত্ব' নামক একটি গ্রন্থে 'মায়াপুর' তত্ত্বকে নস্যাৎ করেছিলেন। কিন্তু সে ধারাটি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

এবারে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরটি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

৩. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান' ভারতবর্ষ, পৃ. ৭০৩

৪. চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস, সুকুমার সেন সম্পাদিত, ২/২৩

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৭৪৯-১৭৯৩ খ্রি.) ছিলেন কান্দি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান। শেষ বয়সে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে নবদ্বীপে আসেন এবং ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ৬০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কালো পাথরের একটি নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করে গোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র ও মদনমোহনের মূর্তি স্থাপন করেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের প্রলয়ংকর বন্যায় মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রেভারেন্ড জেমস্ লঙ বলেছেন, 'Ganga Govinda Singh erected a temple over 60 ft high which was washed away 25 years ago by the river. It was at Ramchandrapur.'[৫] পললসমাধিপ্রাপ্ত মন্দিরটির চূড়া ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের বন্যায় সাময়িকভাবে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়।[৬]

অনেকের মতে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরটি আবিষ্কার করতে পারলেই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান-বিতর্কের সমাধান হবে। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরটি যে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থানেই নির্মিত হয়েছিল, এমন কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, আর তাঁর মূল উদ্দেশ্যও তা ছিল না। দ্বিতীয়ত, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন সেটি শ্রীচৈতন্যের মন্দির ছিল না, সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মস্থানে মন্দিরটি নির্মাণ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তৃতীয়ত, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নবদ্বীপে এসেছিলেন অষ্টাদশ শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে, তখন চৈতন্যদেবের জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, স্বাভাবিক কারণেই চৈতন্যদেবের বাসভূমিতে মন্দিরটি নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। আর তা তিনি করেনওনি। চতুর্থত, ভক্ত যখন আরাধ্য দেবতার মন্দির নির্মাণের সংকল্প করেন, তখন প্রথমেই দেখেন জমির সহজলভ্যতা, ভূমির ধারণক্ষমতা এবং সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি স্থান, যা মন্দির নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত। এক্ষেত্রে সূতিকাগৃহটিকে নির্বাচন করার কথা ভক্তের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে, ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মণিপুররাজ ভাগ্যচন্দ্র নবদ্বীপে এসেছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন অনুমহাপ্রভুর মূর্তিটি, উদ্দেশ্য ছিল এটি নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করার। এক্ষেত্রে তিনি মন্দির নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচন করলেন তেঘরিপাড়ায়, যা চৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পঞ্চমত, প্রায় তিনশো বছর পরে নবদ্বীপে এসে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ চৈতন্যদেবের

৫. Calcutta Review, 1846, P-423

৬. শ্রীশ্রীনবদ্বীপ দর্পণ—ব্রজমোহনদাস, পৃ. ৯১

সঠিক জন্মস্থানটি খুঁজে পেয়েছিলেন, এ ধারণা বাতুলতা মাত্র। ষষ্ঠত, তাঁর তো জানা ছিল না যে, একদিন না একদিন চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক উঠবে, আর তাঁর নির্মিত মন্দিরটিকে ঘিরেই সমাধানের পথ খোঁজা হবে। সুতরাং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নির্মিত মন্দিরটির অবস্থান খুঁজে পেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এ ধারণা অবাস্তব। বিশিষ্ট গবেষিকা ড. বাসন্তী চৌধুরি মনে করেন, 'প্রাচীন চরিতগ্রন্থ হইতে জানা যায় জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। গঙ্গার তীরে তাঁহার বাড়ি ছিল ও কাঁচা ঘরে তিনি বাস করিতেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সময় পর্যন্ত সেই ঘরবাড়ি টিকিয়া থাকা অসম্ভব মনে হয়। সুতরাং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় যদি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের প্রাচীন মন্দির উদ্ধার করাও যায়, তাহা হইলেও নিশ্চিতরূপে বলা যাইবে না যে ইহাই শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান।'[৭]

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরটি ধ্বংসের সময়ে প্রস্তরখণ্ডগুলি যে জলের প্রবল টানে মাইলের পর মাইল দূরে গিয়ে পড়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অনুসন্ধান করলে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এইরকম অসংখ্য প্রস্তরখণ্ডের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ভক্তির আতিশয্যে আমরা যদি প্রতিটি স্থানকেই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিত করি, তা হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে, তা কল্পনাতীত। সুতরাং ব্রজমোহনদাস বাবাজি আবিষ্কৃত স্থানটি যে প্রকৃত জন্মস্থান নয়, তা বলাই বাহুল্য। ব্রজমোহনদাস বাবাজি ছিলেন নিষ্ঠাবান ভক্ত। চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরূপণের ক্ষেত্রে তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। কিন্তু তিনি যে পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা না করে যদি বৈষ্ণব সাহিত্যের সাহায্যে জন্মস্থান নিরূপণে ব্রতী হতেন, তা হলে হয়তো সফলতা অর্জন করতে পারতেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি যে স্থানটিকে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিত করলেন—যুক্তিবাদীদের কাছে তার কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই।

মায়াপুর তত্ত্বের বাস্তবতা

'মায়াপুর' বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত ভক্তপ্রবর নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' নামক গ্রন্থটির একটি উক্তি। তিনি লিখেছেন—

৭. বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য—ড. বাসন্তী চৌধুরি, পৃ. ৩০২

'নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।।
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর।।' [৮]

'মায়াপুর' কোনও স্থান নাম নয়, এটি একটি রূপক মাত্র। বৃন্দাবনের গোবিন্দদেব মন্দিরকে 'যোগপীঠ' বলেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।[৯] বৈষ্ণবীয় পরম্পরাকে স্বীকার করে নরহরি চক্রবর্তীও বৃন্দাবনকে 'যোগপীঠ' অভিধায় ভূষিত করেছেন। আর নবদ্বীপকে বৃন্দাবনের সঙ্গে তুলনা করে 'মায়াপুর' নামে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। অবশ্য এই 'মায়াপুর' নামকরণ তাঁর নিজস্ব নয়, এটিও তিনি গ্রহণ করেছেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

'মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম।।
প্রয়াগে মাধব মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব পদ্মনাভ জনার্দ্দন।।
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানামূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।।' [১০]

এখানে 'হরি মায়াপুরে' শব্দটি প্রণিধানযোগ্য। চৈতন্যদেবকে হরির অবতার রূপে স্বীকার করে নবদ্বীপকে 'মায়াপুর' আখ্যায় ভূষিত করেছেন নরহরি। সুতরাং 'মায়াপুর' আধ্যাত্মিকতার মোড়কে মোড়া ভক্তের কল্পনার রসায়নে সিক্ত এমন একটি শব্দ, যার সঙ্গে ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক নেই। আর সে উদ্দেশ্য নিয়ে 'ভক্তিরত্নাকর' লেখাও হয়নি। নরহরি ভক্ত মানুষ, তাই তাঁর রচিত গ্রন্থটি ভক্তিরসাশ্রিত। কোথাও-কোথাও ইতিহাস-ভূগোলের টুকরো ঝলক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঠিকই, তবে সেখানেও নরহরি অতি সাবধানতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ দিতে ভোলেননি। সুতরাং নরহরির 'মায়াপুর' শব্দটিকে যদি আমরা স্থাননাম হিসেবে গ্রহণ করি, তা হলে তা হবে অনৈতিহাসিক পদক্ষেপ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতো স্বনামধন্য ব্যক্তি নরহরির প্রকৃত অভিপ্রায় অনুধাবন করতে না পেরে যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে

৮. ভক্তিরত্নাকর—নরহরি চক্রবর্তী, গৌড়ীয় মিশন প্রকাশিত, ১২/৮৩-৮৪
৯. চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোপীনাথ বসাক সংকলিত, ১/৮
১০. তদেব, ২/২০

দুটি গোষ্ঠী। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চলছে কাদা ছোড়াছুড়ি, বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে যা অনভিপ্রেত।

অপর একটি বিষয়ও স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, সত্যিই যদি 'মায়াপুর' নামক কোনও পল্লিতে চৈতন্যদেবের জন্ম হত, তা হলে মুরারিগুপ্ত, কবি কর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সহ অসংখ্য চৈতন্যচরিতকার ও প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তার রচনায় অবশ্যই বিষয়টি ধরা পড়ত। তা যখন পড়েনি তা হলে স্বীকার করে নিতে হবে যে, এটির কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। বৃন্দাবনদাস ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীদেবীর সন্তান। তাঁর বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছে নবদ্বীপ সংলগ্ন মামগাছিতে। চৈতন্যদেব যে বৎসর প্রয়াত হন তখন বৃন্দাবনের বয়স প্রায় ২৩ বছর। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক নবদ্বীপকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে লিখেছেন—

'নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোঁসাই।।' [১১]

চৈতন্যদেবের জন্ম যে নবদ্বীপে হয়েছিল বৃন্দাবনদাসের রচনায় তা স্পষ্ট উল্লিখিত রয়েছে। এখন আপনারাই বলুন, চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক চৈতন্য-পরিকর নিত্যানন্দের শিষ্য বৃন্দাবনদাসের কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব, না চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় ২৬০ বৎসর পরে নবদ্বীপে আগত নরহরি চক্রবর্তীর বক্তব্যে আস্থা ব্যক্ত করব। আমরা মনে করি, চৈতন্যদেবের জন্মস্থান সম্পর্কে নরহরি যে নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন ইতিহাসের বিচারে তা মূল্যহীন।

এবারে আমরা নরহরি চক্রবর্তীর ইতিহাস চেতনা নিয়ে আলোচনা করব। তাঁর গ্রন্থগুলি পাঠ করলে সহজেই নজরে আসে যে ইতিহাসের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। তাঁর রচনায় মাঝেমধ্যে ইতিহাসের টুকরো ঝলক ধরা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা ত্রুটিযুক্ত। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী বিষ্ণুপুরাণ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, ওই শ্লোকে নবদ্বীপের কথা উল্লিখিত আছে। এই বক্তব্যের সূত্র ধরে আঞ্চলিক ইতিহাসবেত্তা কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী গুপ্তযুগে নবদ্বীপের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল, এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে যে, বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকটিতে নবদ্বীপের নাম নেই। সেখানে আটটি

১১. চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস, রাধানাথ কাপাসি সম্পাদিত, ১/২/১৩, পৃ. ১৮

দ্বীপের নাম উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু নবম দ্বীপটির নামোল্লেখ নেই। পুরাণ রচয়িতা যেহেতু নবম দ্বীপটির নাম নির্দিষ্ট করে দেননি তাই আমরা আমাদের প্রয়োজনার্থে উক্ত দ্বীপটিকে যদি নবদ্বীপ নামে অভিহিত করি, তবে তা হবে অনৈতিহাসিক পদক্ষেপ। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর এই সংযোজন নবদ্বীপের ইতিহাসকে বিপথগামী করেছে। দ্বিতীয়ত, তিনি 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে নবদ্বীপে একটি গণেশমূর্তি ছিল। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় মূর্তিটি অন্তর্হিত হয়ে যায়।

'এথা গণেশের মনোরথ পূর্ণ কৈলা।
প্রভুর সন্ন্যাসে তেঁহো অদর্শন হৈলা।।' [১২]

নরহরি চক্রবর্তী নবদ্বীপে এসে জনশ্রুতি শুনেছিলেন যে, এখানে একটি গণেশমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু বহু পূর্বেই গঙ্গার ভাঙনে তা নিমজ্জিত হয়েছে। এই ঘটনাটিকে তিনি চৈতন্যদেবের নামের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন। এই তথ্যটিও ইতিহাসের বিচারে ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃত ঘটনাটি হচ্ছে এরূপ—রাজা রাঘব রায় (১৬৩২-৮৩ খ্রি.) কর্তৃক ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে গণেশমূর্তিটি নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুকাল পরে গঙ্গার ভাঙনে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং মূর্তিটি মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। রাজা গিরীশচন্দ্র (১৮০২-৪১ খ্রি.) মাটি খুঁড়ে মূর্তিটি উদ্ধার করেন কিন্তু গণেশের শুঁড় ভেঙে যায়। তখন নবদ্বীপের পণ্ডিতদের বিধান অনুযায়ী ভবতারিণী মূর্তিতে রূপান্তরিত করে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে পোড়ামাতলায় প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩] বর্তমানে এই মূর্তিটি এখানে পূজিত হচ্ছে। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে নবদ্বীপের গণেশমূর্তিটি অন্তর্হিত হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রায় ১৬০ বছর পরে গণেশমূর্তিটি নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ধরনের আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। 'মায়াপুর' তত্ত্বটিও এই ধরনের একটি ত্রুটিযুক্ত পরিবেশনা, বাস্তবের সঙ্গে যার কোনও সঙ্গতি নেই। সুতরাং নরহরি চক্রবর্তীর ইতিহাস চেতনাকে স্বীকার করে নেওয়ার আগে কষ্টিপাথরে নিখুঁতভাবে তার বিচার করে নিতে হবে—নতুবা ভ্রান্তি থেকে যাবে আমাদের ইতিহাসচর্চায়।

১২. ভক্তিরত্নাকর, ১২/৩১২৯

১৩. ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত—দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, মোহিত রায় সম্পাদিত, পৃ. ১২-১৪

মধ্যযুগে নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান

চৈতন্যদেবের জন্মস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে সর্বাগ্রে সেকালে নবদ্বীপের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় অবশ্য জরুরি। নবদ্বীপের পূর্বাংশে অবস্থিত 'বল্লালদিঘি' ও 'বল্লালঢিবি' সন্নিহিত অঞ্চলেই যে সেন-রাজধানী ছিল, ইতিহাসবেত্তারা নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করে নিয়েছেন। এটি নবদ্বীপের প্রাচীনতম অংশ। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজির নদিয়া আক্রমণের সময়ে সম্ভ্রান্তবংশীয় শিষ্টজনেরা এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেন।[১৪] বখতিয়ার নবদ্বীপ লুণ্ঠন করে উত্তরবঙ্গের লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেন। এদিকে নদিয়া তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়।[১৫] সম্ভবত রাজা লক্ষ্মণসেন অথবা তাঁর পুত্র কেশব সেন পুনরায় নবদ্বীপ নিজেদের অধিকারে আনেন। তখন শিষ্টজনেরা আবার নবদ্বীপে ফিরে আসেন ঠিকই, কিন্তু নিজেদের বসতবাটির দখল লাভে ব্যর্থ হন। কারণ ইতিমধ্যে রাজধানী সন্নিহিত অঞ্চলে গড়ে উঠেছে মুসলমান জনবসতি। অগত্যা উদ্বাস্তু ব্রাহ্মণেরা রাজধানীর পশ্চিমে ভাগীরথীর তীর বরাবর বসতি গড়ে তোলেন। নতুন এই কলোনিটি ব্রাহ্মণপল্লি (বৈদিকপল্লি) নামে পরিচিতি লাভ করে। সেকালে পূর্বে 'বল্লালদিঘি' হতে পশ্চিমে জাহান্নগরের কাছ বরাবর এবং উত্তরে সিমলিয়া হতে দক্ষিণে গাদিগাছা-মাজিদা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল নবদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল।

নবদ্বীপ নগরীর জন্ম যেমন হয়েছিল স্নিগ্ধ-শীতল ভাগীরথীর ক্রোড়ে, তেমনি এই জনপদের ধ্বংসলীলাও সংগঠিত হয়েছিল ভাগীরথীর প্রতিস্পর্ধী মদমত্ততায়। তাই চৈতন্যদেবের সমকালে ভাগীরথীর ধারা কোন পথে প্রবাহিত হত সর্বাগ্রে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত কৃত্তিবাস ওঝার আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'সেইখানে গঙ্গা হইল পশ্চিম বাহিনী।
দক্ষিণা নদিয়া দিয়া উত্তরে গ্রামখানি।।' [১৬]

এখানে একটি কথা পরিষ্কার যে, চৈতন্যদেবের সমকালে নবদ্বীপে ভাগীরথীর প্রবাহ পশ্চিমবাহিনী ছিল এবং নবদ্বীপের দক্ষিণেও ভাগীরথীর প্রবাহ

বর্তমান ছিল। এই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭২৮-৮২ খ্রি.) সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কণ্ঠে। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, নবদ্বীপে ভাগীরথী ছিল পশ্চিমবাহিনী—

'গিরিয়া মোহনা দিয়া অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া
নবদ্বীপে পশ্চিম বাহিনী।' [১৭]

সেকালে নবদ্বীপ ছিল কৃষ্ণনগরের রাজাদের অধীনস্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর। রাজ্যের সীমা নির্ধারণ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বলেছেন যে—

'রাজ্যের উত্তরসীমা মুর্শিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ।।' [১৮]

ভাগীরথীর প্রবাহপথ ধরেই সেকালে যেমন রাজ্যের সীমা নির্ধারিত হয়েছিল তেমনি পরবর্তীকালে সেই প্রাচীন খাতই চিহ্নিত হয়েছিল জেলার সীমানা রূপে। নবদ্বীপ নদিয়া জেলার অন্তর্গত। আজও নদিয়া ও বর্ধমান জেলার সীমানা পর্যবেক্ষণ করলে অতি সহজেই ভাগীরথীর প্রাচীন ধারাটির প্রবাহপথ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। ভাগীরথীর প্রাচীন ধারাটি যে নবদ্বীপের পশ্চিমে জাহান্নগরের গা ঘেঁষে প্রবাহিত ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একটি দলিলে। সেখানে জনৈক শ্যাম চৌধুরিকে জার্ণাগর ঘাটের কাছে ১৬ বিঘা পতিত জমি দান করা হয়েছে।[১৯] এই দলিলে 'জার্ণাগরের ঘাট' কথাটি উল্লেখ থাকায় আমরা নিঃসন্দেহ যে, সেকালে জান্নগরের কাছে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। লালমোহন ভট্টাচার্যের 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে যে, বিদ্যার্জনের জন্য নবদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত গঙ্গা পার হয়ে বিদ্যানগর যেতে হত—

'বিদ্যা হেতু যাতায়াত বিদ্যার নগর।
পারাপারে ধরে গঙ্গা হৃদি ইন্দীবর।।'

'শেক শুভোদয়া' থেকে জানা যাচ্ছে যে সেনরাজা লক্ষ্মণ সেনের (১১৭৯-

১৭. অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

১৮. তদেব

১৯. নবদ্বীপ তত্ত্ব—কান্তীচন্দ্র রাঢ়ী, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫২

১২০৫ খ্রি.) সময়ে নবদ্বীপের পশ্চিমে ছিল গঙ্গার প্রবাহপথ। তাই তিনি নবাগত অতিথিকে পশ্চিম দিক থেকে গঙ্গার জলের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে দেখেছিলেন—

'প্রণম্য শিরসা দেবীং গঙ্গা গঙ্গেতি কীর্ত্তনাম্।
অপশ্যত্ পশ্চিমায়াস্ত জলোপরি চ পার্থিবঃ।।'

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব একবার বিদ্যানগরে এসে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান করেছিলেন। এ খবর রটে যেতেই নবদ্বীপের ভক্তগণ দলে-দলে নবদ্বীপের পশ্চিমে প্রবাহিত ভাগীরথীর ধারা অতিক্রম করে বিদ্যানগরে গিয়েছিলেন—

'ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে।।
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে।।' [২০]

এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেকালে ভাগীরথীর ধারাটি নবদ্বীপ ও বিদ্যানগরের মাঝ বরাবর অর্থাৎ নবদ্বীপ নগরীর পশ্চিমে প্রবাহিত ছিল। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দেওয়ান এ কথাটি আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পূর্বে, নবদ্বীপের পশ্চিম ও দক্ষিণে ভাগীরথী ও পূর্বদিকে খড়িয়া নদী ছিল; এই উভয় স্রোতস্বতী নবদ্বীপের দুই ক্রোশ দক্ষিণে গোয়ালপাড়া গ্রামের নিকট মিলিত হয়।... ...পরে, ক্রমশ নগরের উত্তর ভাগ উদরস্থ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হন। যে অংশ নদী-গর্ভস্থ হইতে লাগিল, সেই অংশেই পুরবাসীদিগের বসতি ছিল। যাহাদের বাসস্থান জলসাৎ হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ বা গ্রামান্তরে, কেহ বা গ্রামের দক্ষিণ ভাগে যে চর ছিল, তথায় বসতি করিল। এইরূপে, যে ভাগে পৌরদিগের নিকেতন ছিল, সে ভাগ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইল, এবং যে ভাগ বালুকা ও অরণ্যময় ছিল, তাহা মনুষ্যের আবাসস্থল রূপে পরিণত হইতে লাগিল।'[২১] দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে পুরবাসীগণ দক্ষিণে সরে এসে নতুন বসতি গড়ে তোলে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, নবদ্বীপ নগরী

২০. চৈতন্যভাগবত, ৩/৩, পৃ. ২৬৬

২১. ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত, পৃ. ৩৫

কমপক্ষে দুবার তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। প্রথম পরিবর্তন ঘটে বখতিয়ার কর্তৃক নদিয়া বিজয়ের পর, তখন শিষ্টবর্গীয়রা যে নতুন কলোনি গড়ে তোলেন, ক্রমে তা নবদ্বীপ নামে অভিহিত হয়। মধ্যযুগে এই নবদ্বীপেই আবির্ভূত হন মহামানব চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ গঙ্গার ভাঙনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে দ্বিতীয়বার এর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। তখন গড়ে ওঠে বর্তমান নবদ্বীপ— যা অবস্থান বিচারে তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত।

মধ্যযুগে ভাগীরথীর ধারা যে পশ্চিম ও দক্ষিণে প্রবাহিত ছিল, গিরিশচন্দ্র বসু তাঁর গ্রন্থে সে কথার উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৮৫৩ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নবদ্বীপ থানার দারোগা ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ‘বর্তমান নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্বদিকে ভাগীরথী, পশ্চিমে পোলতার বিল, উহা পূর্বে নিশ্চয় ভাগীরথী নদী ছিল, এই বিল পশ্চিম হইতে দক্ষিণ দিক দিয়া পুনরায় ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়।’[২২] নবদ্বীপের গঙ্গা বারংবার তার গতিপথ পালটেছে, ফলে পরিত্যক্ত খাতগুলি ‘ছাড়িগঙ্গা’, ‘মরিগঙ্গা’ ‘পোলতার খাল’ ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। নবদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত জাহান্নগর-চাঁদপুর-শ্রীরামপুর প্রভৃতি পল্লির সীমানা বরাবর একটি প্রাচীন পরিত্যক্ত নদীখাত আজও দৃষ্টিগোচর হয়। শ্রীরামপুর দহের কাছ থেকে এই খাতটি ‘পোলতার খাল’ নামে পরিচিত। বর্ষাকালে এই খাতটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন দেখা যায় যে, দক্ষিণে জালুইডাঙার কাছে এটি ভাগীরথীর মূল প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

এতক্ষণ মধ্যযুগে নবদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত ভাগীরথীর প্রবাহপথ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। এই চর্চাকালে আমরা দেখেছি, জাহান্নগরে একটি এবং বিদ্যানগর যাওয়ার পথে একটি, মোট দুটি পারাপারের ঘাট ছিল। সেকালে কালনা ছিল সদর প্রশাসনিক কার্যালয়।[২৩] এখান থেকে একটি পথ যবননগর (জাহান্নগর) হয়ে কাটোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জাহান্নগরের ঘাট পার হয়ে গঙ্গার দক্ষিণ তীর বরাবর একটি রাজপথ স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তর সিমলিয়া পর্যন্ত প্রশস্ত ছিল। নবদ্বীপের দক্ষিণেও যে ভাগীরথীর প্রবাহপথ ছিল সমকালীন সাহিত্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে যে এ কথার উল্লেখ আছে, সে আলোচনা আগেই করেছি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় একশো বছর পরে রচিত মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে উল্লেখ পাওয়া যায়—

২২. সেকালের দারোগা কাহিনী—গিরিশচন্দ্র বসু, ২য় সং, পৃ. ১৫

২৩. নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত—মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১

'বামভাগে নবদ্বীপ ডাহিনে পাড়পুর
শান্তিপুর পুরীখান রহে কথোদূর।
নাইয়া পাইক গায় গীত শুনিতে কৌতুক
ডাহিনে রহিল পুরী অম্বুয়া মুলুক।' [২৪]

'বামভাগে নবদ্বীপ' কথাটি এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কাটোয়া থেকে কালনার দিকে যাওয়ার সময় নবদ্বীপ নগরীর অবস্থান বামভাগে হওয়ার অর্থই হচ্ছে ভাগীরথী তখন নগরের পশ্চিমে প্রবাহিত ছিল। নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'ডাহিনে পাড়পুর' কথাটির গুরুত্ব সীমাহীন। রেনেলের মানচিত্রে পাড়পুরের অবস্থান চিহ্নিত আছে। বর্তমান নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশনের উত্তরে অবস্থিত পানডাঙা ও হাইল্যান্ড কলোনি সেকালে ছিল পাড়ডাঙা বা পাড়পুর। বৈষ্ণব সাহিত্যে কুলিয়া পাহাড়পুরকে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে অনুমিত হয় যে, কুলিয়া ও পাহাড়পুর গ্রাম দুটি পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। বৃন্দাবনদাস বলেছেন, 'সবে গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়।' সুতরাং কুলিয়া-পাহাড়পুর ও নবদ্বীপের মাঝ বরাবর গঙ্গার প্রবাহপথ ছিল। অর্থাৎ শ্রীরামপুরের দহের কাছে ভাগীরথী দক্ষিণধারায় কিছুটা প্রবাহিত হলেও পাড়ডাঙার কাছে তা পূর্ববাহিনী হয়েছিল। আর সেই জন্যেই সদাগর পাড়পুরকে ডানদিকে দেখেছিলেন। ক্ষেত্র সমীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, নবদ্বীপ পৌরসভা অফিসের দক্ষিণ ভাগে একটি প্রাচীন নদীখাত বৈঁচিআড়া, চারিচরা, দিয়ারা প্রভৃতি পল্লিকে স্পর্শ করে পূর্বদিকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে আবার দক্ষিণবাহিনী হয়েছে। এই ধারাটি যে গঙ্গার প্রবাহপথ ছিল, বিশ্বভারতী সংগ্রহশালায় রক্ষিত ৬৮১৭ নম্বর রামায়ণ পুথিতে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—

'একদিকে মালঞ্চবাড়ি আর দিকে কুলিয়া।
পশ্চিম বাহিনী গঙ্গা হইল নদীয়া।।'

মালঞ্চবাড়ি বর্তমানে মালঞ্চপাড়া নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে ছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন মিশ্রের আবাস। এর দক্ষিণে ছিল ভাগীরথীর প্রবাহপথ, আর অপর পাড়ে ছিল কুলিয়া-পাহাড়পুর। বর্তমানে এই গ্রামদুটির বিলুপ্তি ঘটেছে। 'কোলেরগঞ্জ' নামটি এখনও টিকে আছে দক্ষিণের একটি পল্লিতে। চৈতন্যদেবের কালে নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মাঝ বরাবর ধারাটি যে মজে যাচ্ছিল এ খবর জানা যাচ্ছে কবি কর্ণপুর রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে

২৪. চণ্ডীমঙ্গল—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, সুকুমার সেন সম্পাদিত, পৃ. ২০১

(৯/৩৩)। নবীন সঁন্ন্যাসী চৈতন্যদেব যখন কুলিয়ায় মাধব দাসের গৃহে অবস্থান করছিলেন তখন নবদ্বীপের অগণিত ভক্ত মানুষের ঠাকুরালি দেখতে কুলিয়া গিয়েছিল। ঘাটে এত অসংখ্য মানুষ হাজির হয়েছিল যে মাঝি পার করতে হিমশিম খাচ্ছিল। তখন এই ধারাটির উপর একটি বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করা হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় সেকালে নবদ্বীপের দক্ষিণে ভাগীরথীর একটি প্রবাহপথ ছিল এবং এই ধারার উপর একটি পারাপারের ঘাট ছিল—এই ঘাট পার হয়ে কুলিয়া পাহাড়পুরে যাওয়া যেত। চৈতন্যদেবের সমকালে মজে যাওয়া এই ধারাটি বর্তমানে খণ্ডিত জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। এবারে আবার আমরা মুকুন্দরামের কথায় ফিরে আসি। তিনি লিখেছেন—

'ডাহিনে ললিতপুর বামেতে ইন্দ্রাণী।
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিআ পুষ্পপানি।।
ভাওসিংহের ঘাটখানি ডাহিনে এড়িআ।
মাঠ্যারি সফরখান বামেতে ছাড়িয়া।।...
বেলনপুর ঘাটখানি করি তেয়াগন।
পুর্বস্থলির ঘাটে সাধু দিল দরশন।।
দ্রুতগতি চলে সাধু নাহি করে হেলা।
কোথা হয় রন্ধন ভোজন কোথাহ খণ্ডকলা।।
পুবধূলি সদাগর করি তেয়াগন।
নবদ্বীপে ডিঙ্গা আসি দিল দরশন।।
চৈতন্যচরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
সেখানে রহিআ সাধু করিল বিশ্রাম।।'

ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত কাটোয়া, ইন্দ্রাণী, ললিতপুর, ভাউসিংহ, মেটেরি, বেলনপুর, চণ্ডীগাছা, পূর্বস্থলী, নবদ্বীপ, পাড়পুর, শান্তিপুর, অম্বুয়া প্রভৃতি স্থাননামের উল্লেখ আছে। মুকুন্দরামের বর্ণিত প্রবাহপথের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সমকালে ভাগীরথীর ধারার সাদৃশ্য বর্তমান। বেলনপুর সম্ভবত বেলপুকুর। তাহলে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, চৈতন্যদেবের কালে ভাগীরথীর ধারা বেলপুকুরের কাছে 'U' আকারের বাঁক নিয়ে পূর্বস্থলীকে স্পর্শ করে নবদ্বীপের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ বরাবর প্রবাহিত হয়ে পাড়পুরকে ডানদিকে রেখে দক্ষিণবাহিনী হয়েছিল।

বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে অবগত হওয়া যায় যে, জগন্নাথ মিশ্রের গৃহের অবস্থান ছিল গঙ্গার সন্নিকটে, কিন্তু গঙ্গার কোন তীরে ছিল তাঁর বাসস্থান তা

জানবার জন্য আমরা এবার মুরারিগুপ্তের বক্তব্য শুনি—

'উষিত্বা রজনীং তত্র প্রভাতে ভগবান পরঃ।
জগামোত্তরকং কূলং স জাহ্নব্যা ভ্রমদ্‌ক্রুতম্।' [২৫]

অর্থাৎ চৈতন্যদেব একদিন গঙ্গার উত্তরপারে কোনও একস্থানে গিয়েছিলেন। এ উক্তির যথার্থ সমর্থন মেলে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে। তিনি লিখেছেন—

'রজনী বঞ্চিয়া প্রভু উঠিলা প্রভাতে।
গঙ্গার উত্তর কূলে গেলা আচম্বিতে।।' [২৬]

কবি কর্ণপুরের উক্তিতেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

'ভগবান্ প্রভাতে সময়েরণ্য দিনে
দ্যুনদীং প্রতীর্য্য সহ তৈরগমৎ।
তটমুত্তরং বিকলতেন হৃদা
ক্ষণমেব বিশ্রমণমাতনুত।।' [২৭]

অর্থাৎ ভগবান গৌরাঙ্গদেব একদিন প্রভাত সময়ে সেই সকল ভক্তগণের সঙ্গে গঙ্গা পার হয়ে উত্তর তীরে গমন করে অতি বিকল চিত্তে সেখানে বিশ্রাম সুখ অনুভব করতে লাগলেন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে রচিত একটি নাতি-প্রামাণিক গ্রন্থে, বিমানবিহারী মজুমদার অবশ্য এটিকে জাল বই বলেছেন, তাতে মুরারি গুপ্ত ও লোচনদাসের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—

'গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাং বৈ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ।
আবিরাসীচ্ছচীগেহে চৈতন্যো রসবিগ্রহঃ।' [২৮]

চৈতন্য-পরিকর উদ্ধবদাসের পদে গঙ্গার দক্ষিণে নিমাইয়ের বাড়ি ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

২৫. মুরারিগুপ্তের কড়চা, ২/১২/২
২৬. চৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস, ২/৮২
২৭. চৈতন্যচরিত মহাকাব্যম্—কবি কর্ণপুর, ৭/৯৬
২৮. বিশ্বসারতন্ত্র (হরিবোল কুটির) পুথি নং—২৯খ

'বায়ু কোণে কিছু দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে
নিজগৃহে আইলা গৌরহরি।'

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, জাহ্নবীর দক্ষিণ-তীরস্থ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-গৃহের অবস্থান ছিল। তা হলে তৎকালে ভাগীরথীর প্রবাহ যে নবদ্বীপের উত্তরেও ছিল এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। উত্তরে এই ধারার অপর পারে ছিল পূর্বস্থলীর অবস্থান। নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর মধ্যে যাতায়াতের জন্য উত্তরের গঙ্গায় যে একটি পারাপারের ঘাট ছিল, এ খবর জানিয়েছেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে (১৬০৫-২৭ খ্রি.) মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য মানসিংহ এসেছিলেন বাংলায়। তিনি বর্ধমান হতে অগ্রদ্বীপে এসে গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করে গঙ্গাস্নানের অভিলাষ ব্যক্ত করেন—

'মজুমদারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্বস্থলী নদে সন্নিধান।।
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা।।
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ।।' [২৯]

সম্ভবত এই ঘাটটির অবস্থান ছিল বর্তমান নিদয়া গ্রামের কাছে। কারণ নদের নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায়ে এই ঘাট পার হয়ে কাটোয়া গিয়েছিলেন। তাই নবদ্বীপের মানুষ এই স্থানটিকে নির্দয়া বা নিদয়া নামে চিহ্নিত করেছেন।

এ পর্যন্ত আলোচনায় জানা গেল যে, চৈতন্যদেবের সমকালে নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণে প্রবাহিত ভাগীরথীর উপর মোট চারটি পারাপারের ঘাট ছিল। এ ছাড়া আরও একটি ঘাটের কথা জানা যায় বৃন্দাবনদাস ও উদ্ধব দাসের বর্ণনায়। তবে এই ঘাটটির অবস্থান ভাগীরথীর উপর ছিল না, ছিল অলকানন্দায়। সেকালে অলকানন্দার ধারাটি নবদ্বীপের দক্ষিণে শান্তিপুরের সন্নিকটে বাগআঁচড়ার কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে 'চৈতন্যভাগবত' পাঠ করলে দেখা যাবে যে, নবদ্বীপের ভক্তরা বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করে তবেই খেয়াঘাটে পৌঁছেছিল। কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান

২৯. অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৪১১-১২

করেছিলেন চৈতন্যদেব। এ খবর পেয়ে নবদ্বীপের অসংখ্য ভক্ত তাঁকে দর্শনের জন্য এই ঘাট পার হয়ে শান্তিপুর গিয়েছিল।

মধ্যযুগে নবদ্বীপের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনায় এতক্ষণ কাব্য-সাহিত্যের ধারাগুলি নিয়ে চর্চা করা হল। এবারে আমরা কয়েকটি মানচিত্র এবং বিদেশি ভাষায় রচিত কয়েকটি গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্য পর্যালোচনা করে প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান সুনিশ্চিত করব। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ভেন-ডেন-ব্রুকের মানচিত্রে, ১৬৭৬-৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত টেম্পল সাহেবের মানচিত্রে এবং ১৭৬৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল হার্ট প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্রে নবদ্বীপে পশ্চিমে প্রবাহিত ভাগীরথীর ধারাটি চিহ্নিত আছে। ব্রুকের মানচিত্রে নিমদা এবং আম্বুয়াকে ডানদিকে এবং নদিয়াকে বাম ভাগে রেখে ভাগীরথী প্রবাহিত হয়েছে। অলকানন্দা মিলিত হয়েছে আম্বুয়ার বিপরীতে। টেম্পল সাহেবের মানচিত্রেও নদিয়া ও শান্তিপুরকে বাম ভাগে দেখানো হয়েছে। রেনেলের মানচিত্রে নদিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই ভাগীরথীর প্রবাহ দেখানো হয়েছে, জলঙ্গি মিলিত হয়েছে নদিয়ার পূর্বে, ভাগীরথীর পশ্চিম সীমায় জান্নগর, পাড়পুর, সমুদ্রগড়, কালনা ও আম্বুয়ার অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে। বর্তমানে নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথীর পরিত্যক্ত খাতটির চিহ্ন ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হারকোলেটের মানচিত্রে, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রেভেনিউ সার্ভের মানচিত্রে এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত নদিয়া জেলার সার্ভে মানচিত্রে অঙ্কিত আছে। এখনও এই খাতটি নদিয়া জেলার পশ্চিমসীমা নির্ধারণ করছে।

ইংরেজ শাসনকালে বাংলার জেলাগুলি সম্পর্কে সমীক্ষা সংবলিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে W. W. Hunter নবদ্বীপের অবস্থান সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য—'The Bhagirathi once held a westerly course and old Nadiya was on the same side of Krishnanagar, but about the beginning of this century [i.e. 19th century], the stream changed and swept the ancient town away.'[৩০] অপর একটি রিপোর্টে Hunter বলেছেন, 'Thus Navadip was originally situated on the right bank, but the river, after rending in twin the ancient city, now leaves the modern Nadia on its left bank.'[৩১]

মধ্যযুগে নবদ্বীপের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনায় বোঝা গেল যে,

৩০. Statistical Account of Bengal—W. W. Hunter, Vol II, P-21

৩১. Imperial Gazetteer of India—W. W. Hunter, Vol I, P-219

সেকালে এই নগরীর উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভাগীরথীর প্রবাহপথ ছিল, অগ্নিকোণে ছিল অলকানন্দা। উত্তরে গঙ্গার পরপারে ছিল পূর্বস্থলী, এই গ্রামটির অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিমে ছিল জাহান্নগর ও বিদ্যানগর, এই গ্রামদুটির পূর্বাবস্থা বজায় আছে। দক্ষিণে ছিল কুলিয়া পাহাড়পুর, এই দুটি গ্রামের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত। নগরীর পূর্ব সীমায় সিমলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা প্রভৃতি পল্লিগুলির অবস্থান ছিল এক সমতলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন নবদ্বীপ নগরী গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে এবং প্রাগুক্ত পল্লিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তবে গাদিগাছা, মাজিদা গ্রামদুটি অটুট থাকলেও সিমলিয়া তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি।

চৈতন্যভাগবতে নবদ্বীপের ভৌগোলিক চিত্র

বৃন্দাবনদাস ছিলেন নবদ্বীপলীলার ব্যাস। মহামানব চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ চৈতন্যভাগবতে তিনি যেভাবে সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের চিত্র তুলে ধরেছেন তা সত্যিই তুলনারহিত। তিনি ছিলেন চৈতন্য-পরিকর শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীদেবীর পুত্র এবং নিত্যানন্দ প্রভুর প্রত্যক্ষ শিষ্য। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে সেকালে নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন নবদ্বীপের একটি সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের মানসপটে প্রতীয়মান হবে। আসুন, এবারে আমরা বৃন্দাবনদাস প্রদর্শিত পথ ধরে কাজির বাড়িব দিকে অগ্রসর হই—

'গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে আগে সেই পথে যায় গোরা রায়।।
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইয়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি।।
বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমলিয়া।।' [৩২]

জগাই-মাধাই ছিলেন নবদ্বীপের নগর কোটাল। এঁরা দুজনেই চৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের নির্দেশে মাধাই একটি ঘাট পরিচর্যা করতেন। এই ঘাটটি 'মাধাইয়ের ঘাট' নামে খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে

---

৩২. চৈতন্যভাগবত, ২/২৩

মাধাইয়ের স্মরণে নবদ্বীপের একটি পল্লির নামকরণ হয়েছিল 'মাধাইপুর'। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে ঘাটটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে ঠিকই, তবে পল্লিটি এখনও স্বমহিমায় বর্তমান। মাধাইপুর গ্রামটি বাবলারি মৌজার উত্তরে বর্তমানে পূর্বস্থলী থানায় (জে.এল.-৯০) অবস্থিত। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেকালে নবদ্বীপ নগরীর প্রকৃত অবস্থান ছিল মাধাইপুর সংলগ্ন অঞ্চলে। কারণ মাধাই ছিলেন নবদ্বীপের বাসিন্দা, তাঁর নামাঙ্কিত পল্লিটি যে নবদ্বীপের অন্তর্গত একটি পল্লি ছিল তা বলাই বাহুল্য। এবারে ঘাটের কথায় আসি। চৈতন্যভাগবতের তথ্য অনুসারে, মাধাইয়ের ঘাটের পাশের ঘাটটি ছিল চৈতন্যদেবের নিজস্ব ঘাট— যে ঘাটে তিনি স্নান করতেন, স্নানার্থীদের বিরক্ত করতেন এবং অবসর সময়ে জাহ্নবীর তীরে বসে সময় কাটাতেন। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘাটের সন্নিকটে ছিল নিমাইয়ের বাসস্থান। তাই বৃন্দাবনদাস এই ঘাটটিকে 'আপনার ঘাট' নামে চিহ্নিত করেছেন। এই ঘাটটির সঠিক অবস্থান কোথায় ছিল তার উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেননি, বলেছেন যে মাধাইয়ের ঘাটের পাশেই ছিল এর অবস্থান।

চৈতন্যভাগবতে মোট চারটি ঘাটের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এই ঘাটগুলি পূর্ব-পশ্চিমে প্রশস্ত ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। নগরিয়া ঘাট ছিল উত্তরের পারঘাটা, এই ঘাট পার হয়ে পূর্বস্থলী কাটোয়া ইত্যাদি স্থানে যাওয়া যেত। এই ঘাটটির অবস্থান যে বর্তমান নিদয়া গ্রাম সন্নিহিত অঞ্চলে ছিল, এ কথা আগেই বলেছি। কাজি দলনের দিন সংকীর্তনের মহামিছিলের যাত্রা শুরু হয়েছিল চৈতন্যদেবের গৃহ সংলগ্ন জাহ্নবীর তীর থেকে। এরপর মাধাইয়ের ঘাট, বারকোনা ঘাট, নগরিয়া ঘাট অতিক্রম করে দলটি পৌঁছেছিল গঙ্গানগর। ভাগীরথী যে স্থান থেকে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়েছিল সম্ভবত সেই স্থানে ছিল নগরিয়া ঘাটের অবস্থান। এখান থেকে গঙ্গানগর যাওয়ার পথে ভাগীরথীর প্রবাহপথ ছিল না। এই সাক্ষ্য দিয়েছেন নরহরি চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন—

'এই নগরিয়া ঘাটে রহি কতক্ষণ।
গঙ্গাতীর হইতে করে এ পথে গমন।।' [৩৩]

গঙ্গানগর গ্রামটি আজ আর নেই। অনুমিত হয় জলঙ্গি নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে গ্রামটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তবে, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রেভেনিউ সার্ভের মানচিত্রে গঙ্গানগর গ্রামটি চিহ্নিত আছে। মানচিত্র অনুসারে এই গ্রামটি নিদয়ার সরাসরি পূর্বদিকে অবস্থিত। এখান থেকে দলটি কাজির বাড়ি সিমলিয়ার

---

৩৩. ভক্তিরত্নাকর, ১২/৩১২৬

দিকে অগ্রসর হয়েছিল। তবে সিমলিয়া গ্রামের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত। বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

'নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া।।' [৩৪]

বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে ব্রাহ্মণ পুষ্করিণী বা বামুনপুকুর গ্রামটিকে সিমলিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে কাজির সমাধি আজও বিদ্যমান আছে। 'নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া' কথাটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। 'নদীয়ার একান্তে' শব্দ দ্বারা বৃন্দাবনদাস বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই স্থানটি নদিয়া নয়। নদিয়ার একপ্রান্তে অবস্থিত একটি পল্লি, প্রধানত মুসলমানদের বসতি ছিল এখানে। এর অর্থ হচ্ছে হিন্দু বসতি আর মুসলমান বসতি একসঙ্গে ছিল না। আজও গ্রাম ও শহরের গঠনে এই বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। কলকাতা শহরেও কলুটোলা, পটুয়াটোলা, কুমারটুলি প্রভৃতি জাতিগত বিন্যাসের ধারা আজও অব্যাহত।

সেদিন নাম-সংকীর্তনের মহামিছিলে অসংখ্য লোকের সমাগম দেখে কাজি আত্মগোপন করেছিলেন। চৈতন্যদেব লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনলে তিনি বলেছিলেন যে, নীলাম্বর চক্রবর্তী তোমার নানা, গ্রাম-সম্পর্কে আমার চাচা হন, সেই সম্বন্ধে তুমি আমার ভাগিনা।

এক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল বেলপুকুর গ্রামে। সিমলিয়া থেকে এই গ্রামের দূরত্ব অন্তত‌পক্ষে দুই মাইলের কম হবে না। গ্রাম সম্পর্কে নীলাম্বর চক্রবর্তী কাজির চাচা হন, অথচ নিমাইয়ের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে কাজির এ ধরনের কোনও সম্পর্কের উল্লেখ না থাকায় সহজেই অনুমিত হয় যে, জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি সিমলিয়া থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল; অন্ততপক্ষে দুই মাইলের চেয়ে যে বেশি দূরে ছিল—তা বলাই বাহুল্য। সেই বিচারে অধুনা আবিষ্কৃত 'মায়াপুর' এবং 'প্রাচীন মায়াপুর'—এই দুটি স্থানের কোনওটিই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

কাজি দমন করে সংকীর্তনের দল সহ চৈতন্যদেব দক্ষিণ দিকে শূদ্রপল্লি অতিক্রম করে গাদিগাছা পৌঁছেছিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

'সর্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।।' [৩৫]

৩৪. চৈতন্যভাগবত, ২/২৩

৩৫. তদেব

গাদিগাছা গ্রামটি আজও পুরাতন নামেই বর্তমান আছে। তবে সিমলিয়া ও গাদিগাছার মাঝ বরাবর জলঙ্গির ধারাটি, এবং গাদিগাছার পূর্বসীমায় ভাগীরথীর যে ধারাটি প্রবাহিত আছে, ষোড়শ শতাব্দীতে তা ছিল না। তখন নবদ্বীপ, সিমলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা একই সমতলে অবস্থিত ছিল। অবশ্য 'চৈতন্যভাগবত'-এর গৌড়ীয় সংস্করণে পাঠটি একটু আলাদা। 'গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়।।' এই সংস্করণে মাজিদা গ্রামটির নাম যুক্ত হয়েছে। এর ফলে বোঝানো হয়েছে যে 'পারডাঙ্গা' গাদিগাছা ও মাজিদার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল—যা বিভ্রান্তিমূলক। পাড়ডাঙার প্রকৃত অবস্থান কোথায় ছিল ইতিপূর্বে তা বলা হয়েছে।

গাদিগাছা ছিল চৈতন্যভক্ত শ্রীধরেব বাসস্থান। সেদিন চৈতন্যদেব শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হয়ে ভাঙা লোহার পাত্রে জলপান করে তাঁকে ধন্য করেছিলেন—

'জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।' [৩৬]

এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, 'নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।' তা হলে এতক্ষণ যে-যে স্থানে তিনি পরিক্রমা করলেন, যথা—সিমলিয়া, শূদ্রপল্লি, গাদিগাছা, মাজিদা ইত্যাদি পল্লিগুলি নগরের অন্তর্গত ছিল না। এগুলি ছিল নগরের সীমান্তবর্তী এলাকা। তা হলে একটি সিদ্ধান্ত সহজেই গ্রহণ করা যায় যে, সিমলিয়া থেকে মাজিদা পর্যন্ত অঞ্চলে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান ছিল না। আমরা আবার মূল প্রশ্নে ফিরে যাই, আমরা অনুসন্ধান করে দেখি সেকালে নগরের অবস্থান কোথায় ছিল। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের জানতে হবে যে, সেদিন মহামিছিলটি গাদিগাছা থেকে কোন পথে অগ্রসর হয়েছিল। বৃন্দাবনদাস স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, সেদিন চৈতন্যদেব গাদিগাছা থেকে পাড়ডাঙার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন—'গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।' এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে চৈতন্য পরিকর গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য উদ্ধব দাসের একটি পদে—

'যেদিনেতে গৌরহরি কাজীরে দলন করি
নবদ্বীপে করিলা গমন।
চারিঘাট উত্তরিয়া গঙ্গানগর গ্রাম দিয়া
পাইলা জলাশয় সুশোভন।।

৩৬. চৈতন্যচরিতামৃত, ১/৮

পাইয়া আপন ঘাট মাধাই ঘাটে করি নাট
নিকটেতে শ্রীবাস ভবন।
তাহার ঈশান কোণে বারকোণা ঘাটে নামে
যাঁহা হয় শুক্লাম্বরাশ্রম।।
নাচি নাচি কিছু দূরে নগরিয়া ঘাট পরে
অদূরে বিস্তীর্ণ সরোবর।
তাহাতে কোমল নাচে তরঙ্গ তাহার পাছে
নাচে পক্ষী গাহিছে ভ্রমর।।
জলাশয় ঐশানেতে চাঁদ কাজী করে স্থিতে
সিমুলিয়া নামে সেই স্থান।
কাজীরে দলন করি ভক্ত সঙ্গে গৌরহরি
দক্ষিণেতে করিলা প্রস্থান।।
অলকানন্দার কূলে নাচে গোরা বাহু তুলে
পদ ভরে ধরা টলমল।
সেতু হইলা শ্রীঅনন্ত দেখিলেন ভাগ্যবন্ত
অতিক্রান্ত কীর্ত্তণ মণ্ডল।।
শ্রীধরের গৃহ হইয়া গাদিগাছা মাজিদা দিয়া
নাচি নাচি চলে গোরা রায়।
দেবতা মানুষ মিলি সঙ্গে নাচে কুতূহলী
হাসে কাঁদে গড়াগড়ি যায়।।
পারডাঙ্গা উত্তরেতে রাজ পণ্ডিতের ভিতে
ভক্তগণে মহা সুখী করি।
বায়ু কোণে কিছু দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে
নিজ গৃহে আইলা গৌরহরি।।
ত্রিভুবনে হরিধ্বনি ইহা বই নাহি শুনি
জুড়াইল ভক্ত মন-প্রাণ।
এ উদ্ধব মন্দগতি শোধিতে আপন মতি
বিরচিল কাজীদলন গান।।' [৩৭]

৩৭. ভারতবর্ষ, পৃ. ৭০৩

পদকর্তা উদ্ধবদাস ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী।[৩৮] তাঁর বর্ণনা একেবারে নিখুঁত। গাদিগাছায় শ্রীধরকে অনুগ্রহ করে ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে চৈতন্যদেব পাড়ডাঙার উত্তরে অবস্থিত রাজপণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা আগেই জেনেছি, নবদ্বীপ রেলস্টেশনের উত্তরে অবস্থিত পানডাঙা পল্লিটি ছিল সেকালে পাড়ডাঙা আর তার উত্তরে অবস্থিত মালঞ্চপাড়ায় ছিল রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের আবাস। এখানে ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারপর চৈতন্যদেব নিজের গৃহ অভিমুখে চলে গেলেন। কোনদিকে গেলেন? 'বায়ুকোণে কিছু দূরে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে'—এ ইঙ্গিত তো ছবির মতো স্পষ্ট। মালঞ্চপাড়া থেকে বায়ুকোণে কিছুদূর গেলে তবেই চৈতন্যদেবের জন্মস্থানে পৌঁছোনো যায়। এর পরেও কেউ গঙ্গার পূর্বতীরে 'মায়াপুরে' আবার কেউ গঙ্গার পশ্চিমতীরে 'প্রাচীন মায়াপুর' চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরুপণ করেছেন,—যা সঠিক নয়। এক্ষেত্রেও আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসারে এবং ভৌগোলিক অবস্থানের প্রাচীন পরিকাঠামো মোতাবেক বাবলারি গ্রাম সন্নিহিত অঞ্চলে ছিল চৈতন্যদেবের জন্মস্থান, যা ভাগীরথীর ভাঙনে চাপা পড়ে গেছে পলিস্তরের গভীরে। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, প্রাচীন নবদ্বীপের প্রকৃত অবস্থান ছিল পশ্চিমে মাধাইপুর থেকে পূর্বে নগরিয়া ঘাট পর্যন্ত (বর্তমানে নিদয়া গ্রাম) আর উত্তরে ভাগীরথী থেকে দক্ষিণে মালঞ্চপাড়া পর্যন্ত। মধ্যযুগে এখানেই ছিল মূল নবদ্বীপের জনবসতি, বৈদিকপল্লি, টোল-চতুষ্পাঠী এবং বিশ্ববিশ্রুত মনীষার উদ্ভবক্ষেত্র।

ভাগীরথী ও জলঙ্গির গতিপথ পরিবর্তন

কালনা থেকে কাটোয়া পর্যন্ত ভাগীরথীর ধারায় সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য বাঁক। নবীন পলি সঞ্জাত ভূভাগ এর প্রধান কারণ। এইসব বৃহৎ-বৃহৎ বাঁকের মুখে জলবাহিত পলি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হয় জলবাঁধ। এগুলি প্রবাহপথে বাধার

৩৮. সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উদ্ধবদাসকে মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি বৃন্দাবনবাসী বলে উল্লেখ করেছেন (ভারতবর্ষ, পৃ. ৭০৩)। এদিকে বিমানবিহারী মজুমদার দুজন উদ্ধবদাসের কথা উল্লেখ করেছেন। একজন ছিলেন নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং পদকর্তা। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। আর দ্বিতীয়জন ছিলেন রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য এবং 'পদামৃতসমুদ্র' গ্রন্থের সংকলক। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন (ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬২১)।

সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবেই নদী নতুন পথ খুঁজে নেয়। এইভাবেই এই অঞ্চলের নদী বারংবার তার গতিপথ পালটেছে। যার ফলে ধ্বংস হয়েছে জনপদ, সৃষ্টি হয়েছে খাল-বিল-বাঁওড় আর চড়াভূমির। নবদ্বীপ সন্নিহিত পশ্চিমাংশে ভাগীরথীর দুটি প্রাচীন ধারা চিহ্নিত করা গেছে। প্রথম ধারাটি জাহান্নগর-চাঁদপুর-বিদ্যানগর-চাঁপাহাটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জালুইডাঙার কাছে বর্তমান ধারায় মিশেছে। এই পরিত্যক্ত খাতটি চাঁদের বিল-কোবলার বিল-বাঁশাদহের বিল ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। গোয়ালপাড়া থেকে জালুইডাঙা পর্যন্ত পরিত্যক্ত অপর একটি নদীখাত বড়দুয়ার বিল ও ছোটদুয়ার বিল নামে চিহ্নিত আছে। দ্বিতীয় ধারাটি জাহান্নগর থেকে পূর্বে কিছুটা সরে এসে নবদ্বীপ নগরীর পশ্চিমসীমা নির্দিষ্ট করে রেলস্টেশনের পাশ দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে জালুইডাঙার কাছে বর্তমান ধারায় মিশেছে। বর্তমানে এই ধারাটি পরিত্যক্ত খালে পরিণত হয়েছে। ব্রুকের মানচিত্রে, টেম্পল সাহেবের মানচিত্রে, রেনেলের মানচিত্রে, হারকোলেটের মানচিত্রে, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রেভেনিউ সার্ভের মানচিত্রে এই পরিত্যক্ত ধারাটি চিহ্নিত আছে। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত ব্রুকের মানচিত্রে এবং ১৬৭৬-৭৯ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত টেম্পল সাহেবের মানচিত্রে ভাগীরথীর পূর্বে নবদ্বীপ নগরীর অবস্থান চিহ্নিত আছে। অথচ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলওয়েলের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, নবদ্বীপ নগরীর অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটেছে। এই মানচিত্রে নবদ্বীপের অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে ভাগীরথীর পশ্চিমসীমায়। অর্থাৎ ইতিমধ্যে ভাগীরথীর প্রবাহপথে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। আবার ১৭৬৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত রেনেলের মানচিত্রে নবদ্বীপের পূর্বে ভাগীরথীর নতুন প্রবাহপথটি যেমন চিহ্নিত করা হয়েছে তেমনি নগরীর পশ্চিমসীমা বরাবর দুটি প্রাচীন খাতের অবস্থানও অঙ্কিত রয়েছে। নবদ্বীপের উত্তর সীমায় দেখা যাচ্ছে যে, ভাগীরথী Meggha (সম্ভবত বর্তমান বেলপুকুর) নামক স্থানে একটি 'U' আকারের বাঁক সৃষ্টি করে নবদ্বীপের উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নবদ্বীপের পূর্বে এবং পশ্চিমে প্রবাহিত ধারা দক্ষিণে সমুদ্রগড়ের নীচে জালুইডাঙার কাছে মিলিত হয়েছে। নবদ্বীপ সন্নিহিত অঞ্চলে ভাগীরথী বারংবার তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। এইসব পরিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের জানা নেই। তবে সবচেয়ে বড় যে বিপর্যয়টি ঘটেছিল, যার ফলে চৈতন্যদেবের সমকালীন নবদ্বীপ নগরী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং ভাগীরথী তার পশ্চিমবাহিনী ধারা ত্যাগ করে পূর্ববাহিনী ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল—এই বিপর্যয়ের সময়কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে।

এতক্ষণ মানচিত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, ভাগীরথীর এই

গতিপথ পরিবর্তনের সময়কাল ১৬৭৯ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তীকাল। সঠিক সময়কাল নির্ণয়ের জন্য আমরা এবার সমকালীন সাহিত্য পর্যালোচনা করে দেখব। আমরা মধ্যযুগে নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান আলোচনা প্রসঙ্গে বহু গ্রন্থের সাহায্যে প্রমাণ করেছি যে, সেকালে ভাগীরথীর প্রবাহপথ ছিল নবদ্বীপের পশ্চিমে। এখন এ বিষয়ে পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে আমরা শুধুমাত্র অষ্টাদশ শতকে রচিত কয়েকটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করব। (এক) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরহরি চক্রবর্তী রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথীর প্রবাহপথ ছিল। তিনি লিখেছেন—

'দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়।
গঙ্গা পূর্ব-পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।।
পূর্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।।
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার।।' [৩৯]

নরহরির বর্ণনায় অন্তর্দ্বীপ হচ্ছে নবদ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ হচ্ছে সিমলিয়া—বর্তমানে বামুনপুকুর, গোদ্রুম হচ্ছে গাদিগাছা, মধ্যদ্বীপ হচ্ছে মাজিদা, কোলদ্বীপ হচ্ছে কুলিয়া, ঋতু হচ্ছে রাহাতপুর ও বিদ্যানগর, জহ্নু হচ্ছে জাহান্নগর, মোদদ্রুম হচ্ছে মামগাছি আর রুদ্রদ্বীপ হচ্ছে রুদ্রপাড়া। এখানে নরহরি চক্রবর্তী বলতে চেয়েছেন যে, ভাগীরথীর পূর্বপারে ছিল সিমলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা ও নবদ্বীপ এবং পশ্চিমপারে ছিল বিদ্যানগর, জাহান্নগর, কুলিয়া, মামগাছি ও রুদ্রপাড়া। অর্থাৎ নবদ্বীপ ও জাহান্নগরের মাঝ বরাবর ছিল ভাগীরথীর প্রবাহপথ। (দুই) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭২৮-৮২ খ্রি.) সময় নবদ্বীপ ছিল বাংলার একটি সমৃদ্ধ জনপদ। মহারাজ নিজেকে নবদ্বীপের রাজা বলে পরিচয় দিতেন। সেকালে ভাগীরথীর প্রবাহপথ ধরেই রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হত। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বর্ণনানুসারে জানা যাচ্ছে যে, নবদ্বীপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং ভাগীরথীর প্রবাহপথ ছিল নবদ্বীপের পশ্চিমে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—'পশ্চিমের সীমা গঙ্গা-ভাগীরথী খাদ।' (তিন) অপরদিকে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বিজয়রাম সেনবিশারদ জানিয়েছেন যে, সেকালে নবদ্বীপের অবস্থান ছিল ভাগীরথীর

৩৯. ভক্তিরত্নাকর—১২/৫০৫২

পশ্চিমে। তিনি তাঁর 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—

'ছয় দণ্ড বেলা যখন আছয়ে গগনে।
নবদ্বীপ আসি নৌকা দিল দরশনে।।
চলাচল চলে নৌকা নদ্যা বাম ভিতে।
তেমুয়নী দিয়ে নৌকা পড়িল খড়্যাতে।।' [৪০]

কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর যাওয়ার পথে তিনি নবদ্বীপ বা 'নদ্যা'কে ভাগীরথীর বাম ভাগে দেখেছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে যে, তখন ভাগীরথী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে।

এতক্ষণ আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভাগীরথী তার প্রাচীন ধারা অটুট রেখেছে, কিন্তু ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তার পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ ১৭৫২ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভাগীরথী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছিল। প্রচলিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল অপরাহ্নে পূর্ব ভারতে যে ভয়ংকর ভূকম্পন সংঘটিত হয়েছিল[৪১] এবং তার ফলে বাংলার বহু নদীপথ শুকিয়ে গিয়েছিল, বহু নদী গ্রাম-শহর ধ্বংস করে নতুন প্রবাহপথ সৃষ্টি করেছিল। তার প্রমাণ পাই রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের লেখায়,—'This revolution in Bengal's river system was due to the cumulative effect of changes in the up-river areas the catastropic innundation of 1767-70 and 1786-88 and the earthquake of 1762. Both Geography and history were re-mode in Bengal as the 18th Century drew to a close.'[৪২] এই ভূকম্পনের ফলে নবদ্বীপে ভাগীরথী ও জলঙ্গির গতিপথ পালটে যায়। ভাগীরথী মধ্যযুগের নবদ্বীপ নগরীকে ধ্বংস করে পিরতলার খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। নবদ্বীপের বাসিন্দারা কিছুটা দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে সরে এসে নতুন বসতি গড়ে তোলেন। এই সময় গড়ে ওঠে আধুনিক নবদ্বীপ নগরী। পরবর্তীকালে এই নগরী কুলিয়া পাহাড়পুর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

এ ছাড়া বন্যার প্রকোপে বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই নগরী। প্রচলিত তথ্য থেকে জানা যায় যে ১৭৪৭, ১৭৭০, ১৮০১, ১৮২০, ১৮২৩, ১৮৩৮,

৪০. তীর্থমঙ্গল—বিজয়রাম সেনবিশারদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্লোক-১২৪-২৭

৪১. গঙ্গাপথের ইতিকথা—অশোককুমার বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৪৯

৪২. Changing face of Bengal—Dr. Radha Kamal Mukherjee, P-9

১৮৫৭, ১৮৫৯, ১৮৬৭, ১৮৭১, ১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৯০০, ১৯০৬, ১৯১১, ১৯১২, ১৯১৩, ১৯২২, ১৯২৮, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৫৬, ১৯৭১, ১৯৭৮, ১৯৮৭, ১৯৯২, ১৯৯৯, ২০০০ খ্রিস্টাব্দের বন্যায় নবদ্বীপ শহর কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৪২ক] ১১৯৯ বঙ্গাব্দের ১ অগ্রহায়ণ নবদ্বীপের রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন[৪২খ], ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের প্রলয়ংকর বন্যায় তা গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, 'গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেবালয়—মোং নবদ্বীপের উত্তরপারে রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে দেবালয় করিয়া দেব স্থাপন করিয়াছিলেন সম্প্রতি সে দেবালয়ের মন্দিরসকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছে অতএব সে সকল দেববিগ্রহদিগকে নবদ্বীপে রাখিযা সেবা করিতেছেন ও মন্দির মেরামত করিতেছেন। মন্দির মেরামত হইলে সে সকল দেববিগ্রহদিগকে স্ব-স্ব স্থানে রাখা হইবে।'[৪২গ] এই সময় নবদ্বীপ ও রামচন্দ্রপুরের মাঝ বরাবর পিরতলার পাশে প্রবাহিত ধারাটি বর্তমান ছিল।

বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি ১৭৬২ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পকে গুরুত্ব না দিয়ে ১৭৭০ সালের বন্যায় নবদ্বীপে ভাগীরথীর পূর্বখাতের সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করেছেন।[৪২ঘ] তাঁর এই দাবি স্বীকার করে নিলে তা হবে অনৈতিহাসিক পদক্ষেপ। কারণ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলওয়েলের মানচিত্রে নবদ্বীপের অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে ভাগীরথীর পশ্চিমে। অর্থাৎ এই সময়কালের পূর্ব থেকেই ভাগীরথী নবদ্বীপের পূর্বসীমা বরাবর প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। সুতরাং ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ভাগীরথী তার খাত পরিবর্তন করেছে, এ যুক্তি ধোপে টেকে না।

'সেকালের দারোগা কাহিনী' থেকে জানা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাগীরথীর গতিপথে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল।[৪৩] গিরিশচন্দ্র বসু ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে যখন নবদ্বীপ থানার দারোগা ছিলেন তখন ভাগীরথীর প্রবাহপথ ছিল বেলপুকুরের নীচে। আবার ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন গ্রন্থটি রচনা করেন তার আগেই ভাগীরথী তার গতিপথ পরিবর্তন করে পূর্বস্থলী চুপি কাষ্ঠশালির দক্ষিণাংশ ধ্বংস করে একটি 'U' আকারের বাঁক সৃষ্টি করে

৪২ক. An Account of Land Management in West Bengal, 1953—Asok Mitra, P-278-287

৪২খ. The Paikpara and Kandi Raj—W. B. Moreno, P-16

৪২গ. সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫

৪২ঘ. শ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি, পৃ. ৯-১০

৪৩. সেকালের দারোগা কাহিনী—গিরিশচন্দ্র বসু, ২য় সং, পৃ. ২৪

একডালিয়া পরানপুর এবং নবদ্বীপের উত্তর সীমা বরাবর প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণবাহিনী হয়েছে। আর বেলপুকুরের নীচে পরিত্যক্ত খাতটি 'গুড়গুড়ের খাল' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পূর্বস্থলীর নীচে প্রবাহিত ভাগীরথীর ধারাটি প্রায় একশো বছর সচল ছিল। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবল বন্যায় ভাগীরথী আবার তার গতিপথ পরিবর্তন করে। এবারে ভাগীরথী গোপীপুর কাষ্ঠশালি থেকে সোজা দক্ষিণবাহিনী হয়ে নিদয়া গ্রামটিকে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নবদ্বীপের পূর্ব সীমা বরাবর প্রবাহিত হয়েছে। এখনও নবদ্বীপের উত্তর সীমায় প্রাচীন মায়াপুর অঞ্চলে ভাগীরথীর ভাঙন অব্যাহত রয়েছে।

এতক্ষণ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভাগীরথীর ভাঙন বিষয়ে আলোচনা করা হল। এবারে আমরা জলঙ্গির গতিপথ পরিবর্তনের ধারা বিষয়ে চর্চা করব। বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, মধ্যযুগে নবদ্বীপের অগ্নিকোণে ছিল এই নদীর প্রবাহপথ আর নাম ছিল অলকানন্দা। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে এবং চৈতন্য পরিকর উদ্ধবদাসের পদে অলকানন্দার নামোল্লেখ আছে। উদ্ধবদাস লিখেছেন—

'অলকানন্দার কূলে নাচে গোরা বাহু তুলে
পদভরে ধরা টলমল।'

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ব্রুকের মানচিত্রে এই নদীটি চিহ্নিত আছে। তিনি এই নদীটির নামকরণ করেছেন 'De Galgatese Spruys'। নামে পার্থক্য থাকলেও নদীদুটি এক ও অভিন্ন। অলকানন্দা পার হয়েই নবদ্বীপের ভক্তগণ শান্তিপুর গিয়েছিলেন নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে—এ কথা জানিয়েছেন বৃন্দাবনদাস। মধ্যযুগে অলকানন্দার দুটি ধারার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। একটি ধারা মহেশগঞ্জ থেকে শুরু করে বিষ্ণুপুর-কুদপাড়া-সিংডাঙা-ঘোলগাছি-গোয়ালপাড়া বরাবর আরও সাত-আট কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে বাগআঁচড়া গ্রামের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছিল। আর অপর ধারাটি ট্যাংরার কাছ থেকে উসিদপুর মাজদিয়ার মাঝামাঝি প্রবাহিত হয়ে শিমুলগাছি বনকর ধোপাদি অতিক্রম করে আনন্দবাসের কাছে ভাগীরথীতে পড়েছিল। ১৬৭৬-৭৯ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত টেম্পল সাহেবের মানচিত্রে অলকানন্দার কোনও অস্তিত্ব নেই, তার পরিবর্তে জলঙ্গির একটি ধারা নবদ্বীপের উত্তর সীমা বরাবর প্রবাহিত হয়ে সিমলিয়া গ্রামের দক্ষিণ দিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছিল। অর্থাৎ ১৬৬০ থেকে ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে অলকানন্দার গতিপথের পরিবর্তন ঘটেছিল। এই নদীর পরিত্যক্ত খাতগুলি বর্তমানে বিলে পরিণত হয়েছে। 'গোপেয়ার বিল', 'অলকার বিল', 'হংসদার বিল', 'বাগ্দেবীর খাল' প্রভৃতি নামে এই প্রাচীন খাতটি পরিচিতি

লাভ করেছে। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে জলঙ্গি আবার তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং কিছুটা দক্ষিণে সরে এসে গাদিগাছার কাছে বর্তমান ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। সিমলিয়ার কাছে জলঙ্গির পরিত্যক্ত খাতটি 'দমদমার খাল' নামে বর্তমান রয়েছে। ১৭৬৪ থেকে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জরিপের কাজে নিযুক্ত ছিলেন মেজর জেমস রেনেল সাহেব। তিনি নবদ্বীপে অবস্থানকালে স্বচক্ষে জলঙ্গির ভাঙন দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'During eleven years of my residence in Bengal the outlet or head of Zillingy river was gradually removed three quarters of a mile further down and by two surveys of a part of the ancient banks of the Ganges, taken about the distance of a year each other, it appeared that the breadth of an English mile and a half had been taken away.'[৪৪]

ভাগীরথী এবং জলঙ্গির ধারা বারবার আঘাত করেছে নবদ্বীপ নগরীকে। সেই আঘাতের চিহ্ন এখনও অটুট। বর্তমান নবদ্বীপের শরীরেও এই ধরনের অসংখ্য খাত চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'খাল-বিল-ডোবা, এই নদের শোভা।' অসংখ্য খাল-বিল ছড়িয়ে আছে নবদ্বীপে। এগুলিকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলেই খুঁজে পাওয়া যাবে প্রাচীন নদীর প্রবাহপথ। পিরতলার পাশের খাতটি ছিল গঙ্গার প্রবাহপথ, এর সৃষ্টি হয়েছিল ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে, আবার পরিত্যক্ত হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। পৌর নথিতেও এ তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। যোগনাথতলায় 'ছোটগিন্নির পুকুর', 'বড়গিন্নির পুকুর' এবং কয়েকটি গর্তের চিহ্ন দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, এটি এককালে নদীর প্রবাহপথ ছিল। ওলাদেবীতলা, বুড়োশিবতলা, রামসীতাপাড়ায় অবস্থিত খাল-ডোবা-গর্তের চিহ্নগুলি প্রাগুক্ত ধারণাকেই পুষ্ট করে। বুঁইচরা চারিচরা দিয়ারার পাশ দিয়ে প্রবাহিত ধারাটি চৈতন্যদেবের সময়ে বর্তমান ছিল। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে জানা যায় যে, সেকালে এই ধারাটি ভাগীরথীর প্রধান প্রবাহপথ ছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এবং কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে এই ধারাটির উল্লেখ আছে। বর্তমানে এই খাতটি কয়েকটি খণ্ডিত জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। পৌরনথিতে এই পরিত্যক্ত ধারাটিকে 'পোলতার খাল' বলা হয়েছে। বিশ্বভারতী সংগ্রহশালায় রক্ষিত রামায়ণ পুথি থেকে জানা যায় যে, এই ধারাটির দক্ষিণে ছিল কুলিয়ার অবস্থান আর উত্তরে মালঞ্চবাড়ি। কুলিয়া বর্তমানে নবদ্বীপ পৌরসভার অন্তর্গত। বরজের ডাঙা থেকে পচাপুঁটি, মুখার্জিপুকুর হয়ে স্টেডিয়ামের

৪৪. Memoir of a Map of Hindusthan—Renell, 1788

পাশ দিয়ে একটি পরিত্যক্ত খাত পশ্চিমে পোলতা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এই ধারাটিও একসময় নদীর প্রবাহপথ ছিল।

চৈতন্যদেবের সমকালে নবদ্বীপের যে অবস্থান ছিল নদীর ভাঙনে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। সিমলিয়া, বল্লালদিঘি প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পূর্বে ও জলঙ্গির উত্তরে, গাদিগাছা মাজিদা প্রভৃতি গ্রাম জলঙ্গির দক্ষিণে ও ভাগীরথীর পূর্বে এবং বর্তমান নবদ্বীপ নগরী ভাগীরথীর পশ্চিম সীমার খণ্ডিত অংশে অস্তিত্ব বজায় রাখল। হারিয়ে গেল চৈতন্যদেবের পদরজধন্য শ্রীধাম নবদ্বীপ নগরী। যে নবদ্বীপে চৈতন্যদেব নগরকীর্তন করেছিলেন, জগাই-মাধাই উদ্ধার করেছিলেন— সে নবদ্বীপ আজ ঘুমিয়ে আছে বায়ুকোণের চড়াভূমির অতল গভীরে। এ প্রসঙ্গে ভোলানাথ চন্দ বলেছেন—'The caprices and changes of the river have not left a trace of old Nuddea. It is now partly char land and partly the bed of the stream that flows to the north of the town. The Ganges formerly held a westerly course and old Nuddea was on the same side with Krishnagar.'[৪৫]

চৈতন্যদেবের সমকালে নবদ্বীপের অবস্থান ছিল জাহান্নগরের অনতিদূরে বাবলারি-মাধাইপুর অঞ্চলে। তবে পশ্চিমের গঙ্গা থেকে এই নগরী যে অনেকটা দূরে অবস্থিত ছিল বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় তা প্রস্ফুটিত হয়েছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব একবার বাংলায় এসেছিলেন, উঠেছিলেন বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে। চৈতন্যদেব বিদ্যানগরে অবস্থান করছেন শুনে নবদ্বীপের সংখ্যাতীত ভক্ত তাঁকে দর্শনের প্রত্যাশায় বিদ্যানগরের দিকে ছুটে চললেন। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

'অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি হরি হরি।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।
লোকের গহনে লোক পথ নাহি পায়।
বন ডাল ভাঙ্গি লোক দশ দিকে যায়।।'[৪৬]

এইভাবে বন-ডাল ভেঙে কিছুটা পথ চলার পর তবেই তারা খেয়াঘাটে পৌঁছতে পেরেছিলেন। তাই অনুমিত হয় যে, নবদ্বীপ নগরীর পশ্চিমে বেশ কিছুটা অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। অবশ্য নগরীর ঈশান কোণও যে বাদাবনে পূর্ণ ছিল সে কথা আগেই জানানো হয়েছে। প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান সম্পর্কে

৪৫. The Travels of a Hindoo—Bholanath Chunder, London, P. 36

৪৬. চৈতন্যভাগবত—৩/৩

রেভারেন্ড জেমস্ লঙ সাহেবের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'The Caprices of the river have not left a fragment of any old buildings, in Lakshman's time it flowed at the west of the present town near Jahannagar, and old Nudiya, which was swept away by the river, lay to the north of the existing Nudiya. The old town was on the Krishnanagar side of the river.'[৪৭]

চৈতন্যদেবের জন্মস্থান চর্চার ধারা

জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক ভক্তদের অভিপ্রেত ছিল না। তবে এর ফলে নবদ্বীপ চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে নবদ্বীপের ইতিহাস। আজ নবদ্বীপের ইতিহাস, মধ্যযুগে নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে চর্চা করতে হলে, এতদ্সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে পারে। চৈতন্যদেবের জন্মস্থান-বিতর্ক নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যাপক ড. ক্ষুদিরাম দাস, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা ড. বাসন্তী চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, ব্রজমোহনদাস বাবাজি, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রমাপ্রসাদ চন্দবাহাদুর, অধ্যাপক ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার, সুকুমার মজুমদার, শ্রীমতী আভা সরকার, শরদিন্দুনারায়ণ রায়, কে. এন. মুখার্জি প্রমুখ বিদগ্ধজন। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ প্রবন্ধ রচনা করেছেন আবার কেউ-বা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইতিহাসচর্চা করতে হলে অবশ্যই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এইসব ইতিহাসবেত্তার মধ্যে কেউ মায়াপুরের পক্ষে আবার কেউ-বা প্রাচীন মায়াপুরের পক্ষে কলম ধরেছেন। ফলে তাঁদের সিদ্ধান্ত আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। খোলা মন নিয়ে, ইতিহাসের বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করে যুক্তিপূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিষয়ে তাঁরা সবক্ষেত্রে সফল হতে পারেননি। আবার কেউ-কেউ নিজের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইতিহাসকে বিকৃত করে পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন। এ ধরনের ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা ধিক্কার জানাই।

মিঞাপুরকে 'মায়াপুর' প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে শরদিন্দুনারায়ণ রায় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে মায়াপুরের

৪৭. Calcutta Review, 1860

প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য 'Statistical Accounts of Bengal', Vol.-I পুস্তকে পরিবেশিত ব্লকম্যানের একটি বিবরণের প্রথমাংশ বাদ দিয়ে শরদিন্দুনারায়ণ রায় হুগলি জেলার আরামবাগ থানায় অবস্থিত 'মায়াপুর'-কে নবদ্বীপ সন্নিহিত অঞ্চলের 'মায়াপুর' প্রমাণ করতে চেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। একজন গবেষকের কাছে যা আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না। ব্লকম্যানের বক্তব্যটি ছিল এইরূপ—'Naira seems to be a mistake of Baira, a large paragana in Hugli District adjacent to Bhursut. To Baira belongs the little town of Mayapur (near the Burdwan boundary) where I am told the tomb exists of one Moulana Serajuddin who is said to have been the teacher of Hussain Shah, King of Bengal (1494-1522).'[৪৮] শরদিন্দুনারায়ণ রায় উদ্ধৃতির প্রথমাংশ বাদ দিয়ে লিখেছেন—'To Baira belongs the little town of Mayapur (near the Burdwan boundary) .... King of Bengal (1494-1522).'[৪৯] ব্লকম্যানের মায়াপুরের অবস্থান যে হুগলি জেলায় ছিল এই তথ্যকে গোপন করে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বর্ধমান জেলার সীমান্ত প্রদেশে বয়রার নিকট ছিল মায়াপুরের অবস্থান—যা অনৈতিহাসিক এবং বৈষ্ণব ঐতিহ্য বিরোধী। উদ্ধবদাসের একটি পদে জানা যায় যে, নবদ্বীপের প্রশাসকের নাম ছিল চাঁদকাজি, মৌলানা সিরাজউদ্দিন যে নবদ্বীপের কাজি ছিলেন এবং তিনি যে হোসেন শাহের শিক্ষক ছিলেন—এ তথ্য ইতিহাসসম্মত নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, 'Statistical Accounts of Bengal'-এর পরিশিষ্ট ব্লকম্যানের রচনা।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে জনৈক কে. এন. মুখার্জি 'A Study for Sri Chaitanya's Birth Place' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'Indian Journal of Landscape Systems' (Vol. 7) পত্রিকায়। তিনিও ওই একইভাবে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে ব্লকম্যানের প্রকৃত উক্তিকে আড়াল করে মায়াপুরের প্রাচীনত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এর ফলে সাধারণ পাঠকরা বিভ্রান্ত হয়েছেন ঠিকই, তবে ঐতিহাসিকেরা তাঁর এই অপকৌশল সহজেই ধরে ফেলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, 'মায়াপুর'বাদীরা তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেননি। এক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশি সতর্ক হতে হবে, প্রতিটি তথ্যকে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তবেই তা গ্রহণ করতে হবে, নতুবা নয়।

৪৮. Statistical Accounts of Bengal, Vol.-I, 1857—W. W. Hunter, P-367

৪৯. চিত্রে নবদ্বীপ—শরদিন্দুনারায়ণ রায়, পৃ. ৩৩

'মায়াপুর'-কে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হিসেবে স্বীকার করে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন রায় রমাপ্রসাদ চন্দবাহাদুর। তাঁর রচিত প্রবন্ধটি বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি ক্ষেত্র-সমীক্ষা না করে, বৈষ্ণব সাহিত্যকে উপযুক্ত মর্যাদা না দিয়ে, কতিপয় গৌড়ীয় ভক্তের অনুরোধে 'চৈতন্যদেবের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান' নির্ণয় করতে গিয়ে নানা ভ্রান্তিমূলক তথ্যের অবতারণা করেছেন। প্রাচীন নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্বসীমায় জলঙ্গির দুটি ধারা প্রবাহিত ছিল, রমাপ্রসাদবাবুর এ ধারণা কল্পনাপ্রসূত। তিনি লিখেছেন, 'সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে গঙ্গার একটি দ্বীপের ঠোঁটায় নবদ্বীপ নামক ক্ষুদ্র শহর অবস্থিত ছিল। রেনেলের সময়ের নবদ্বীপও একটি দ্বীপের ঠোঁটায় অবস্থিত ছিল। কিন্তু সে ছিল দ্বীপের উত্তর-পূর্ব ঠোঁটায় জলঙ্গির তীরে, গঙ্গার তীরে নহে। আর হেজেসের সময়ে ছিল বোধহয় একটি চরের উত্তর-পশ্চিম ঠোঁটায় গঙ্গার তীরে।'[৫০] রেনেলের সময় নবদ্বীপ জলঙ্গির তীরে অবস্থিত ছিল, তাঁর এ ধারণাও সঠিক নয়। তিনি নবদ্বীপে না এসে, শুধুমাত্র মানচিত্রের সাহায্যে নবদ্বীপের স্থিতিস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে ভাগীরথীর ধারা নবদ্বীপের পশ্চিম খাত ত্যাগ করে পূর্ব সীমায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। জলঙ্গির ধারা ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয় নবদ্বীপের বিপরীতে গাদিগাছার কাছে। সুতরাং নবদ্বীপের অবস্থান ছিল ভাগীরথীর তীরে, জলঙ্গির তীরে নয়।

নবদ্বীপের তৎকালীন ভৌগোলিক অবস্থান বিষয়ে আরও দুটি উক্তি তাঁর অজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করে। একস্থানে তিনি লিখেছেন, 'চৈতন্যভাগবতের মতে চৈতন্যের সময়ে উত্তরে সিমলিয়া বামনপুকুর দক্ষিণে মাঝদহ পর্যন্ত অখণ্ড 'সর্ব্ব নবদ্বীপনগর' বিস্তৃত ছিল। এই নগরের উত্তর প্রান্তস্থ বামনপুকুর গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী ভূভাগের অন্তর্গত এবং দক্ষিণ প্রান্তস্থ গাদিগাছা এবং মাজিদাও গঙ্গ ার পূর্বপারে অবস্থিত। প্রভুর ঘাটের নিকটবর্তী নিমাইর বাড়ী এই দুই সীমার মধ্যেই অবস্থিত ছিল।'[৫১] তাঁর এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আমাদের এই প্রতীতি জন্মে যে, তিনি হয়তো চৈতন্যভাগবত না পড়েই মনগড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। চৈতন্যভাগবতের ঐতিহ্য অনুসারে বামুনপুকুর বা সিমলিয়ার দক্ষিণে ছিল শূদ্রপল্লি, কাজি দলনের পর যেখানে চৈতন্যদেব নগর সংকীর্তন করেছিলেন— এ আলোচনা আগেই করেছি। এরপর গাদিগাছায় শ্রীধরের গৃহে জলপান করে

৫০. ভারতবর্ষ

৫১. তদেব

'নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।' এর থেকে বোঝা যায় যে, সিমলিয়া হতে গাদিগাছা মাজিদা পর্যন্ত যে সকল স্থান কাজি দলনের দিন তিনি ভ্রমণ করেছিলেন, সেগুলি নবদ্বীপ মণ্ডলের পূর্বসীমায় অবস্থিত হলেও মূল নবদ্বীপনগরী এই চৌহদ্দির মধ্যে ছিল না। সুতরাং এই দুই সীমার মধ্যে নিমাইয়ের বাড়ি থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

দ্বিতীয়ত, রমাপ্রসাদবাবু আরও মন্তব্য করেছেন যে, 'চৈতন্যের সময়ে গঙ্গা নবদ্বীপের উত্তরভাগস্থ গঙ্গানগর হইতে দক্ষিণপ্রান্তস্থ মাজিদা পর্যন্ত দক্ষিণবাহিনী ছিল।' এ তথ্য বিভ্রান্তিকর। বৈষ্ণব সাহিত্যের কোথাও এমন তথ্য পাওয়া যায় না, যাতে তাঁর এই উক্তি সমর্থিত হতে পারে। চৈতন্যদেবের সমকালে ভাগীরথীর ধারা যে জাহান্নগরের কাছে প্রবাহিত ছিল, তথ্য সহযোগে তা আগেই বলা হয়েছে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে ভাগীরথী তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং নবদ্বীপের পূর্বসীমা বরাবর প্রবাহিত হতে শুরু করে। রমাপ্রসাদবাবু ভাগীরথীর বর্তমান ধারাটিকে চৈতন্যদেবের সমকালীন ধারা হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বক্তব্যে যদি বিন্দুমাত্র বাস্তবতা থাকত তা হলে বর্তমান নবদ্বীপ সহ আধুনিক নদীখাতের পশ্চিমে প্রবাহিত গ্রামগুলি বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হত। কারণ ভাগীরথীর প্রাচীন ধারাকে অবলম্বন করেই জেলার সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বাবলারি নবদ্বীপ মহীশূরা প্রভৃতি গ্রামগুলি নদিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এই গ্রামগুলির পশ্চিমে প্রবাহিত প্রাচীন ধারাটিকে জেলার সীমানা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, রমাপ্রসাদবাবুর অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অপরদিকে, 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, গঙ্গানগরের কাছে গঙ্গার ধারা প্রবাহিত ছিল না। গঙ্গার প্রবাহপথের শেষ সীমানা ছিল নগরিয়া ঘাট। নরহরি লিখেছেন—

'এই নগরিয়া ঘাটে রহি কতক্ষণ।
গঙ্গা তীর হৈতে করে এ পথে গমন।।' [৫২]

বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে নগরিয়া ঘাট থেকে গঙ্গা ছিল পশ্চিমবাহিনী। তাই গঙ্গানগরের পাশে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এ ধারণা ইতিহাসসম্মত নয়। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের গয়া গমন, সন্ন্যাস গ্রহণ, নীলাচল হতে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন

৫২. ভক্তিরত্নাকর—১২/৩১২৬

এবং তিরোভাবের সন-তারিখ সম্পর্কিত তথ্যগুলি সঠিক নয়। তিনি লিখেছেন যে, চৈতন্যদেব ১৮ বছর বয়সে গয়াধামে দীক্ষা গ্রহণ করে ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে ফিরে আসেন। অন্যত্র বলেছেন যে, ১৫১১ খ্রিস্টাব্দের পর চৈতন্যদেব আর কখনও গৌড়ে পদার্পণ করেননি এবং তিনি ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ জগতে জীবিত ছিলেন। বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে সঠিক তথ্যগুলি হল, চৈতন্যদেব তেইশ বছর বয়সে গয়া গমন করেন এবং ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে ফিরে আসেন, সন্ন্যাস গ্রহণের পর ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি গৌড়ে পদার্পণ করেছিলেন এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে নীলাচলে তিনি প্রয়াত হন। রমাপ্রসাদবাবুর মতো একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি কীভাবে চৈতন্যদেবের মতো খ্যাতিমান মহামানবের জীবনের কালক্রম সম্পর্কিত তথ্যগুলি ভুলভাবে পরিবেশন করলেন,—তা আমাদের বোধগম্য নয়।

ব্রজমোহনদাস বাবাজি ছিলেন বৃন্দাবন ধারার নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সাধক। পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন বাস্তুকার। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরূপণে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি চৈতন্যদেবের জন্মস্থান সম্পর্কিত সঠিক তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে 'নবদ্বীপ দর্পণ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, চৈতন্যদেবের সমকালে নবদ্বীপের পূর্বসীমায় জলঙ্গির প্রবাহপথ ছিল—যা সঠিক নয়। সে যুগে এই নদী অলকানন্দা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। এই নদীর একটি ধারা বাগআঁচড়ার কাছে এবং অপর একটি ধারা আনন্দবাসের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছিল। সেকালে নবদ্বীপ নগরী গঙ্গানগর, সিমলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা, পাড়ডাঙা প্রভৃতি স্থান একই ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল। ভাগীরথী বা জলঙ্গির কোনও ধারা এই অংশে প্রবাহিত ছিল না। যদি তা থাকত, তা হলে কাজি দলনের দিন মহামিছিলের নগর পরিক্রমাকালে ঘাট পারাপারের প্রশ্ন উঠত। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ নগর পরিভ্রমণের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, এই পরিমণ্ডলের মধ্যে নদীর কোনও প্রবাহপথ ছিল না।

অধ্যাপক ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম নবদ্বীপে, কৈশোর অতিবাহিত করেছেন এখানেই। কর্মজীবনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা' সহ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিত ও বাণী' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি পাঠ করে নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। পাঁচশো বছর আগে

গঙ্গা নবদ্বীপের উভয় প্রান্ত দিয়েই প্রবাহিত ছিল, তাঁর এ অনুমান সঠিক নয়। সেকালে নবদ্বীপবাসীকে শান্তিপুর যেতে হলে নদী পার হতে হত ঠিকই, তবে তা গঙ্গা ছিল না, ছিল অলকানন্দা। সেকালে এই ধারাটি বাগআঁচড়ার কাছে বাগ্দেবী খালের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।[৫৩] ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত ব্রুকের মানচিত্রে এ ধারাটি চিহ্নিত আছে। অপরদিকে বেলপুকুরের নীচে প্রবাহিত ভাগীরথীর প্রাচীন ধারাটিকে ড. গঙ্গোপাধ্যায় জলঙ্গির একটি শাখা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—যা ইতিহাসসম্মত নয়। ক্ষেত্রসমীক্ষা না করে, প্রাচীনকালের মানচিত্রকে উপেক্ষা করে, পূর্বসূরিদের রচনাকে গুরুত্ব না দিয়ে বালখিল্যের মতো একটি মন্তব্য জুড়ে দিলেই যে সারস্বত সমাজ তা গ্রহণ করবেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র বসু যখন নবদ্বীপ থানার দারোগা ছিলেন তখন তিনি বেলপুকুরের নীচে ভাগীরথীর প্রবাহপথ দেখেছিলেন।[৫৪] ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত গঙ্গার ঘাটগুলির মধ্যে বেলনপুরের (বর্তমান বেলপুকুর) উল্লেখ থাকায় আমরা নির্দ্বিধ যে, সেকালেও বেলপুকুরের নীচে ভাগীরথীর প্রবাহপথ ছিল। ১৭৬৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত রেনেলের মানচিত্রে 'Meggha' গ্রামের কাছে ভাগীরথী যে 'U' আকারের বাঁক নিয়েছে, এটিই বেলপুকুর সন্নিহিত ভাগীরথীর প্রবাহপথ। সুতরাং এই ধারাটিকে জলঙ্গি বললে তা হবে সত্যের অপলাপ। তৃতীয়ত, 'পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ ধাম' শিরোনামে অনুমাননির্ভর একটি মানচিত্রে মামগাছির অবস্থান চিহ্নিত করেছেন ভাগীরথীর পূর্বসীমায়, যা তাঁর অজ্ঞতার আর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই গ্রামটি গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল এবং আজও অক্ষত আছে। নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—

'কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার।'

এই মোদদ্রুম হচ্ছে মামগাছি।

'চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান' গ্রন্থে সন্নিবেশিত অমিতাভ ভট্টাচার্য রচিত 'চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয়' প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান সংযোজন। এই গ্রন্থে গাদিগাছা মাজিদার অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যটি ত্রুটিপূর্ণ। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে জলঙ্গির অবস্থান ছিল বাগ্দেবী খালের কাছে,

৫৩. নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত, ১ খণ্ড, পৃ. ৩৪

৫৪. সেকালের দারোগা কাহিনী—গিরিশচন্দ্র বসু, ২য় সং, পৃ. ২৪

তাই গাদিগাছা মাজিদার অবস্থান ছিল এর উত্তরে, দক্ষিণে নয়।

এই ধরনের আরও অনেক প্রবন্ধ আছে, যার মধ্যে মধ্যযুগে নবদ্বীপের অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে এমন অনৃত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, যার ফলে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরূপণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বারবার। বাহুল্য বোধে অন্যান্য প্রবন্ধগুলির আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হল।

উপসংহার

এতক্ষণ আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যাচ্ছে যে, নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে নরহরি চক্রবর্তী রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থটি। চৈতন্যদেবের জন্মের প্রায় ২৬০ বছর পরে নরহরি এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত তাঁর গ্রন্থে তিনি চৈতন্যদেবের সমকালীন নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানকে ধরতে চেয়েছেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই ঘটে গেছে সীমাহীন প্রমাদ। 'ভক্তিরত্নাকর' ভক্তদের জন্য রচিত একটি আকর গ্রন্থ। তবে ইতিহাসচর্চার জন্য গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য নয়। কোনও কোনও গবেষক 'ভক্তিরত্নাকর'-এ পরিবেশিত তথ্যকে ইতিহাসের মর্যাদা দিতে চাওয়ায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। 'মায়াপুর' ভক্তিরসাশ্রিত আধ্যাত্মিক একটি শব্দ, মায়াচ্ছন্ন সংসারকে বোঝাতেই তিনি এরূপ উপমা ব্যবহার করেছেন। সুতরাং 'মায়াপুর' হিসেবে কোনও স্থাননাম নবদ্বীপে ছিল না, এখনও নেই। নবদ্বীপের পূর্বতীরে এখন যে স্থানটিকে 'মায়াপুর' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, সে স্থানটির প্রকৃত নাম ছিল 'মিঞাপুর'।

চৈতন্যদেবের জন্মস্থান প্রসঙ্গে কয়েকজন বরিষ্ঠ গবেষক যে অভিমত পোষণ করেছেন, এবারে সে সম্পর্কে আলোচনা করব। বিশিষ্ট চৈতন্য গবেষক অধ্যাপক ড. বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, 'মুরারি ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুসারে জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার কাঁচা বাড়ী ছিল, তাহা গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটা ঠিক কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করা এখন কঠিন, এমনকী অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ভক্ত মহাপুরুষগণ স্বপ্নে, আকাশবাণীতে বা তুলসীগাছ জন্মানো দেখিয়া যাহা নির্ণয় করেন তাহা ঐতিহাসিক প্রমাণ নহে।'[৫৫]

বিশিষ্ট গবেষিকা অধ্যাপিকা ড. বাসন্তী চৌধুরি বলেছেন, 'এখন যে

৫৫. শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—বিমানবিহারী মজুমদার, ২য় সং, পৃ. ৪৬৭

স্থানকে মায়াপুর বলিয়া ঘোষণা করা হয়, প্রাচীন দলিলপত্রে তাহার নাম মিঞাপুর দেখা যায়। মায়াপুর নামটির প্রাচীনত্ব লইয়াই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাহার পর আবার উহার অবস্থান লইয়া দুই দলের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে। কোন দলই কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারের প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন না। কোন মহাত্মা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি অথবা কেহ অনুভব করিয়াছিলেন যে এইখানেই অনেক তুলসীগাছ জন্মে বলিয়া ইহাই শ্রীচৈতন্যের পূত জন্মভূমি। এইরূপ অনুভূতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া একদল একটি স্থানকে মায়াপুর বলিতেছেন। অপরদল বলেন যে, প্রাচীন মায়াপুর ভারুইডাঙ্গার কাছাকাছি কেননা, লোকমুখে শোনা যায় ওইখানে নাকি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ গৌরাঙ্গের জন্মভিটার উপর এক প্রকাণ্ড মন্দির তুলিয়াছিলেন। ওই মন্দির কালক্রমে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। উহা খুঁড়িয়া বাহির করিতে পারিলে গৌরাঙ্গের জন্মভিটা আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ হইতে চলিয়া যান এবং উহার ২৬০ বৎসরেরও অধিক পরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ওয়ারেন হেস্টিংসের অধীনে দেওয়ানী করিতেন। দুইশো-আড়াইশো বৎসর ধরিয়া নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান কি গঙ্গার দ্রুত পরিবর্তন সত্ত্বেও অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল?'[৫৬]

চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হিসেবে কথিত 'মায়াপুর' ও 'প্রাচীন মায়াপুর'— এই স্থান দুটি যে বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ইতিহাসবেত্তারা তা স্বীকার করেছেন। এখন যে স্থানটি 'মায়াপুর' নামে পরিচিতি লাভ করেছে, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জেনারেল রাইডার সাহেবের মানচিত্রে এই স্থানটি মিঞাপুর নামে চিহ্নিত আছে। আবার গঙ্গার পশ্চিম পারে কথিত প্রাচীন মায়াপুরের প্রকৃত নাম যে রামচন্দ্রপুর ছিল পৌর নথিতে তার প্রমাণ মেলে। এই স্থান দুটি ভাববাদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও ইতিহাসবেত্তারা তা স্বীকার করেননি। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন, 'মানচিত্র দেখিলে সন্দেহমাত্র থাকিবে না যে চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপল্লী প্রাচীন গঙ্গার খাতের পূর্বে এবং গঙ্গানগর ও পাড়ডাঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।'[৫৭] অপর এক ইতিহাসবেত্তা

৫৬. বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সঙ্গীত ও সাহিত্য—ড. বাসন্তী চৌধুরি, পৃ. ৩০১-০২

৫৭. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর প্রবন্ধ 'নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ. ৫৩

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরির কণ্ঠেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'তথ্য প্রমাণাদির দ্বারা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গ্রহণযোগ্য অনুমান হলো ইদ্রাকপুর ও পূর্বস্থলীতেও নদীর একটি বিরাট বাঁকের সৃষ্টি করে দক্ষিণগামিনী হয়েছিল। তার বামভাগে মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থল ছিল। মনে হয় রামচন্দ্রপুরের উত্তর পশ্চিমে অতীতের সেই বিখ্যাত ব্রাহ্মণপল্লীর অবস্থিতি ছিল।'[৫৮]

বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ড. ক্ষুদিরাম দাস বলেছেন, 'মধ্যযুগে সাহিত্যে নবদ্বীপের অবস্থানের যে পরিচয় ফুটেছে তাতে দেখা গেল নবদ্বীপ গঙ্গার দক্ষিণ ও পূর্ব তীর সংলগ্ন নগর এবং পার্শ্ববর্তী বহু 'পাড়া' অঞ্চলে সমৃদ্ধ। বর্তমান নবদ্বীপ শহর পুরাতন নবদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। ভাগীরথীর নবদ্বীপ-পূর্ববাহিনী গতি তখন ছিল না। আর জলঙ্গীও বহুদূরে ছিল। এই হিসাবে বর্তমান নবদ্বীপ রেলস্টেশনের ও পূর্বস্থলী গ্রামের প্রায় সমদূরবর্তী স্থানে, তখনকার গঙ্গা (বর্তমান মড়িগঙ্গা) আর তারই দক্ষিণ ও পূর্বতীরে নবদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র ছিল। বর্তমান বাবলারি এলাকায় বড় রেলসেতুর সন্নিকটে শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ হতেও পারে।'[৫৯]

প্রাগুক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, চৈতন্যদেবের সমকালে নবদ্বীপের অবস্থান যে বর্তমান শহরের উত্তর-পশ্চিমে ছিল কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষক নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করেছেন। সুতরাং মায়াপুর নয়, প্রাচীন মায়াপুর নয়, চৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান নিরূপণ করতে হলে আমাদের পূর্বমুখী নীতি ত্যাগ করে পশ্চিমমুখী নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং বাবলারি মাধাইপুর ও মাধাইয়ের ঘাটটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

আমরা মনে করি, মধ্যযুগে পূর্বস্থলীর দক্ষিণে, জাহান্নগরের পূর্বে পাড়ডাঙার উত্তরে এবং সিমলিয়া-গঙ্গানগরের পশ্চিমে ছিল নবদ্বীপের প্রকৃত অবস্থান। সেকালে জাহান্নগরের খাতে ছিল ভাগীরথীর প্রবাহপথ। একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁক তিনদিক থেকে নবদ্বীপকে ঘিরে রেখেছিল। আর নগরীর পূর্বসীমায় কিছু দূরে ছিল মুসলমান পল্লি, শূদ্রপল্লি সিমলিয়া-গাদিগাছা-মাজিদা প্রভৃতি অঞ্চল। দক্ষিণে প্রবাহিত ধারার উত্তর তীর বরাবর মালঞ্চপাড়া পর্যন্ত ছিল প্রাচীন নবদ্বীপ নগরীর জনবসতি। পশ্চিমে নগরীর প্রান্তদেশ থেকে নদীর প্রবাহপথ পর্যন্ত বেশ কিছুটা অঞ্চল এবং নগরীর দক্ষিণ-পূর্বাংশ ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নগরীর উত্তরে প্রবাহিত ভাগীরথীর ধারায় ছিল চারটি ঘাটের

৫৮. শ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ, পৃ. ৭৬

৫৯. বৈষ্ণব রসপ্রকাশ—ড. ক্ষুদিরাম দাস, পৃ. ৪২৭

অবস্থান। একবারে পূর্বের ঘাটটির নাম ছিল নগরিয়া ঘাট, বর্তমান নিদয়ার কাছাকাছি ছিল এর অবস্থান। এর পশ্চিমে ক্রমান্বয়ে অবস্থিত ছিল বারকোণা ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট এবং গৌরাঙ্গের গৃহ সন্নিহিত ঘাট। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ছিল এই ঘাটগুলি। মাধাইয়ের ঘাটের পশ্চিমে অবস্থিত ঘাটটির দক্ষিণে ছিল চৈতন্যদেবের জন্মস্থান। সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরূপণে মাধাইয়ের ঘাটটির গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা আগেই বলেছি প্রাচীন মাধাইয়ের ঘাটটি আজ আর অবশিষ্ট নেই। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটটিরও অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটেছে। তবে প্রাচীন ঘাটটি যে বর্তমান ঘাটের সন্নিকটস্থ অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে মাধাইপুর ও মাধাইয়ের ঘাট সন্নিহিত অঞ্চলেই ছিল প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান। মাধাইয়ের ঘাটটির সঠিক অবস্থান নিরূপণ করা গেলেই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয় সহজ হয়ে যাবে। আমরা মনে করি, বর্তমান মাধাইয়ের ঘাটটিকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে অর্ধ কিলোমিটার চাপবিশিষ্ট একটি বৃত্ত অঙ্কন করলে যে অঞ্চলটি পাওয়া যাবে, তার মধ্যেই চৈতন্যদেবের বাসগৃহ থাকা সম্ভব। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, বাবলারির উত্তরে মাধাইয়ের ঘাট সংলগ্ন অঞ্চলেই ছিল চৈতন্যদেবের জন্মস্থান।

—